যারা ভোর এনেছিল
আনিসুল হক

যারা ভোর এনেছিল

যারা ভোর এনেছিল

আনিসুল হক

উৎসর্গ

তোমরা যারা একাত্তরের পরে জন্মেছ

ভূমিকা

এটি উপন্যাস, ইতিহাসগ্রন্থ নয়; যদিও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার সময় সত্যতা রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

এই কাহিনি রচনার সময় বিভিন্ন লেখকের নানা বই থেকে উদার হাতে গ্রহণ করা হয়েছে, কোথাও কোথাও উদ্ধৃত করা হয়েছে অবিকল, কোথাও বা পুনর্লিখন করা হয়েছে মাত্র। সবার কাছে ঋণ স্বীকার করছি আন্তরিকভাবে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান অর্জন স্বাধীনতা। তা যে এক দিনে আসেনি, এক বছরেও নয়—এই বই রচনাকালে কথাটা বারবার মনে হয়েছে।

এই বইয়ে আমরা কেবল ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আসতে পেরেছি। আমাদের আরও বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। আপনাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে আমার জন্য কাজটা সহজ হবে। পরামর্শ, সংশোধনী, তথ্য পাঠাতে পারেন ই-মেইলে।

ধন্যবাদসহ

আনিসুল হক

এক ছিল ব্যাঙ্গমা। আরেক ছিল ব্যাঙ্গমি। একটা আমগাছের ডালে ছিল তাদের বাস।

ওই আমগাছটা কোথায় ছিল?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা কোথায়?

পূর্ব পাকিস্তানে।

শেখ মুজিব অবশ্য কখনোই পূর্ব পাকিস্তান শব্দটা উচ্চারণ করতে চাইতেন না। ১৯৪৭-এর পরও তাঁর জন্মভূমিকে তিনি ডাকতেন পূর্ব বাংলা বলে। বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষের দিকে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন বাংলা দেশ। আসলে, ইংরেজ শাসনের অবসানের পর, পাকিস্তানের পূর্ব অংশটিকে বহুদিন পূর্ব পাকিস্তান নাম দেওয়াও হয়নি, এটা পূর্ব বাংলা বলেই পরিচিত ছিল। তারপর যখন এর নাম সরকারিভাবে পূর্ব পাকিস্তান রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়, শেখ মুজিব এর প্রতিবাদ করেছিলেন। পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি বলেছিলেন, স্যার, আপনি দেখবেন, ওরা পূর্ব বাংলা নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে আপনারা এটাকে বাংলা বলে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে ঐতিহ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনের খোলা চত্বরে ছিল আমগাছটা। এই আমগাছের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও ছিল। ১৯৫২ সালে এই আমগাছের ছায়াতলে সমবেত হয়েছিল ঢাকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। সেখান থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার দাবিতে সরকারের নিষেধাজ্ঞা ভেঙে তারা বেরিয়ে পড়েছিল মিছিল নিয়ে।

আমাদের এই গল্পে ওই আমগাছের গুরুত্ব অবশ্য সে কারণে নয়।

সেই গাছে বসে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি মনের খেয়ালে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

ব্যাঙ্গমি বলে, 'ওগো শুনতেছ!'

ব্যাঙ্গমা তখন আমের ডালে তার ঠোঁট ঘষছিল। আরামে তার চোখ বুজে আসছিল। চোখ না খুলেই সে বলে, 'শুনতেছি।'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'আচ্ছা, কও তো, এই সব স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা এসে এইখানে আমাদের বাসার নিচে মিটিং করে, মিছিল করে, বায়ান্ন সালে মিছিল করতে গিয়া তো শেষে কয়জন পুলিশের গুলিতে মারাও গেল। এই সব কইরা কোনো লাভ আছে?'

ব্যাঙ্গমা চোখ খুলে বলে, 'হ, লাভ আছে না! আছে।'

'কী লাভ?'

ব্যাঙ্গমা বলে, 'এই যে তুমি আমার সাথে এই সব নিয়া কথা কইতেছ। এইটাই তো লাভ।'

ব্যাঙ্গমি ঠোঁট বাঁকিয়ে পুচ্ছ নাচিয়ে বলে, 'ইশ্! আমি বুঝি কথা কই না। সারাক্ষণ তো আমিই কথা কই। তুমি তো খালি...'

ব্যাঙ্গমার মুখে হাসি, 'ক্যান, আমি কথা কই না? কত আদর-সোহাগ কইরা কথা কই।'

ব্যাঙ্গমি তার ঘাড়ের পালক ফুলিয়ে বলে, 'না, তুমি মোটেও আদর-সোহাগ কইরা কথা কও না। আদর-সোহাগ করার মতলবে মিঠা মিঠা কথা কও। তারপর কাম ফুরাইলে মুখ ফিরায়া থাকো। কথা যা কওয়ার আমিই কই।'

ব্যাঙ্গমা গম্ভীর মুখে বলে, 'আচ্ছা, আমি কথা কইতেছি। কথা কথা কথা...' তারপর সে হেসে ফেলে।

ব্যাঙ্গমি দুই ডানা ঝাপটে বলে, 'চালাকি করো! আমার লগে চালাকি কইরো না। যা কই, মন দিয়া শুনো।'

ব্যাঙ্গমার মুখ থেকে হাসি সরে না, 'আগে কান দিয়া শুনি। তারপর মনে লই?' সে তার এক পা দিয়ে কানের ওপরের পালক সরায়।

ব্যাঙ্গমি প্রবোধ মানে, বলে, 'আচ্ছা, তা-ই করো। শুনো, এই যে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এত ফাল পাড়তেছে, কোনো লাভ নাই। একটা লোক পূর্ব বাংলারে স্বাধীন করব।'

'আচ্ছা।' ব্যাঙ্গমা উৎকর্ণ। বলে, 'কোন লোকটা?'

'এই দেশের সবচেয়ে সুন্দর লোকটা। ছয় ফুট উঁচা। সাদা পাঞ্জাবির

ওপরে কালো হাতাকাটা কোট পরে। এক আঙুল উঁচায়া কথা কয়।'

'বুঝছি বুঝছি,' ব্যাঙ্গমা নড়ে বসে, 'আর কইতে হইব না। তুমি শেখ মুজিবরের কথা কও।'

'আচ্ছা, কও তো, শেখ মুজিব এক আঙুল তুইলা কথা কয় ক্যান?'

'কারণ, সে নানা কথা কয়, নানা কাজ করে, কিন্তু শেষ লক্ষ্য তার একটাই।' ব্যাঙ্গমা এবার বউয়ের ধাঁধার জবাব দেয়।

ব্যাঙ্গমি চোখ উজ্জ্বল করে বলে, 'দেশ স্বাধীন করব। এইটাই তার জীবনের একমাত্র টার্গেট।'

ব্যাঙ্গমা বলে, 'দেশ স্বাধীন হইব। যুদ্ধ কইরা। সেই যুদ্ধের সময় মুজিবর আর একলা একটা মানুষ থাকব না, সাড়ে সাত কোটি মুজিবর হইয়া যাইব। ওই রকম মানুষ যদি সাড়ে সাত কোটি হয়, তার মানে কী দাঁড়ায়, তুমি বুঝলা!'

'সাড়ে সাত কোটি আগুন-মানুষ। হা হা হা। পাকিস্তানিগুলান খুব নাস্তানাবুদ হইব।' ব্যাঙ্গমি মুখের পালকগুলো ফুলিয়ে বলে, 'আচ্ছা, কও তো, ক্যান আমি কইলাম এই কথাটা? কোন হিসাবে যে বাংলাদেশের মানুষের জয় হইব?'
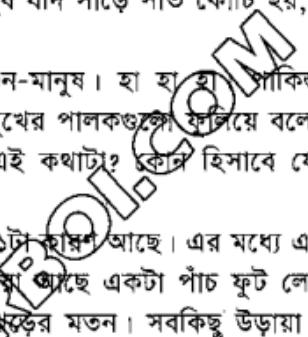
ব্যাঙ্গমা মুখ তোলে। '১০১টা কারণ আছে। এর মধ্যে একটা হইল, ছয় ফুট লোকটার ডান হাত হইয়া আছে একটা পাঁচ ফুট লোক। তার নাম তাজউদ্দীন। মুজিবর হইল ঝড়ের মতন। সবকিছু উড়ায়া নেয়। মুজিবর হইল সাগরের মতন। সবকিছু বুকে টাইনা লয়। আর তাজউদ্দীন হইল ঠান্ডা মাথার মানুষ। কথা কম কয়। আস্তে কয়। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাইখা পরিকল্পনা করতে পারে। বাঙালির পরম সৌভাগ্য যে তারা শেখ মুজিবরের মতন নেতা পাইছিল। তবে সোনার সঙ্গে সোহাগা পাইছিল তাজউদ্দীনরে।'

'বাংলাদেশ স্বাধীন হইব। হি হি হি।' দুজনে হাসতে থাকে। খলবলানো হাসি।

ব্যাঙ্গমা বলে,

বাংলাদেশটা স্বাধীন হইব একদিন।
মুজিবর নেতা তার সঙ্গী তাজউদ্দীন ॥
মুজিবর এক করে সমস্ত জাতিরে।
মুজিবর এক করে সকল সাথিরে ॥
মুজিবর অগ্নি করে সমস্ত মানবে।
তাজউদ্দীন সম্পাদক সাথে সাথে রবে ॥

ব্যাঙ্গমি বলে,

শেখ মুজিবর মানে মুক্তি স্বাধীনতা।
তাজউদ্দীনও সারাক্ষণ বলে সেই কথা ॥
বেঁচে থাকতে তাজউদ্দীন করেন সে উক্তি।
মৃত্যুতে প্রমাণ হলো সে কথার যুক্তি ॥
জীবন বিচ্ছেদময় উত্থানে পতনে।
মৃত্যু সব মিলে দেয় নিষ্ঠুর যতনে ॥

২.

'আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন? বঙ্গবন্ধুকে, না বাংলাদেশকে?' তাজউদ্দীন আহমদকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাজউদ্দীন আহমদকে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসতে হয়নি। কারণ, এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর বহু আগেই জানা।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে আসছেন, বিমানের সিঁড়িতে তাজউদ্দীন জড়িয়ে ধরলেন তাঁর মুজিব ভাইকে। পরস্পরের অশ্রু মিলেমিশে বইতে লাগল এক ধারায়। তাঁদের মাথার ওপর বাংলার আকাশ, পায়ের নিচে জন্মভূমির পুণ্য মাটি। কত দিন পর মুজিব ফিরে এসেছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মুক্তির ঠিকানায়, স্বাধীনতার আলোয় ঝলমলে বাংলাদেশে!

প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে তাঁরা উঠলেন খোলা ট্রাকে। সেখানেও ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেই তাজউদ্দীনের কানে কানে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তাজউদ্দীন, আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হব।' পরে আলোচনা করে সাব্যস্ত করা হলো, সংসদীয় গণতন্ত্রই হবে শাসনপদ্ধতি, আর বঙ্গবন্ধু হবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই দিনটা ছিল তাজউদ্দীনের এক পরম সুখের দিন। কারণ, নেতা সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্রে রাজি হয়েছেন। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধকালীন গণসংযোগ কর্তা আলী তারেকের মনে দ্বিধা, তাঁর বোধ করি মনে হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি আর তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে

রাষ্ট্র পরিচালনা করলে তা হবে সব দিক থেকে সুন্দর। আলী তারেক ছুটে গেলেন তাজউদ্দীনের কাছে, বললেন, 'আপনি প্রধানমন্ত্রী থাকুন, এখনই একটা কিছু করুন। বঙ্গবন্ধুকে বোঝান।'

তাজউদ্দীন বললেন, 'বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হবেন, এইটাই তো আমরা সবাই চাই।'

'আর আপনি?'

'আমি? আমার আবার কী চাওয়া? আমার দুইটা চাওয়া ছিল। এক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা। দুই. আমাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে ফিরে পাওয়া। আমার দুইটা চাওয়াই পূর্ণ হয়েছে। আমার তো আর কোনো চাওয়া নাই।'

তরুণ আলী তারেক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই সৌম্যদর্শন মানুষটার দিকে। তারপর বললেন, 'আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন? বঙ্গবন্ধুকে, না বাংলাদেশকে?'

তাজউদ্দীন দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আলী তারেক, আমি বঙ্গবন্ধুকে বেশি ভালোবাসি।'

তাজউদ্দীন জানতেন, গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, বাংলা, বাংলাদেশ আর বাঙালির প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভালোবাসার কোনো তল ছিল না। কোনো খাদ ছিল না। মুজিব ভাই সারাটা জীবন একটা জিনিসই চেয়েছেন, তা হলো বাঙালির মুক্তি। কাজেই মুজিব ভাইকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশকে ভালোবাসা যায়।

৩.

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমির আদি বাসস্থান আমগাছটা ছিল পরবর্তীকালে যেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগ স্থাপিত হয়, সেখানে। গাছটা কাটা পড়ে। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি হিসেবে তার একটা গুঁড়ি রেখে দেওয়া হবে।

উদ্বাস্তু ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি এসে আশ্রয় নেয় একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন চত্বরের বটগাছের ডালে। এই জায়গাটা তাদের আরও পছন্দ

হয়। এখান থেকে আকাশটা আরও বড় বলে মনে হয়। আর প্রাঙ্গণটাও কত বড়! সারা ঢাকা শহর থেকে যখন স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা এখানে এসে সমবেত হয়, সভা করে, মিছিলে মেলায় কণ্ঠস্বর, যখন তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত হয় আকাশের দিকে, তখন ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি রোমাঞ্চিত বোধ করে।

বটবৃক্ষের শাখায় বসে দুই বিহঙ্গ একদিন আবার কথা বলে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

'মুজিবুর রহমান আর তাজউদ্দীন কেমন একসাথে মিলামিশা করতেছে, খেয়াল করছ?'

'শেখ মুজিবুরের সাথে সবাই মিলামিশা কাজ করতেছে। খালি তাজউদ্দীন নাকি?'

'কিন্তু তাজউদ্দীন ঠিক রাখতেছে কাগজপত্রগুলান, দাবি-দাওয়াগুলান লিখিত-পড়িত রাখতেছে। তোমারে কইছি না, এই দুইজনের এই ভালোবাসার সম্পর্ক বাংলারে স্বাধীনতা দিব।'

'হ, তা তো কইছই। এইটাই তো পাকিস্তানের কপালে লেখা।'

'কিন্তু এই দুই নেতা তো একসময় আলাদাও হইয়া যাইব।'

'তা হইব। তখনই আসব আঘাত।'

'কেমন?'

'জানি না। কিন্তু আঘাত আসবেই। সেইটা জানি। সেই আঘাত সামলানো কঠিন হইব। নেতারা মারা পড়ব। দেশটাও অন্ধকারের মেঘের নিচে ছাইয়া থাকব। দেশটারে বহুদিন আর চেনাই যাইব না।'

ব্যাঙ্গমা বলে,

> 'মুজিবর-তাজউদ্দীনে দূরত্ব যখন হয়।
> বাংলার আকাশে তখন ঘোর দুঃসময় ॥'

ব্যাঙ্গমি বলে,

> 'ঘোর দুঃসময় ছায় বাংলার আকাশ।
> অশ্রু রক্ত অন্তর্ঘাত নিহত বিশ্বাস॥
> হালভাঙা নৌকা যেন বিক্ষুব্ধ সাগরে।
> ছেঁড়া পাল চিহ্নহীন ডুবে যেন মরে ॥'

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি মন খারাপ করে।

আর বটগাছের পাতাগুলো হয়ে পড়ে নিথর। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই রোদ মরে যায়। ছায়া নেমে আসে।

কিন্তু আমেরিকার ভার্জিনিয়ায় সিআইএ সদর দপ্তরের টেলেক্স মেশিনের পাতাগুলো নিশ্চল হয় না। তারা নড়তে থাকে।

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমির এই কথাগুলো ধরা পড়ে সিআইএর রাডারে। তারা পুরোটা ধারণ করে এবং কথাগুলোর মর্ম উদ্ধারে তৎপর হয়। তারা বলে, গ্রিসের রাজনীতিতে একদা অ্যাপোলোর এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর ভূমিকা ছিল বটে। সফোক্লিসের ইদিপাসে দৈববাণী উচ্চারিত হয়েছিল, ইদিপাস নিজের পিতাকে হত্যা করবে, আর সঙ্গম করবে নিজের মাতার সঙ্গে। পুরো নাটকে থাকে সেই পরিণতি এড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু সেই নিয়তিকে এড়ানোর সব চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিকেই ফলিয়ে তোলে। এসব পুরাণকথা। বাস্তবে অ্যাপোলো এখন নাসার নভোযানের নাম, ফলে অ্যাপোলো এখন আমাদের। বস্তুত আমরাই অ্যাপোলো। আমরাই নির্ধারণ করব পৃথিবীর কোথায় কী ঘটবে। কে সিংহাসনে বসবে, কে সিংহাসনচ্যুত হবে, কে হবে রাষ্ট্রনায়ক, কে স্বায়ত্তশাসন পাবে আর কে হবে আরও অধীন, সেসব ঠিক করবে কারা? আমরা। কে বেঁচে থাকবে, কে মারা যাবে, তা তো এখন আমাদের হাতে।

তাহলে কারা এই ভবিষ্যদ্বক্তা! কেন তারা এই ভবিষ্যদ্বাণী করছে? কী তাদের উদ্দেশ্য? তাদের ক্ষমতার উৎসই বা কী?

আমরা যদি আজকের দিনেও গ্রিক ট্র্যাজেডিগুলোর মতো অলৌকিক হাতে নিয়তি নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে রাখি, তাহলে আমরা আর আমেরিকা কেন? কী লাভ তাহলে আমাদের অ্যাটম বোমা রেখে? কী লাভ চাঁদের উদ্দেশে মানুষ পাঠিয়ে? কী লাভ সিআইএর অ্যাকাউন্ট থেকে মাসে মাসে, সপ্তায় সপ্তায় বেতন তুলে!

'আমরা ঘটনা ঘটাব আমাদের ইচ্ছা অনুসারে।'

'কী ঘটাব?'

'আমরা আমাদের লোক ঢুকিয়ে দেব এই দুজনের মাঝে।'

'কাকে ঢোকাব?'

'বললামই তো, আমাদের লোক।'

'কে সে?'

'আছে। তাজউদ্দীন ছাড়াও মুজিবের খুব কাছে যথেষ্ট পারঙ্গম লোক আছে।'

'তা তো আছেই। অনেকেই আছে।'

'না। অনেকের কথা হচ্ছে না। হচ্ছে একজনের কথা।'

'কার কথা?'

'সে আমাদের লোক।'

'কে সে?'

'মুজিবের পিছে পিছে সে ছায়ার মতো লেগে থাকে। মাথায় জিন্নাহ টুপি! লোকটা ছোটখাটো। মিনমিন করে সব সময়। হাত কচলায়।'

'বুঝেছি বুঝেছি। আর বলতে হবে না। একজনই আছে এই রকম, যে বলে বেড়ায় যে সে আমাদের লোক। আচ্ছা, তাকে আমরা লাগিয়ে রাখলাম। তারপর আমরা কী করব?'

'আমরা দেখব আর উপভোগ করব। নিয়তির নির্ধারক আমরাই। পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ কাজ করবে তার নিজের সাধ্যমতো, কিন্তু ফল ভোগ করবে আমাদের মর্জিমাফিক। প্রাচীন গ্রিসের উঁচু পাহাড়ের শানুদেশে ছিল ডেলফি। ক্যাস্টালিয়া ঝরনার জলপ্রপাত, গভীর খাদ থেকে উঠে আসা বাষ্পমালা, তারই আড়ালে তিন পা-অলা চৌকি থেকে উচ্চারিত হতো অ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণী। মানুষকে সেসব পথ দেখাত। কখনো বা জানিয়ে দিত, তাদের মুক্তি নাই, পথ যতই খোঁজা হোক না, ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারবে না। এখন সেই গ্রিস নাই, সেই অ্যাপোলো নাই, সেই ভবিষ্যৎ বলনেওয়ালি পাইথিয়া নাই। এখন আছে আমাদের মহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আছে ল্যাংলে ভার্জিনিয়া, আছে হোয়াইট হাউস, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, পেন্টাগন। এখন আমাদের কণ্ঠই একমাত্র দেববাণী। আমাদের ইচ্ছাই একমাত্র স্বর্গীয় ইচ্ছা। এই সময়ে, এই বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে, বাংলা নামের ওই স্থানটিতে এ কোন রহস্যময় কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছে এ কোন নতুন ওরাকল?

সত্য বটে, বাংলা চিরকালই গণ্য ছিল রহস্যলোক হিসেবে। হিমালয়ের পাদদেশে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে এ হচ্ছে পৃথিবীর উর্বরতম জায়গা, যেখানে বীজ পড়ার আগেই প্রাণের সঞ্চার ঘটে! এ হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে বিদেশিরা সহজে ঢুকতে পারে না; কিন্তু একবার গেলে আর ফিরতেও পারে না, যেখানে জায়নামাজে চড়ে নদী পেরিয়ে যান আউলিয়ারা; সেখানে এমন কিছু ঘটতে পারে বটে। এখনো!'

'কোথা থেকে এল ওই কণ্ঠস্বর! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে! কারা কথা বলছিল তখন!' কূলকিনারা করে উঠতে পারে না ঝানু এজেন্ট

আর তাদের গুপ্তালাপ-বিশেষজ্ঞরা। তারা কেবল মাথা ঝাঁকায় আর বলে, 'ও মাই গড, ক্যান ইউ বিলিভ ইট!'

৪.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন চত্বরের বটগাছটাও একদিন কাটা পড়ল। আবার উদ্বাস্তু হয়ে পড়ল বিহঙ্গদ্বয়।

ষাটের দশকের শেষের দিকে যে তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হয় বাংলায়, তখন এই বটগাছও তার ছায়াদায়ী ভূমিকা রাখতে থাকে। আন্দোলনের দিনগুলোয় ওই বটগাছের নিচেই হতো ছাত্র সভা-সমাবেশ। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাংক আর কামান নিয়ে হামলে পড়ল নিরস্ত্র ঘুমন্ত ঢাকাবাসীর ওপর, কামান দাগল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোয়, কাতারবন্দী করে হত্যা করল ছাত্রদের, ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর চালাল স্টেনগানের গুলি, বিছানা-বালিশ ভাসিয়ে দিল রক্তে, বস্তির পর বস্তি জ্বালিয়ে দিয়ে কালো রাতের আকাশ করে তুলল রক্তিমাভ, সেই দিনও ত্রিকালদর্শী ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি ওই বটগাছের আশ্রয়টুকু ছেড়ে যায়নি।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানি শাসকদের আক্রোশ গিয়ে পড়ল ওই বটগাছের ওপর। তারা মজুর জোগাড় করল অনেক কজন, ওরা একযোগে শুরু করল কুঠার চালনা। ব্যাঙ্গমা বলল, 'কী মূর্খ! আর কী নিষ্ঠুর!'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'আর কী আক্রোশ! একটা নিরীহ বটগাছকেও ওরা বাঁচতে দিতে চায় না।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'কুড়াল দিয়া কি আর বটগাছ কাটা যায়? আরে মূর্খ, ইলেকট্রিক করাত আন।'

তারপর এল ইলেকট্রিক করাত। বিপুল জিঘাংসা নিয়ে বটগাছের শরীরে ওরা চালাল করাত। গুঁড়ো গুঁড়ো হলুদ রক্তে ভেসে যেতে লাগল জায়গাটা।

একাত্তরের এপ্রিলের ৪ তারিখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ওই বটগাছের। তখনো চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন। জগন্নাথ হলের নিহত ছাত্রদের যে গর্তে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল, সে মাটি তখনো কাঁচা। মুহসীন হল গোলার আঘাতে আংশিক ধ্বস্ত। রমনার কালীবাড়ি মন্দির মিশে গেছে মাটির সঙ্গে।

বটগাছটা যখন হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল ডালপালাসমেত, তখন ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি উড়াল দিল আকাশে। উড়তে উড়তে তারা বলতে লাগল, 'পাকিস্তানি শাসকরা ভাবতেছে, গায়ের জোরে ইতিহাসের গতি বদলায়া দেওন যায়, বন্দুকের নলের মুখে মানুষের দাবি রোধ করা যায়, বটগাছ কাইটা ফেললে ইতিহাস কাইটা ফেলা যায়। এইটা ভুল।'

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি গিয়ে বসল রমনা পার্কের অশ্বত্থগাছটায়।

এই গাছটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের ইতিহাসে।

যখন বিশ শতকের ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিদের বাধা দিতে লাগল রবীন্দ্রসংগীত গাইতে আর রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালনে, যখন শাড়িকে বলা হতে লাগল হিন্দুয়ানি পোশাক, কাফেরদের পোশাক, যখন আরবি-ফারসি কিংবা রোমান অক্ষরে বাংলা লেখার চেষ্টা চলতে লাগল, তখন এই অশ্বত্থতলে সমবেত হতে লাগল বাঙালিরা, প্রতিবছর পয়লা বৈশাখে, বাংলা নববর্ষ পালনের উদ্দেশ্যে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ-শিশু এই বিটপীতলে সমবেত হয়ে গেয়ে উঠল বর্ষবরণের গান: এসো হে বৈশাখ।

কাজেই জায়গাটা অপছন্দ হলো না ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির।

ব্যাঙ্গমা বলল, 'ঢাকা ইউনিভার্সিটির হেড দারোয়ান জামালউদ্দীন ঠিক কাজটাই করছে। আবার একটা বটগাছের চারা নিয়া যত্ন কইরা লাগায়া দিছে আগের জায়গাতেই।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'হ। ঠিকই করছে লোকটা। আর কী কইতেছে, শুনো। পানি দেয় আর কয়, আর তো শত্রু নাই। এইবার গাছ বড় হইলে আর কেউই কাটতে পারব না!'

'হুম। কাটতে পারব না। দেশ স্বাধীন। পাকিস্তানি বাহিনী সারেন্ডার করছে। মুজিব ফিরা আইছে। তাজউদ্দীন তার হাতে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার বুঝায়া দিয়া কী শান্তি পাইছে! বলে, আজকে আমার সবচেয়ে সুখের দিন। সবচেয়ে শান্তির দিন। আমি চাইছি, নেতা পার্লামেন্টারি ফরম মাইনা নিক। উনি মাইনা নিছেন।'

'আর ওই যে কইল, দেশের চাইতেও বেশি ভালোবাসি বঙ্গবন্ধুরে। সেইটা?'

'সেইটা তো ঠিকই কইছে। ২৮ বছরের ভালোবাসা। ২৮ বছর আগে ১৯৪৪ সালে দুইজনের পরিচয়। একাত্তরে যুদ্ধের সময় একটা দারুণ কথা কইছিলেন তাজউদ্দীন। *জয়বাংলা* পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিয়া কইলেন, সেই চুয়াল্লিশ সালে পরিচয়। আমি মুজিব ভাইরে কোনো দিনও হারতে দেখি নাই। এইবারও ওনার জয় হইব।

সাতাশ বৎসর চিনি মুজিব ভাইরে।
পরাজিত হতে তারে আমি দেখি নাই রে ॥
এমনি বিশ্বাস ছিল তাজউদ্দীনের।
অমোঘ বন্ধন যেন অনন্ত দিনের ॥

৫.

তিন বছরের ফুটফুটে মেয়েটা। পূর্বপুরুষ এসেছিলেন আরব দেশ থেকে, ইসলাম প্রচারের জন্য। ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে নদনদীধোয়া পাণ্ডববর্জিত চরাঞ্চলে কেন তাঁরা এসে আস্তানা গেড়েছিলেন, বলা মুশকিল। আশ্চর্য যে পশ্চিম দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাঁরা এসেছেন, পশ্চিমের চেয়ে পুবে, এই পূর্ব বাংলায় তাঁরা তাঁদের প্রচারকাজে বেশি সফল হলেন, পূর্ব বাংলার কৃষকেরা ইসলাম গ্রহণ করল বেশি। এই প্রদেশে মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মেয়েটার নাম রেনু। পূর্বপুরুষের গায়ের ধবধবে সাদা রংটা পেয়েছে সে, আর পেয়েছে চোখের ঈষৎ কটা ভাবটা। গোলগাল চেহারা।

তাদের নিকটতম পূর্বপুরুষদের অবশ্য ব্যবসা ছিল কলকাতায়।

ছোট্ট মেয়েটা গুটি গুটি পায়ে হাঁটে, আধো আধো কথা বলে, নতুন নতুন শেখা শব্দ বলে সবাইকে উদ্বেলিত করে, মাটিতে বসে কাঠি দিয়ে ছবি আঁকে। উঠোনে মা-মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো মুরগির ছানা আর গোটা পাঁচেক হাঁসের ছানা নিয়ে। হঠাৎ চিলে ছোবল দিয়ে মুরগির ছানা তুলে নিয়ে গেলেই কককক করে ডেকে ওঠে মা-মুরগি। রেনু ভয় পেয়ে

কেঁদে উঠলে রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন মা, তাকে কোলে তুলে নেন। মেয়েটির পুতুল খেলারও বয়স হয়নি। তার পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, একা একা কোথাও গেলে যেন খুঁজে পাওয়া যায়। উঠোনে মাদুরে তাকে বসিয়ে সামনে একটা কাঁসার বাটিতে কিছু খই দিয়ে রাখলেই সে দিব্যি বসে থাকে। লালা ফেলতে ফেলতে খই তুলে খায়। খায় যত, তার চেয়ে বেশি ছিটায়। মুরগি আর পায়রারা তখন তাকে ঘিরে ধরে।

আর আছে তার খেলার সাথি। তার চেয়ে দুই বছরের বড় তার বোন। বুবু তার মাথার চুল আঁচড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তার নাকের নিচে ঝুলে থাকা সর্দি মুছে দেয় নিজের জামার কোঁচা দিয়ে।

কিন্তু মেয়ে দুটোর জীবনে এক আলোকিত দুপুরে হঠাৎ নেমে এল দুখের কুয়াশা। তাদের বাবা শেখ জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করলেন। রেনু দেখল, উঠোনভরা মানুষ, মেয়েদের মাথায় কাপড়, ছেলেদের মাথায় টুপি। চারদিকে কান্নার রোল। সবচেয়ে বেশি কাঁদছেন মা।

বুবু এসে বলল, 'রেনু, তুই কেন্দে নে। কাঁদলে বুকটা হালকা হবি।'

বাবাকে উঠোনে গোসল করানো হলো, সাদা কাপড় পরিয়ে তাঁকে একটা খাটিয়ায় তুলে লোকজন কাঁধে করে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলতে বলতে। মা কাঁদছেন, মাথায় বড় ঘোমটা দেওয়া মহিলারা কোরআন শরিফ পড়ছে আর তসবিহ গুনছে। আগরবাতির ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

রেনুর দাদা তখনো বেঁচে। বিষয়-সম্পত্তি তাদের ভালোই ছিল, কিন্তু বাবা মারা গেছেন, দাদা বেঁচে আছেন, এই অবস্থায় নাতি-নাতনিরা দাদার সম্পত্তির কোনো ভাগই পাবে না, এই ছিল আইন। রেনুর মা তাই নিঃস্ব হয়ে যেতে পারতেন। মা এক কাজ করলেন—তিনি দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। রেনুকে বিয়ে দেওয়া হলো একই বংশের শেখ লুৎফরের ছেলে খোকার সঙ্গে। একই বাড়ি তাদের, আলাদা ঘর, তারা নিকট-প্রতিবেশী।

দাদার ছেলে ছিল একটাই। তিনি তাঁর ছেলের প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ দুই নাতনির নামে লিখে দিলেন, আর রেনুর সম্পত্তির গার্জিয়ান করলেন বরের আব্বা শেখ লুৎফরকেই।

বিয়ের মর্ম রেনু কী বুঝল, সে-ই জানে!

খোকাই বা কী বুঝল! সে তো ব্যস্ত ছিল তার দুরন্তপনা নিয়ে। ফুটবল খেলত সে। বাবা লুৎফর রহমানও খেলোয়াড় ছিলেন। মাঝেমধ্যে বাবা-

ছেলেও নেমে পড়তেন মাঠে। রোগা একরত্তি একটা ছেলে খোকা। ফুটবলে লাথি মারলে ফুটবল নড়ে না, নিজেই উল্টো পড়ে যায়। বাবা হেসেই গড়াগড়ি খান। খোকা রেগে যায়।

বাড়ির কাছে বাইগার নদী। মধুমতী নদীর একটা শাখা। কিন্তু বর্ষাকালে সেই নদীই দুই কূল উপচে যেন সাগর হয়ে যায়। শীতকালে একটা পোষমানা শীর্ণ স্রোতধারা মাত্র। নদীতে সাঁতার কাটা খোকার একটা প্রিয় কাজ।

মা খুব নিষেধ করতেন খোকাকে, 'নদীতে যাস নে খোকা।' তাঁর মনে ভয়, কখন কী হয়ে যায়! দুই মেয়ের পরে তাঁর এই ছেলে। ছেলে বাড়িতে কুকুর পোষে। সারাক্ষণ ভুলু তার পায়ে পায়ে ঘুরছে। খোকা একদিন একটা বানরের বাচ্চা ধরে নিয়ে এল কোত্থেকে। কী? না, সে বানর পুষবে। ছোট বোন হেলেনের দায়িত্ব বানরকে দেখাশোনা করা। খোকা পড়ে গ্রামেরই স্কুলে। গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। বাড়ির এক পাশে খালের ওপরে বড় কাচারিঘর। তার পাশে মাস্টার, পণ্ডিত আর মৌলভি সাহেবদের থাকার ঘর। দুরন্তপনা করে বেড়ালেও খোকার মুক্তি নাই। মাস্টার পড়ান ইংরেজি আর অঙ্ক, পণ্ডিত পড়ান বাংলা আর মৌলভি পড়ান আরবি।

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে খোকাদের শেখবাড়ি। পূর্বপুরুষেরা কোঠাবাড়ি বানিয়েছিলেন। নদীপথে ইট, কাঠ আর মিস্ত্রি এসেছিল কলকাতা থেকে। সেই দালানটায় এখন আর কেউ থাকে না। খোকাদের বাড়িটা পাকা। সুন্দর ছিমছাম ঘরের সঙ্গে ছোট্ট বারান্দা। উঠোন পেরিয়ে দূরে খোলার ওপরে কাচারিঘর। চারদিকে আম-জাম-তাল-সুপুরিগাছের ঝাড়, বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়।

বাড়ি থেকে স্কুল মাইল খানেক দূর। নৌকায় চড়ে খোকা স্কুলে যায়। প্রথমে খাল, তারপর বাইগার নদী। একদিন নৌকা গেল ডুবে, বই-খাতাসমেত খোকা ভাসতে লাগল, কিন্তু বই সে ছাড়বে না। মাঝি তাকে কোলে তুলে নিয়ে তীরে উঠল। ভেজা জামায় আর স্কুলে যাবে কী। ফিরিয়ে আনা হলো বাড়িতে। দেখে মা অস্থির। রোজ এই ছোট নৌকায় স্কুলে যাওয়া। ভাগ্যিস এখন নদীতে পানি কম, স্রোতও নাই। বর্ষাকালে হলে মাঝি নিজেকে সামলাত, নাকি খোকাকে বাঁচাতে যেত! না, স্কুল বদলাও।

খোকার বাবা শেখ লুৎফর রহমান চাকরি করেন গোপালগঞ্জে।

গোপালগঞ্জ কোর্টের সেরেস্তাদার। ছেলেকে তিনি ভর্তি করালেন গোপালগঞ্জ সীতানাথ একাডেমিতে। তৃতীয় শ্রেণীতে। বাবার সঙ্গে গোপালগঞ্জেই থাকে খোকা। মাঝেমধ্যে বাড়ি আসে। এসেই প্রথমে খোঁজ করে কেমন আছে তার কুকুর, কেমন আছে পোষা বাঁদরটি। এই সব নিয়েই যখন সে ব্যস্ত, তখনই একদিন বাবার হাত ধরে বাড়ি ফেরা। আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন মা। ওই যে খাল থেকে উঠে আসছে খোকার বাবা আর খোকা।

হঠাৎ বাড়ি আসা কেন?

'খোকা, তোর বিয়ে।'

কী বুঝেছিল খোকা তখন? বিয়ে কী? কার সাথে বিয়ে?

'রেনুর সাথে। তোর জহুর চাচার মেয়ে।'

খোকাকে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরানো হলো। মাথায় পরানো হলো কিস্তি টুপি। খোকা চলল বিয়ে করতে। একই বাড়ি। হেঁটেই চলল বরযাত্রী। মৌলভি এলেন। কনে বসে আছে শাশুড়ির কোলে। কবুল বলো, মা, কবুল বলো। অতটুকু মেয়ে কবুল বললেই কী, না বললেই কী। কনের পিতামাতা রাজি থাকলেই হলো।

মৌলভি সাহেব দরুদ শরিফ পড়তে লাগলেন। তারপর দোয়া। ভেতরবাড়িতে খবর পাঠাও। এখন মোনাজাত হবে। মহিলারা অন্তঃপুরে বসে দুই হাত তুলে মোনাজাতে শামিল হলো। টুপি পরে বসে ছিল বর। তার হাতে কে যেন ধরিয়ে দিয়েছিল রুমাল। সেটা মুখে চেপে রেখেছিল সে। মোনাজাতের সময় সে মুশকিলে পড়ল। এক হাতে রুমাল ধরে এক হাতে মোনাজাত করবে? নাকি মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে দুই হাতে মোনাজাত করবে?

শেষে সে দুই হাতই মুখের কাছে এনে রুমালসমেত মুখটা ঢেকে রাখল।

আমিন।

বাবা বললেন, 'খোকা, দাঁড়িয়ে সবাইরে সালাম দ্যাও।'

খোকা দাঁড়িয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

'এই তবারক দ্যাও। তবারক।'

খোরমা বিতরণ করা হলো সমবেতদের মধ্যে।

ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল।

'বউরে কোলে ন্যাও। বউরে কোলে ন্যাও।' পরের দিন রেনুকে কোলে

করে এনে একজন উঠোনে খুঁজে বের করলেন খোকাকে। 'কই থাকো তুমি, তোমারে পাই না।' ভাবিগোত্রীয় তরুণীটি হাসিতে ঢলে পড়ছেন। 'দুলারে আমি আর রেনু বলে কত খুঁজলাম। ল রেনু, দুলার কোলে উঠ।'

'যাও।' খোকা লজ্জা পায়। বউকে সে কোলে নেবে না।

নেবে না বললেই হলো! তার কোলে রেনুকে চাপিয়ে মহিলা দূরে সরে যান। খিলখিল করে হাসতে থাকেন।

খোকা কী করবে এখন। বাচ্চাটাকে নামিয়ে দেবে?

বিকেলে আবার নৌকায় উঠে গোপালগঞ্জ যাত্রা। প্রতিবার গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় খোকার মন খারাপ লাগে। মাকে ছেড়ে যেতে হয়। মায়ের শাড়িতে একটা আশ্চর্য গন্ধ আছে। সেইটা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তার ওপর তার পোষা প্রাণীগুলো তাকে দেখলেই কেমন করে। ভুলু নামের কুকুরটা তো তার পিছে পিছে ঘোরে। তার গায়ের গন্ধ শোঁকে। যেন বলতে চায়, এত দিন আমাদের ছেড়ে কোথায় ছিলে?

আর মা? মা যে কী করেন তাকে পেলে! কী যে ব্যস্ত হন! আগে গ্রামের স্কুল থেকে সে যখনই আসত, প্রথমেই পিঁড়িতে বসে কাঁসার বাটিতে এক বাটি দুধ খেতে হতো ভাত দিয়ে। সঙ্গে গুড় অথবা কলা। গুড় মাখলেই দুধ লাল হয়ে যায়। এখন গোপালগঞ্জে দুধ পাওয়া যায় কি না, সেই দুধ খাঁটি কি না, এই সব নিয়ে মা যে কত প্রশ্ন করেন!

আজ শুধু মা নয়, এই গ্রামের খেলার সাথি নয়, নয় শুধু পোষা প্রাণীগুলো; তার খুব মনে পড়ছে রেনুর কথা। ছোট বাচ্চা একটা। কেমন করে তার কোলে উঠে তার চুল টেনে দিয়েছিল।

নৌকায় উঠে বসে আছে খোকা। পাশে বাবা। নৌকা চলছে। লগি ঠেলছে বিমল মাঝি। পানি দুভাগ করে নৌকা এগিয়ে চলেছে। খালের পাড়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছে বোনেরা। আর দাঁড়িয়ে আছেন চাচি। গতকাল থেকে তার শাশুড়ি তিনি।

চাচি কোলে রেনুকে নিয়ে এলেই তো পারতেন। বাড়িতে রেনু কার কাছে?

খোকা আকাশের দিকে তাকায়। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। সে নিচে তাকায়। জলে তার ছায়া পড়েছে। পানির পোকা লকলকিয়ে ছুটে যাচ্ছে পানির ওপর দিয়ে, তিরতির করে কাঁপছে পানি। সে নৌকার পাটাতনে বসে হাত বাড়িয়ে পানি ছোঁয়। একটা কলমিলতার পাতা ছিঁড়ে নেয়। বাবা বলেন, 'বেশি ঝুঁকে বইসো না খোকা। পানিতে পড়ে যাবানে।'

বাবার কথা খোকার কানে ঢোকে, মনে ঢোকে না।

আজ তার গোপালগঞ্জ যেতে ইচ্ছা করছে না।

রেনুর দুখের দিন ফুরোয় না।

দুই বছর পর তার মা-ও মরে যায়।

বাবা যখন মারা যান, তখনকার কথা তার কিছুই মনে নাই। কিন্তু মায়ের মৃত্যুটা সে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে। মা আর আসবেন না। মা মরে গেছেন। তার বুবু তাকে বোঝায়। বাড়িময় কান্না। চাচিরা, খালারা এসে তাকে কোলে নিয়ে কাঁদছে। হঠাৎ সে আর বুবু সবার মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে পড়েছে।

মাকে গোসল করানো হয় চাদরঘেরা একটা জায়গায়, উঠোনের এক কোণে। গাছের নিচে। মাকে নিয়ে যাচ্ছে খাটিয়ায় করে। আগরবাতির ধোঁয়া পেরিয়ে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দুই বোন সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

তাদের চোখে জল।

আত্মীয়ারা বিলাপ করছে। মুরব্বিরা ধমক দেন, 'মাইয়া মাইনষের গলা বাইরে যায় ক্যান। জানো না, কানলে মুর্দার কষ্ট হয়। আল্লাহ-রসুলের নাম লও। দোয়া-দরুদ পড়ো।'

রেনুর পিঠে হাত। সে পেছনে তাকায়।

দুলার মা। তারও মা। সায়রা বেগম, তার শাশুড়ি তাকে কোলে তুলে নেন। তারপর সোজা নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে।

রেনু শাশুড়ির কাঁধে মুখ লুকায়। তার ভারি কান্না পায়। কিন্তু সে মাকে না ডেকে বাবাকে ডাকতে থাকে 'বাবা বাবা' বলে। হয়তো তার মায়ের স্মৃতি এখনো জ্বলজ্বল করছে, বাবার মুখটাও ধূসর হয়ে এসেছে, শাশুড়ির কোলে উঠে মায়ের মৃত্যুদিনে তাই সে বাবাকে ডাকছিল। সায়রা বেগম নিজের চোখের জল সামলানোর বৃথা চেষ্টা করতে করতে বলেন, 'আমিই তোর বাবা, রেনু রে, আমিই তোর বাবা।'

খোকা আসে মাঝেমধ্যে গোপালগঞ্জ থেকে। এলেই পাড়ার ছেলেমেয়েরা খালপাড়ে ভিড় করে। রেনুর কাছে খবর নিয়ে আসে শেফালি, বুলি, জরিনারা। দুলা এসেছে। দুলা এসেছে। রেনু বুঝত না যে তাকে খবরটা কেন বিশেষভাবে দেওয়া হচ্ছে। সে-ও ছুটে যেত নদীর ধারে, কিংবা তার 'বাবা' সায়রা বেগমের কাছে, তার হলুদের গন্ধমাখা আঁচলে মুখ লুকিয়ে বলত, 'বাবা, দুলা এসেছে।'

দুলা বাড়িতে নেমে জুতা-স্যান্ডেল ছুড়ে মেরে মায়ের হাতে দুধভাত খেয়ে প্রথমে যেত বাঁদরটার কাছে। লালু তো আগেই তার পায়ে পায়ে ঘুরতে শুরু করেছে। তারপর পাড়াটা ঘুরে এসে বন্ধুবান্ধবের খবর নিয়ে ঝিমধরা বিকেলে তারা কাচারিঘরের চৌকিতে শুরু করত পুতুল খেলা।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের দলের এই খেলায় পুতুলের বিয়ে হতো। ছেলেপুতুল মেয়েপুতুলের মা-বাবা সাজত ছেলেমেয়েরাই। খোকাও সেই খেলায় মেতে উঠত।

হঠাৎ কী একটা ব্যাপারে রেনুর ওপরে রাগ করল খোকা। তাকে একটা আলতো করে ধাক্কা দিতেই সে গাল ফুলিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল, 'দুলা আমারে মেরেছে। দুলা আমারে মেরেছে। বাবা বাবা, দেখো'—বলে সে সোজা চলে গেল তার শাশুড়ি সায়রা বেগমের কাছে।

'কী হয়েছে রে, মা। কান্দিস ক্যান?'

'দুলা আমারে মেরেছে।'

সায়রা বেগম হাসি গোপন করে মুখটা গম্ভীর করে তুলে বলেন, 'খোকার তো সাহস বড় কম নয়। আমার মায়ের গায়ে হাত তোলে। খোকা খোকা...'

খোকা আসে। 'মা, ওরে আমি মারি নাই, মা। ও বানায়ে বলে।'

'না, মারিস নাই। ও বানায়ে বলে। না মারলে ও কান্দে ক্যান?'

'আরে, একটু হাত দিয়ে সরায়ে দিতে গিয়েছিলাম। সাথে সাথে কানতে শুরু করেছে।'

'না, মারবি না। দেখি পিঠটা।' খোকা পিঠ এগিয়ে দিলে মা তার পিঠে নিজের হাতটা রেখে সেই হাতে চড় মারেন। মারের শব্দ হয়। রেনু তাতেই খুশি। চোখের জল সামলে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে। সায়রা বেগম বলেন, 'হয়েছে? খুশি এখন?'

'হুঁ,' জামা সামলাতে সামলাতে রেনু বলে।

'এখন এসো, হাতমুখ ধোও। দুধভাত দিই। খাও।'

দুজনে পিঁড়ি পেতে বসে রান্নাঘরে। মা দুজনের সামনে দুটো কাঁসার বাটিতে দুধ দেন। দুধের পাতিলে সর ভাসছে। তিনি সরটা তুলে দুভাগ করে দুজনের মুখে পুরে দিতে চামচ বাড়ান। খোকা মুখ ফিরিয়ে নেয়। রেনু সর খেতে পছন্দ করে। সে দিব্যি খেয়ে নেয়।

গুড়ের কৌটায় পিঁপড়া উঠেছে। রেনুর দুধের বাটিতে পিঁপড়া সাঁতার কাটছে। রেনু বলে, 'দুলা, দেখো কী?'

'কী?'

'পিঁপড়া।'

খোকা বলে, 'মা, একটা চামচ দ্যাও তো। পিঁপড়াটা তুলি।' তার নাকের নিচে দুধের গোঁফ।

চামচ দিয়ে পিঁপড়া তোলা বড় মুশকিল। ভাসমান পিঁপড়ার নিচে চামচ ধরে দুধটা তুলতে পিঁপড়াটা ঠিক পড়ে যায়। খোকা কয়েকবার চেষ্টা করে। পারে না রেনুর পাতের পিঁপড়াটা তুলতে। শেষে বলে, 'খাও একটা পিঁপড়া, সাঁতার শিখতে পারবা।'

মা হাসেন। দুটো ক্ষুদ্র হৃদয়ের এই সব সামান্য কাণ্ডকীর্তি তাঁর মাতৃহৃদয়ে এক অপার্থিব মায়ার সঞ্চার করে। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ্ এদের বাঁচায়ে রাখুক।

খোকার বয়স ১৪। গোপালগঞ্জ থেকে বাবা বদলি হয়েছেন মাদারীপুরে। ছেলেকেও বাবা নিয়ে চললেন তাঁর সঙ্গে। মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে সে ভর্তি হয় ক্লাস ফোরে। বাবার কাছে থেকে সে স্কুলে যায়। বাবার আশা, ছেলে বড় হয়ে আইনজীবী হবে। আদালতের সেরেস্তাদার বাবা দেখেন, উকিলদের বড় সম্মান, বড় প্রতিপত্তি। আল্লাহর রহমতে ছেলে তাঁর এই রকম কোনো ডাকসাইটে উকিল যদি হতে পারে, তাঁর মনের সাধ পূর্ণ হয়। ছোট ছেলে নাসের তো এখনো ছোট। তার মধ্যে ছোটবেলায় নাসেরের পোলিও হয়েছিল, একটা পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছেলেটা খুঁড়িয়ে হাঁটে। তার জন্যও বড় মায়া হয় লুৎফর রহমানের।

খোকা পড়তে পারছে না। বলে, 'বাবা, বই পড়তে পারি না। সবকিছু ঝাপসা দেখি।' এ অবস্থায় কিসের লেখা, কিসের পড়া। বাবা মাদারীপুরের সবচেয়ে বড় চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। নানা ওষুধপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু ছেলের চোখের জ্যোতি দিন দিন যেন কমেই যাচ্ছে। আশপাশে যেখানে যে ডাক্তারের নাম শোনেন, বাবা তাঁর কাছেই নিয়ে যান ছেলেকে। কোনো লাভ হয় না।

ডাক্তাররা বলেন, 'ছেলের বেরিবেরি হয়েছে। তাকে বেশি করে ঢেঁকিছাঁটা লাল চাল খাওয়ান। ভিটামিন বি-এর অভাবে এই রোগ হয়। সেখান থেকে নার্ভের সমস্যা হতে পারে।'

ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসেন তিনি। আপাতত বাড়িতেই থাকুক।

বাড়িতে সব সময় ঢেঁকিছাঁটা চালই খাওয়া হয়। এই কদিন

গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর করেই ছেলের শরীরটা গেছে।

রেনুর বয়স সাত বছর। রেনু এখনো বোঝে না, দুলা মানে কী। তবে দুলার শরীরটা ভালো না, এখন তার যত্নের প্রয়োজন, ওইটুকুন মেয়ের সেই উপলব্ধিটা ঠিকই আসে। কোত্থেকে আসে, আল্লাহ মালুম। সে দুলার কাছে যায়। নিজের জামার খুঁট কামড়ে ধরে বলে, 'দুলা, তোমার কী হয়েছে?'

'আমার? না, কিছু হয় নাই।'

'তাইলে যে সবাই কয় তোমার অসুখ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। লাল চাউল খাওয়ার অসুখ।'

'হি হি হি। সেইটে কী ধরনের অসুখ?'

'এই অসুখ হলে খালি লাল চাউল খেতে হয়।'

'তুমি আর যাবা না নে?'

'কোথায়?'

'মাদারীপুর?'

'না। আপাতত বাড়িতেই থাকব। বাড়িতে থাকব আর হামিদ মাস্টারের কাছে পড়ব।'

'আমিও মাস্টারের কাছে পড়ব।'

'না, তুমি পড়বা আমার কাছে।'

গৃহশিক্ষক আবদুল হামিদ ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। স্বদেশি করতে গিয়ে জেল খেটেছেন। হামিদ মাস্টার খোকাকে পড়াতেন। খোকার চোখ খারাপ। কাজেই যতটা না পড়ত, তার চেয়ে বেশি শুনত গল্প। হামিদ মাস্টার তাকে শোনাতেন মাস্টারদা সূর্য সেনের গল্প, তিতুমীর আর ক্ষুদিরামের গল্প।

খোকা জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, জেলে তো যায় চোর-ডাকুরা। আমরা চোর-দারোগা, বাবু বাবু খেলি না! আপনি স্যার জেলে গিয়েছিলেন? আপনার খারাপ লাগে না?'

হামিদ মাস্টার বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান, শোনো, দেশের জন্য যদি কেউ পুলিশের হাতকড়া পরে, বুঝবা দেশমাতা তাকে গলায় ফুলের মালা পরাবেন। দেশের জন্য জেলে যাওয়া গৌরবের ব্যাপার।'

হামিদ মাস্টার খোকাকে ডাকেন পুরো নাম ধরে।

'এই যে সূর্য সেনের ফাঁসি হয়ে গেল, সূর্য সেন কি চোর ছিলেন? তিনি

হচ্ছেন বিপ্লবী। ফাঁসির আগে তিনি কী বলে গেছেন? বলেছেন, "মৃত্যু আমার দরজায় কড়া নাড়ছে। আমার আত্মা উড়ে যাচ্ছে অনন্তের দিকে, আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব আমার প্রিয়তম বন্ধুর মতো, এই সুখী, পবিত্র, কঠিন মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে যাচ্ছি? একটামাত্র জিনিস। আমার স্বপ্ন। আমার সোনালি স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন। প্রিয় বন্ধুরা, সামনে এগিয়ে চলো। পিছনে ফিরবে না। ওই যে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার আলোকরশ্মি। জাগো, হতাশার কাছে হার মেনো না। জয় আমাদের হবেই।" শোনো শেখ মুজিবুর রহমান, যে মরতে ভয় পায় না, তাকে কেউ হারাতে পারে না। জয় তার হবেই।'

খোকার ছানি পড়া চোখ চকচক করে ওঠে, সে মেরুদণ্ড সোজা করে নড়েচড়ে বসে। তার চোয়াল শক্ত হয়।

হামিদ মাস্টার ক্ষুদিরাম বসুর গল্প করেন। ১৮ বছরের বালক কী করে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিল। তার জন্য আজ কবিরা গান লিখেছেন, হামিদ মাস্টার কেশে গলা পরিষ্কার করে গাইতে থাকেন, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী।'

এই গানের সুর খুবই করুণ আর মর্মস্পর্শী। হামিদ মাস্টার গাইছেনও খুবই দরদ দিয়ে। বালক শেখ মুজিবের চোখে জল আসে। তার মনে হয়, সে-ও যদি যোগ দিতে পারত বিপ্লবীদের দলে, এমনি করে দেশমাতার জন্য যদি সে-ও ফাঁসিতে ঝুলতে পারত...

অনেক পরে, একাত্তর সালে, পাকিস্তানের কারাগারে যখন শেখ মুজিবের গোপন বিচার অনুষ্ঠিত হবে ইয়াহিয়ার সামরিক আদালতে, রায়ে তাঁর জন্য বরাদ্দ হবে মৃত্যুদণ্ড। তাঁর সেলের পাশে কবর খোঁড়া হতে থাকবে আর তাঁকে চাপ দেওয়া হতে থাকবে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ভুল স্বীকার করে পাকিস্তানিদের বশ্যতা স্বীকারমূলক একটা বিবৃতিতে সই দিতে। তিনি তা দিতে অস্বীকার করবেন। মৃত্যুভয় ও কারাবাসের ভয় তাঁর কোনো দিনও ছিল না। তিনি বলবেন, 'আমি ক্ষমা চাইব না। তোমরা আমাকে ফাঁসি দিতে পারো, ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, জয় বাংলা। শুধু একটাই অনুরোধ, মৃত্যুর পর আমার দেহটা বাংলাদেশের মাটিতে পৌঁছে দিয়ো...'

না, বেরিবেরির চিকিৎসায় খোকার চোখের উন্নতি হয় না, বরং পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে থাকে। তখন শেখ লুৎফর রহমান

ছেলেকে নিয়ে যান কলকাতায়, কলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাক্তার টি আহমেদ তাঁর চোখের ছানি অপারেশন করেন। খোকা আবার সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে শুরু করে, তবে চশমা জিনিসটা তার জীবনের চিরসঙ্গী হয়ে যায়।

তিন বছর পর খোকাকে আবার ভর্তি করা হয় স্কুলে, এবার গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে, ক্লাস ফাইভে। শেখ লুৎফর রহমানও বদলি হয়ে এসেছেন গোপালগঞ্জে। ছেলের বয়স বেশি। সহপাঠীরাও তাকে ভাই বলে ডাকে। তাতে তার নেতাগিরি করতে সুবিধাই হয়।

মজার ব্যাপার হলো, একই স্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয় রেনু। তার ভালো নাম শেখ ফজিলাতুন্নেছা।

খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার ফলে বালক মুজিবের দৃষ্টি আরেকটু প্রসারিত হয়। সে বুঝতে শেখে, পৃথিবীতে ধর্ম অনেক রকম—কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ বা খ্রিষ্টান; কিন্তু সবাই আসলে মানুষ। সবারই ক্ষুধা পায়, তেষ্টা পায়। আনন্দে সবাই হাসে, দুঃখে কাঁদে। সূর্য সবাইকে সমান আলো দেয়, মেঘ দেয় সমান বৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা মানুষে-মানুষে ভেদ করেন না।

মুজিব এইবার ভালো করতে থাকে ফুটবলে। তিন বছর মায়ের কাছে খেয়ে আর বসে থেকে থেকে তার স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে ভালো। পায়ে জোর হয়েছে। এবার আর ফুটবল লাথি দিয়ে পড়ে যায় না।

পরে মুজিব গোপালগঞ্জের একজন কৃতী ফুটবলার হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন মুজিব ফিরছে প্রাইভেট পড়ে। তার স্কুলের শিক্ষক রসরঞ্জন সেনগুপ্তের বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ে সে। তখন শীতকাল। ভীষণ শীত পড়েছে। মুজিবের পরনে লুঙ্গি, গায়ে শার্ট, তার ওপরে চাদর। পথে সে দেখতে পেল, একটা বালক, তার চেয়েও কম বয়সী হবে, তার পরনে শুধু শতচ্ছিন্ন একটা নেংটি, গায়ে কিছুই নাই। মুজিব করল কি, চটপট কোমরে জড়িয়ে নিল চাদরটা। পরনের লুঙ্গি খুলে দিল ছেলেটার হাতে। লুঙ্গি দেওয়ার পরও ছেলেটার গা খালি। কী যে ভীষণ ঠান্ডা হাওয়া বইছে! মুজিব দেখল, তার চাদর দিয়ে নিজের শরীরের উর্ধ্বাংশও বেশ ঢাকা চলে। সে গায়ের শার্টটাও খুলে ফেলল। ছেলেটাকে নিজ হাতে লুঙ্গি আর শার্ট পরিয়ে দিল সে। তারপর কায়দা করে গায়ের চাদর দিয়ে পুরোটা শরীর ঢেকে সে ফিরে এল বাসায়।

ছেলের ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে বাবা শেখ লুৎফর রহমান ঘরের

বাইরে পায়চারি করছেন। মা তখন গোপালগঞ্জে ছিলেন। তিনি বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় দেখেন, ছেলে আসছে। 'এই, তোমার কী অবস্থা? চাদর এইভাবে পরে আছ ক্যান?। শাড়ির মতো কইরে?'

মুজিব মা-বাবাকে খুলে বলে সব।

বাবা বলেন, 'দিয়েছ, ঠিক করেছ। তবে লুঙ্গি-শার্ট না দিয়ে গায়ের চাদরটা দিলেও তো পারতা?'

মুজিব বলে, 'আমার লুঙ্গি-শার্ট আরও আছে। গায়ের চাদর তো একটাই।'

বাবা বলেন, 'দান করে দিলে কিনাই তো দিতাম।'

শেখ মুজিব মাঝেমধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় আসেন। এসে দেখেন, হামিদ মাস্টার একটা ছোটখাটো সংগঠন গড়ে তুলছেন। সেটাকে বলা হয় ধর্মগোলা। ধান কাটার মৌসুমে সচ্ছল কৃষকদের কাছ থেকে ধান, চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে আকালের জন্য রেখে দেওয়া। তারপর যখন অভাব পড়ে গ্রামে, গরিব মানুষের ঘরে খাবার থাকে না, পকেটে কানাকড়িও থাকে না, তখন ওই ধর্মগোলা থেকে তাদের মধ্যে খাদ্যসাহায্য বিতরণ করা হয়। মুজিবও লেগে পড়েন এই কাজে। মাস্টারের সহকারী হিসেবে তিনিও ঘুরতে থাকেন বাড়ি বাড়ি, সংগ্রহ করতে থাকেন ধান-চাল।

ধর্মগোলার কথা এলে আমাদের মনে পড়ে যাবে আরও একজনের কথা, যিনি মুজিবকে ভালোবাসেন, যিনি মুজিবকে চেনেন সেই ১৯৪৪ সাল থেকে, এবং তাঁকেই ভালোবেসেছেন দেশের চেয়েও অধিক দেশ ভেবে। তাজউদ্দীন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, অনাহারে অগুনতি মানুষের মৃত্যু, ক্ষুধিত মানুষের সার সার নীরব মিছিল, পথের ধারে কুকুর-বেড়ালের মতো পড়ে থাকা লাশ অথবা জ্যান্ত কঙ্কাল তাজউদ্দীনকে নাড়া দিয়েছিল খুব। তিনিও তাঁর নিজ গ্রাম দরদরিয়ায় ফিরে গিয়ে স্থাপন করলেন ধর্মগোলা, ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন ধান-চাল, রেখে দিলেন আগামী বছরের আকালের মৌসুমের জন্য।

তাঁদের চিন্তার সাযুজ্য তাঁদের কাছে আনতে থাকবে, যে নৈকট্য ভবিষ্যতে রচনা করবে বাংলাদেশের জন্মমুহূর্ত।

মুজিবের বয়স ১৮। রেনুর ১১। এবার তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিয়ে দিতে হয়। লুৎফর রহমান দিনক্ষণ ধার্য করেন। এক শুভদিন দেখে টুঙ্গিপাড়ার

আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রাতবেশী ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। তত দিনে রেনু ক্লাস ফাইভ পাস দিয়ে ফেলেছেন। এখন শাড়িই তাঁর একমাত্র পোশাক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্রের বই এখন তিনি তড়তড়িয়ে পড়তে পারেন। শুধু পড়তে পারেন তা না, এই সব তাঁর খুব প্রিয়ও হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছে আরও একটা জিনিস, তার নাম পান।

রেনু খুব ভালো পান সাজাতে পারেন। আস্ত একটা খিলি মুখে দিয়ে খানিকটা চিবিয়ে যখন পানের বোঁটা থেকে চুন জিবে লাগান, দেখে মনে হয় একেবারেই পাকা গৃহিণী।

মুজিব বলেন, 'আমাকে একটা খিলি সাজিয়ে দ্যাও দেখি।'

দুলা পান চেয়েছে। যত্ন করে পান সাজান রেনু।

মুজিব বলেন, 'আমারে দুটো পান, ডবল সুপারি দ্যাও। খালি চুনটা কম দিবা। আমার সবকিছুই চাই ডবল ডবল।'

রেনু দ্বিগুণ আনন্দে বরের জন্য ডবল পান সাজান। কিন্তু তাতে চুন দেন চার গুণ।

'কী করো? ভিতরে যে চুন দিয়া চুনকাম করে ফেললা?'

'তোমার না সবকিছু ডবল। আমি তো এমনিতেই চুন বেশি দেই, তোমার জন্য চার ডবল দিছি।'

বিয়ে হলো বটে, কিন্তু এখনই একসঙ্গে থাকা হচ্ছে না দুজনের। মুজিব আবার ফিরে গেলেন গোপালগঞ্জে, মিশনারি স্কুলে। পড়াশোনা চলছে, প্রাইভেটও পড়ছেন, কিন্তু পড়ার চেয়ে তাঁর মন বেশি পড়ে থাকে বাইরে। রাজনীতিতে। তাঁর গৃহশিক্ষক আবদুল হামিদের মুখে শোনা বিপ্লবীদের বীরত্বগাথা তাঁর রক্তে বাজে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হবে। ইংরেজ তাড়াতে হবে। মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছে। গোপালগঞ্জেও আছে তার মহকুমা অফিস। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ফিরে এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা লিয়াকত আলী খান তাঁকে জোর করে ফিরিয়ে এনেছেন ভারতবর্ষের মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। গত বছর প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভালো করেছে। নেহরু মুসলিম লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চুক্তি করেছেন। মুজিব মুসলিম লীগের গোপালগঞ্জ অফিসে যেতে শুরু করলেন। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এটা-ওটা কাজ করেন। পার্টির যেকোনো কাজের ডাক পড়লেই হলো, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। শিগগিরই তাঁকে মুসলিম লীগ গোপালগঞ্জ শাখার

নিরাপত্তাবিষয়ক সম্পাদক পদে ভূষিত করা হলো।

এরই মধ্যে তিন-তিনবার তাঁকে পুলিশ ধরেছে।

প্রথমবার ধরেছে গোপালগঞ্জের মেলা থেকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিলেমিশেই শুরু করেছিল মেলা। কিন্তু মেলার আধিপত্য নিয়ে গন্ডগোল লেগে গেল উদ্যোক্তাদের মধ্যে। অচিরেই সেটা আকার পেল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের। এই বুঝি দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি বেধে যায়। সদা প্রস্তুত মুজিব ছুটলেন তাঁর অনুগত ছাত্র-যুবাদের নিয়ে। হাতে লাঠি। কেউ মারামারি করতে পারবে না। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। দাঙ্গা থেমে গেল।

কিন্তু দাঙ্গায় যারা উসকানি দিচ্ছিল, দু-চারটা লাঠির বাড়ি খেয়ে তারা গেল খেপে। তারা মুজিবুর রহমানের নামে মামলা ঠুকে দিল থানায়।

মুজিব তখন তাঁর গোপালগঞ্জের বাসায়। স্কুল থেকে সবে ফিরেছেন। তাঁর বন্ধুরাও তাঁর সঙ্গে। চুলোর ওপরে হাঁড়িতে দুধ ছিলই, শেখ লুৎফর রহমান জানেন, ছেলে দুধভাত খায় স্কুল থেকে ফিরে, আসার সময় বন্ধুবান্ধবদেরও ধরে আনে। সবাই মিলে কেবল দুধের বাটি নিয়ে বসেছেন, অমনি বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিশ। শেখ মুজিবুর রহমান, পিতা শেখ লুৎফর রহমান, আপনার বিরুদ্ধে পরোয়ানা আছে, আপনি গ্রেপ্তার।

বাড়িতে খবর গেল। ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

মা সায়রা বেগম বিলাপ করতে শুরু করলেন, 'পোলা আমার সবই হামিদ মাস্টারের কাছে শিখেছে, হামিদ মাস্টারও জেলে ছিল, আমার পোলারেও জেলে নিল। আমি তখনই কইছিলাম, স্বদেশি করে, এই রকম মাস্টার রাখার দরকার নাই।'

সাত দিনের জেল হলো মুজিবের। তাঁর জীবনের প্রথম কারাদণ্ড।

মুক্তি পেয়ে এলেন বাড়িতে। রেনু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী চুরি করেছ যে তোমারে জেলে নিল?'

'চুরি করি নাই, রেনু। মানুষের উপকার করতে গিয়েছিলাম। হিন্দু-মুসলমানে মারামারি-কাটাকাটি করতে নিয়েছিল, আমি সেইটা থামাতে গিয়েছিলাম।'

'তাইলে তোমারে ধরল ক্যান?'

'এইটারে কয় পলিটিকস। তুমি সূর্য সেনের গল্প শুনো নাই, ক্ষুদিরামের গল্প? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম শুনো নাই? আমাদের হামিদ মাস্টারের কথা জানো না? দেশের যারা ভালো চায়, তাদেরকে

জেলে যেতে হয়। সূর্য সেন কী বলেছেন, "মৃত্যু আমার দরজায় কড়া নাড়ছে। আমার আত্মা উড়ে যাচ্ছে অনন্তের দিকে, আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব আমার প্রিয়তম বন্ধুর মতো, এই সুখী, পবিত্র, কঠিন মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে যাচ্ছি? একটামাত্র জিনিস। আমার স্বপ্ন। আমার সোনালি স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন। প্রিয় বন্ধুরা, সামনে এগিয়ে চলো। পিছনে ফিরবে না। ওই যে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার আলোকরশ্মি। জাগো, হতাশার কাছে হার মেনো না। জয় আমাদের হবেই"।' মুজিব যেন যাত্রার পার্ট গাইছেন, বাক্যের তোড়ে ভেসে যাচ্ছেন, নিজেই হয়ে উঠেছেন সূর্য সেন।

'তুমি যে গেলা লাঠি নিয়ে মারামারি থামাতি, তোমার মাথায় যদি একটা বাড়ি মারত লাঠি দিয়ে?' রেনু আঁচলে নাকের ঘাম মুছতে মুছতে বলেন।

মুজিব তাঁর পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে জবাব দেন, 'শুনো রেনু, যে মরতে ভয় পায় না, তাকে কেউ হারাতে পারে না। জয় তার হবেই। আমি ভয় পাই না। জয় আমার হবেই।'

গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে তো রেনুও পড়েছেন। ফাইভ পাস করেছেন। ব্যাপারগুলো সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা তাঁরও হয়েছে। তিনি তাঁর দুলার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কী সুন্দর করে কথা বলতে পারে দুলা! একেবারে যাত্রার রাজার মতো।

রেনু ধরেই নিয়েছেন, এটা তাঁর বিধিলিপি। তাঁর বর প্রায়ই কারাগারে যাবেন।

আর অনেক দিন পর স্বাধীন বাংলাদেশে বসে নিজ জীবনের ফেলে আসা দিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মুজিব বলবেন, 'আমার যেদিন প্রথম জেল হয়, সেদিনই আমার নাবালকত্ব ঘুচে গেছে।'

এন্ট্রান্স পাস করেছেন মুজিব। রেজাল্টের পর বাড়ির সবাই খুশি। যে দুরন্ত ছেলে, সে যে পাস করেছে, এই বেশি।

রাজনীতির নামে সারা দিন কোথায় কোথায় থাকে, কী সব করে বেড়ায়। মা একা একা বকে চলেন।

বাবা বলেন, 'ছেলে তো তোমার মুসলিম লীগের কাউন্সিলর হয়েছে। মন্দ কী?'

মা কৃত্রিম রোষ ফুটিয়ে বলেন, 'ছেলে তো তোমার খালি জেলখানায় যায়। লোকে আমারে কয়, সে নাকি সিনেমা হলে আগুন দিয়েছিল?'

বাবা বলেন, 'তুমিও যদি এই কথা বিশ্বাস করো, কেমনে হয়! সেদিন সোহরাওয়ার্দী সাহেব, আবুল হাশিম সাহেবের মিটিং ছিল না গোপালগঞ্জে? কাদের মোল্লা আছে না, ওয়াহিদুজ্জামানের বাপে, সে গুন্ডাপান্ডা নিয়ে গেছে মিটিং ভাঙতে। ভাঙতে পারে নাই, খোকা তো টের পেয়ে তার পোলাপান নিয়ে আগেই মাঠ ঘেরাও দিয়ে রেখেছে, না পেরে গুন্ডাগুলান গেছে সিনেমা হলে আগুন দিতে, যাতে গন্ডগোল পাকে। তারপর উল্টা নাম দিয়েছে খোকার, যে সে-ই সিনেমা হলে আগুন দিতে গেছে। ফলস কেসে পুলিশ ধরেছে খোকারে। তারপর আমি জামিনের চেষ্টা করি, মুসলিম লীগের নেতারা চেষ্টা করেন, জামিন হয় না। কাদের মোল্লা সবকিছু আগে থেকে ম্যানেজ করে থুয়েছে।'

মা বলেন, 'খালি তোমার ছেলে ধরা পড়ে। সে বোকা নাকি। অন্যে দেয় আগুন আর হাজত খাটে সে!'

রেনু এগিয়ে আসেন। বলেন, 'বাবা,' বলে ফেলেই তিনি জিব কাটেন; কারণ, তিনি তাঁর শাশুড়িকে অভ্যাসবশত বাবা বলে ফেলেছেন, আসলে শ্বশুরের সামনে শাশুড়িকে বাবা বলে ডাকার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু অসুবিধা হয় না; কারণ, শ্বশুর বলেন, 'কও, বউমা।'

রেনু আর তাঁর শাশুড়ি চোখে চোখ রেখে গোপন হাসিবিনিময় সেরে নেন। তারপর রেনু বলেন, 'বাবা, আমার সাথে আপনার ছেলের কথা হয়েছে। সে বলেছে, পুলিশের দড়ি হলো দেশপ্রেমিকের গলার মালা। সে বলেছে, যদি কেউ ভয় না পায়, তাইলে তাকে কেউ হারাতে পারে না!'

মা হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গিতে বলেন, 'তুমি আর এই সব বইলে বইলে পাগলরে সাঁকো নাড়ানোর কথা মনে করায়া দিয়ো না।'

৬.

এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতা চললেন মুজিব। ১৯৪২ সাল। গেলেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়বেন বলে। পড়াটা উপলক্ষমাত্র, আসল লক্ষ্য হলো রাজনীতি করা। কলকাতা তখন উপমহাদেশের এবং বাংলার

রাজনীতির এক কেন্দ্রীয় লীলাক্ষেত্র। মুজিব উঠলেন বেকার হোস্টেলে। রোল নম্বর ১৪। আইএ ক্লাস। ২৪ নম্বর রুমে থাকেন। একই রুমে থাকতেন শাহাদৎ হোসেন, গোপালগঞ্জের স্কুলজীবনের সহপাঠী। ভূমিহীন খেতমজুরের ছেলে ছিলেন শাহাদৎ। বাড়ি থেকে তাঁর টাকাপয়সা আসত না। শেখ মুজিবের নামে বাবা শেখ লুৎফর রহমান পাঠাতেন মাসে ৭৫ টাকা। সেটা দিয়েই দুই সহপাঠীর বেশ চলে যেত।

হোস্টেলের রুমে সারাক্ষণ চলছে রাজনৈতিক আড্ডা। মুসলমানদের জন্য আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হবে কি না, হলে দুই বাংলা কি এক থাকবে? শেরেবাংলা ফজলুল হক যে লাহোর প্রস্তাবে বললেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা নিয়ে দুটো আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, তা কি নেতারা ভুলে গেলেন? কলকাতা কার ভাগে পড়বে? কত তর্কবিতর্ক! এই রুমে রাখা হয় দুটো পত্রিকা, দৈনিক *আজাদ* আর সাপ্তাহিক *ইত্তেহাদ*। সেই পত্রিকা পড়তে ভিড় করে ছাত্ররা। আর চলে নানা রকমের আলোচনা।

কলকাতা তখন পরিণত হয়েছে ভুতুড়ে শহরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। জাপানিরা যেকোনো সময় বোমা মারতে পারে। শহরে নিষ্প্রদীপ মহড়া হচ্ছে, এখানে-ওখানে খোঁড়া হচ্ছে পরিখা। একদিন বোমাও পড়ল।

লোকেরা ছড়া বানিয়ে বলতে লাগল,

সা রে গা মা পা ধা নি
বোম ফেলেছে জাপানি
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ।

দলে দলে লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু ইসলামিয়া কলেজ আর বেকার হোস্টেল সরগরম। মুসলিম তরুণেরা সব ঝুঁকে পড়ছে রাজনীতির দিকে। এই হোস্টেলের দুই নূর—নুরুল হুদা আর নূরুদ্দিন। নুরুল হুদা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন। তিনি নতুন সক্রিয় মুসলিম লীগকর্মী মুজিবকে বলেন, 'চলুন, আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোন জায়গায়?'

'লিডারের বাড়িতে।'

'কোন লিডার?'

'সোহরাওয়ার্দী সাহেব।'

'আচ্ছা চলেন।'

'আপনার মতো একজন কর্মী পাওয়া আমাদের জন্য খুব লাভজনক হবে। লিডার খুশি হবেন।'

বেরিয়ে পড়লেন মুজিব। কলকাতা শহরে সন্ধ্যা নামছে। গ্যাসবাতিগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। জাপানিদের ভয়ে বর্মা থেকে আসছে শরণার্থী। তারা ধ্বস্ত, ক্লান্ত। তাদের কারও কারও পায়ে জুতোর বদলে বিচালি।

থিয়েটার রোডে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বাংলোর সামনে পুলিশ। গেটে নাম লিখে ঢুকলেন দুজন। বিশাল ড্রয়িংরুম। বড় বড় গদিঅলা সোফা। সবকিছু বিদেশি কেতায় সাজানো।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব এলেন। নুরুল হুদা বললেন, 'লিডার, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই।'

সোহরাওয়ার্দী চোখ তুলে তাকালেন। আরে, এ যে মুজিব! শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন মুজিবের দিকে। মুজিবের পরনে শেরওয়ানি। ইসলামিয়া কলেজে শেরওয়ানি পরাটাই ছিল দস্তুর। হেমন্তের শীত শীত সন্ধ্যায় মুজিব সেটাই পরে গিয়েছিলেন।

নুরুল হুদা বিস্মিত। শেখ মুজিবের সঙ্গে নেতার আগে থেকে পরিচয় ছিল! কেউ তো কিছুই বলেনি!

শেখ মুজিবের সঙ্গে ফজলুল হক আর সোহরাওয়ার্দীর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটা বেশ নাটকীয়।

মাঘ মাসের দুপুর। আকাশে সূর্য আছে, তবু যেন তেজ নেই। ছায়াগুলোকে বেশ দীর্ঘ দেখাচ্ছে। মফস্বল শহর গোপালগঞ্জ আজ তটস্থ। হাফ প্যান্ট পরা পুলিশ লাল টুপি পরে বেত হাতে শহরের মোড়ে মোড়ে পাহারা দিচ্ছে। গোয়েন্দাও গিজগিজ করছে, নানা ছদ্মবেশে। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে আসবেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক আর বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুলে তাই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে কয়েক দিন আগে থেকেই। প্রতিটা ঘর পরিষ্কার করা, বাগানগুলো ঝকঝকে করে তোলা। প্রধান শিক্ষক গিরিশবাবু ধুতি সামলে সেই সব তদারক করে বেড়াচ্ছেন। ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন ধোপদুরস্ত কাপড় পরে আসে।

ছাত্রদের মধ্যেও বেশ একটা উত্তেজনা। এত বড় দুজন মানুষ আসছেন তাদের স্কুলে! হঠাৎ যদি শেরেবাংলা বা সোহরাওয়ার্দী কোনো প্রশ্ন করে

বসেন, কে উত্তর দেবে, ক্লাসে ক্লাসে সব শিখিয়ে দিচ্ছেন শিক্ষকেরা।

শুধু ক্লাস এইটে পড়া একটা ছেলের মাথায় অন্য মতলব। ছেলেটার চোখে মোটা কাচের চশমা। বেরিবেরি রোগ হয়েছিল, চোখে অপারেশন করতে হয়েছে, অনেক দিন লেখাপড়া বন্ধ ছিল তার। স্কুলের অন্য ছেলেদের তুলনায় সে বয়সে একটু বড়, উচ্চতায়ও। শীতের রাতে হোস্টেলের চালের দিকে তাকিয়ে তার ঘুম আসে না। চালটা ফুটো হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলে পানি পড়ে। এখন এই বিছানায় কাঁথার নিচে শুয়ে কুয়াশাঢাকা চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে ছাদের ফুটো দিয়ে। বালিশের কাছে রাখা চশমাটা চোখে পরে নিয়ে সে টিনের ছাদের ফুটো দেখে।

এই হোস্টেলে সে নিয়মিত থাকে না। কাল প্রধানমন্ত্রী আসছেন, তারই উত্তেজনায় আজকের রাতটা সে কাটাচ্ছে হোস্টেলে। মাননীয় অতিথির জন্য স্কুলের প্রবেশপথে দেবদারুপাতা দিয়ে তোরণ বানানো হয়েছে। তারা তাদের ক্লাসরুমটার মেঝে নিজেরা ঝাড়ু দিয়ে সুন্দর করে মুছেছে। আজ রাতে সে থেকে গেছে হোস্টেলে। তাকে একটা বিছানা ছেড়ে দিয়েছে তার বন্ধুরা।

হেডমাস্টার কি প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন তাঁদের হোস্টেলের ছাদের দুর্দশার কথা? কোনো ব্যবস্থা কি নেওয়া হবে?

ছেলেটি বিছানায় তড়াক করে উঠে বসে। 'এই তোরা ঘুমাস, ঘুমালে হবে? ওঠ।'

'কী, মুজিব ভাই?' তার চেয়ে বয়সে মোটামুটি সবাই ছোট। সবাই তাকে ভাই বলেই ডাকে। কিন্তু একটা এক-পা ছোট ছেলে, যে পড়ে ক্লাস নাইনে, তার খুবই ভক্ত, তড়াক করে বিছানায় উঠে বসে। অন্য ছাত্ররাও মোটামুটি তাকে মেনেই চলে।

'সবাই শোনো।'

সবাই কাঁথা থেকে লেপ থেকে মাথা বের করে।

'আমাদের হোস্টেলের ছাদ ভাঙা, কিন্তু এইটা ঠিক করার কোনো নামগন্ধ তো নাই। আমরা কাল প্রধানমন্ত্রীকে বলব এটা ঠিক করে দিতে। তাঁদের ডেকে এনে দেখাব ছাদের কী হাল। তোমরা সবাই থাকবা আমার সাথে।'

'জি, মুজিব ভাই।'

'কী, থাকবা তো?'

'জি, মুজিব ভাই।'

পরের দিন কালো আচকান আর মাথায় লাল ফেজ টুপি পরা বিশালদেহী ফজলুল হক আর তাঁর পাশে কোট-প্যান্ট-টাই পরা ছোটখাটো গোলগাল চেহারার সোহরাওয়ার্দী এলেন স্কুল পরিদর্শনে। সঙ্গে মহকুমা প্রশাসক গোলাম আহাদ। আর আছে নিরাপত্তারক্ষী আর প্রটোকল-কর্মীরা। তাঁরা হেডমাস্টারের রুমে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ কাটালেন। বারান্দা ধরে হাঁটলেন। ক্লাসরুমেও উঁকি দিলেন।

তারপর ফিরে যেতে লাগলেন সদলবলে। পাশেই ডাকবাংলো। চোরকাঁটাভরা মাঠের মধ্যে মাথার সিঁথির মতো পায়ে চলা সরু পথ। সেই পথে উঠে পড়েছেন তাঁরা।

ক্লাস এইটের ছেলেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। 'মুজিব ভাই, মন্ত্রীরা চলে যাচ্ছে তো।'

'তাই তো। চল সবাই আমার সাথে।'

মুজিবের পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল কয়েকজন ছাত্র। তারা পড়িমরি করে দৌড়াতে লাগল। যে করেই হোক, মন্ত্রীদের পথ রোধ করে দাঁড়াতেই হবে।

তারা দৌড়ে সামনে চলে গেল সপারিষদ মন্ত্রীদের। হেডমাস্টার সাহেবের পিলে চমকে উঠল। কী করছে এই ছাত্ররা!

এসডিও সাহেব রেগে অগ্নিশর্মা। 'এই, কী করো? পথ ছাড়ো।'

বেতের মতো চিকন শরীর, লম্বা, চোখে কালো চশমা—মুজিব এগিয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর পর্বতপ্রমাণ শরীরের সামনে, বলল, 'আপনারা চলে যাচ্ছেন? আমাদের বোর্ডিং ঘরের চালের কী হবে?'

'কী সমস্যা তোমাদের বোর্ডিং ঘরের?'

'চালটা পুরানা হয়ে ফুটা হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলে পানি পড়ে। এখন শীতের রাতে ঠান্ডা হাওয়া ঢোকে। কুয়াশা পড়ে।'

'কত টাকা দরকার?' এ কে ফজলুল হক বললেন।

'হাজার-বারো শ টাকা হলে হবে।'

'আচ্ছা। স্কুল বোর্ডিং ঘর মেরামত বাবদ বারো শ টাকা এখনই বরাদ্দ করছি। আমার নিজস্ব ফান্ড থেকে এটা দেওয়া হবে।' তিনি তাঁর সঙ্গের কর্মকর্তাকে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন শেরেবাংলা, তাঁরই পেছনে উঁকি দিচ্ছেন সোহরাওয়ার্দী। তাঁর চোখে মিটিমিটি হাসি। শেখ মুজিবের কিশোর-মুখে পড়েছে শীতদুপুরের হলদেটে আলো, তার উজ্জ্বল ঈষৎ

বাদামি চোখে সেই আলো চিকচিক করছে।

ডাকবাংলোয় ফিরে গেলেন দুই নেতা। দুপুরের খাবার খেতে খেতে কথা উঠল ওই লম্বা চশমাঅলা ছেলেটাকে নিয়ে। কী রকম সাহস? কী রকম স্পষ্ট করে জানাল তাদের অভাব-অভিযোগ। 'এই রকম তরুণই তো চাই।' বললেন, সোহরাওয়ার্দী। একটা আস্ত মুরগির রোস্ট পাতে তুলে নিয়ে বিশাল থাবায় সেটা কবজা করতে করতে সম্মতি জানালেন বাংলার বাঘ। সোহরাওয়ার্দী পার্শ্ববর্তী কর্মকর্তাকে বললেন, 'চেনেন নাকি ছেলেটাকে?'

'স্যার।'

'ডেকে আনুন না তাকে।' ভাঙা বাংলায় বললেন সোহরাওয়ার্দী। 'ছেলেটাকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। একটা স্লিপ পাঠিয়ে দিন। যেন ও এসে সরাসরি আমার সাথে দেখা করতে পারে।'

মুজিবকে ডেকে আনা হলো স্কুল থেকে। হেডমাস্টার সাহেব ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কী-না-কী শাস্তি হয়ে যায় মুজিবের!

মুজিবকে ডেকে এনে সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'তোমার নাম মুজিবুর রহমান।'

'জি, শেখ মুজিবুর রহমান।'

'তোমার সাহস, তোমার কথাবার্তা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমার মতো ছেলেই আমাদের দরকার। দেশের দরকার।' সোহরাওয়ার্দীর ভাঙা ভাঙা বাংলা বলাও মুজিবের খুবই পছন্দ হলো।

কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনের বৈঠকখানায় বসে সেই সব কথা আবার মনে পড়ে গেল দুজনেরই। সেদিনও লিডার বলেছিলেন, মুজিবের মতো ছেলে দরকার দেশের রাজনীতিতে, আজকেও তা-ই বললেন। 'এসেছ। খুব ভালো করেছ। কাজে লেগে পড়ো।'

সোহরাওয়ার্দী বাংলারই নেতা ছিলেন, কিন্তু ঠিক বাঙালি ছিলেন না। তিনি কথা বলতেন ভাঙা বাংলায়, কিন্তু উর্দু কিংবা ইংরেজিটা ভালো বলতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ফেরত সোহরাওয়ার্দী ব্যারিস্টার হিসেবে ছিলেন খুব নামকরা। আজও মুজিবকে যথারীতি উর্দু-ইংরেজি মেশানো বাংলায় অভ্যর্থনা জানালেন সোহরাওয়ার্দী। উর্দি পরা বেয়ারা তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে এল।

খেতে খেতে অনেকক্ষণ গল্প করলেন তাঁরা, আলোচনা করলেন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে, বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আর তাঁদের এখনকার কাজ সম্পর্কে।

মুজিব খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কলকাতার মুসলিম লীগের রাজনীতি নিয়ে। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে দুটো ভাগ। একটায় জমিদার ও সামন্তশ্রেণী, আরেকটায় আবুল হাশিম প্রমুখের মতো বামপন্থী প্রগতিশীলেরা, যাঁরা জনগণের জন্য মুসলিম লীগকে খুলে দিতে চান, আর ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠে রাজনীতি করতে চান মানুষের কল্যাণের জন্য। মুজিব প্রগতিশীলদের দলে।

১৯৪৩ সাল। মন্বন্তর দেখা দিয়েছে দেশে। 'একটু ফেন দাও মা' বলে কলকাতার বাড়িগুলোর দরজায়-দরজায় ঘুরে ফিরছে অনাহারী মানুষের স্রোত। পথেঘাটে নিরন্ন মানুষ পড়ে আছে অসহায়, মুমূর্ষু। শেখ মুজিব প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দুর্গত অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। মুসলিম লীগ দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি প্রতিষ্ঠা করল। তহবিল সংগ্রহ করে ভুখা মানুষদের খাদ্য সাহায্য করার কাজ চলতে লাগল পুরোদমে। এই কাজে সবার আগে শেখ মুজিবুর রহমান। এমনকি সরকারও মুজিবের তৎপরতা ও অবদানের প্রশংসা করতে বাধ্য হলো।

বেকার হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন সাইদুর রহমান। আকালের ধাক্কা তাঁর হোস্টেলেও এসে লাগল। দেশে খাদ্যসংকট। কাজেই তিনি নিয়ম করে দিলেন, হোস্টেলের ডাইনিংরুমে সবার জন্য এক বাটি করে তরকারি। হয় মাছ, নয়তো মাংস, যেদিন যেটা দেওয়া হবে। কিন্তু সবাই এক বাটি করে নেবে, কেউ দুই বাটি নিতে পারবে না।

শিগগিরই সাইদুর রহমানের কাছে অভিযোগ এল, একজন ছাত্র রোজ দুই কাপ তরকারি খায়।

কে?

শেখ মুজিব।

বারবার অভিযোগ আসায় সাইদুর রহমান ডেকে পাঠালেন মুজিবকে। মুজিব এলেন।

'মুজিবুর, তুমি নাকি রোজ দুই বাটি করে তরকারি খাও?'

'জি, স্যার, খাই।'

'তুমি জানো না, এটা অন্যায়? নিয়ম করা হয়েছে, সবাই এক বাটি করে তরকারি খাবে?'

'কী করব, স্যার। এক বাটিতে যে আমার হয় না।'

সাইদুর রহমানের মনে পড়ে গেল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন চেরিগাছ কেটে ফেলে বাবার কাছে সত্য কথা স্বীকার করতে

দ্বিধা করেননি। এ-ও তো দেখছি আরেক জর্জ ওয়াশিংটন। অপরাধ করে অকপটে স্বীকার করে। আবার সে যে ত্রাণের তহবিল জোগাড় করছে, বিতরণ করছে—এসব করছে চরম সততার সঙ্গে। সেটা সবার মতো সাইদুর রহমানও জানেন, একটা পয়সা সে এদিক-ওদিক হতে দিচ্ছে না।

'আচ্ছা,' সাইদুর হেসে বললেন, 'তোমার চাহিদা যখন দুই বাটি, তখন তোমাকে আর মানা করি না। তুমি দুই বাটিই খাবে।'

মুজিবকে নিয়ে সাইদুর রহমানের আরেকটা অসুবিধা হতে লাগল। মুজিব রোজ দেরি করে ছাত্রাবাসে ফেরেন। কিন্তু ছাত্রাবাসের নিয়ম, রাত আটটার মধ্যে সবাইকে হোস্টেলে ঢুকে পড়তে হবে। হোস্টেলের গেটে একটা রেজিস্টার খাতা আছে। ওখানে নাম লিখে স্বাক্ষর দিয়ে ফেরার সময় উল্লেখ করে ঢুকতে হয়। সেই খাতা যাচাই করে দেখা যাচ্ছে, মুজিবের ফেরার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। সে বেশি রাত করে হোস্টেলে ফেরে।

সাইদুর রহমান জানেন, মুজিব রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। সে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা করছে। কিন্তু হোস্টেলের নিয়ম তো মানতেই হবে। তিনি তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠালেন মুজিবকে।

'শেখ মুজিবুর রহমান, তুমি রোজ নটার পরে হোস্টেলে ফেরো। এটা ঠিক নয়। আর করবে না। এবারের মতো মাফ করে দিলাম। কিন্তু আরেক দিন যদি তুমি দেরি করে আসো, তোমাকে জরিমানা দিতে হবে। যাও।'

'স্যার, আমি নটার মধ্যে ফিরতে পারব না। জরিমানা দিতে হলে সেটাই বরং দেব। আপনি জানেন, বাইরে আমাকে অনেক রকমের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। দেশে দুর্ভিক্ষ। মানুষ খেতে পায় না। আমরা নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন জোগানোর চেষ্টা করছি। একটা মানুষও যদি একমুঠো খেতে পায়, সেটা ভালো। বরং আমি ফাইনই দেব।'

সাইদুর রহমান দেখতে পেলেন, মুজিবের দুই চোখ জল ও মায়ায় চকচক করছে। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, এক কাজ করো। গেটের দারোয়ান তো আর লেখাপড়া জানে না। তুমি যখন রেজিস্টার খাতায় স্বাক্ষর করবে, তখন ফেরার সময় লিখে দিয়ো নয়টা। যাও।'

৭.

মুজিব ব্যস্ত কলকাতায়। ওদিকে আমাদের গল্পের আরেক কুশীলব তাজউদ্দীন তখন পড়েন ক্লাস নাইনে। ঢাকা মুসলিম বয়েজ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে। এর আগে পড়তেন নাগরী সেন্ট নিকোলাস স্কুলে। ক্লাস সিক্সে তিনি বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন। ভীষণ ভালো করছেন লেখাপড়ায়। আগের বছর তাঁদের স্কুল থেকে অনেককে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আহসান উল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং পরিদর্শনে। ফিরে আসার পর স্যার বললেন, 'সবাই লেখো তো দেখি কে কী দেখলে।' সবাই লিখল। তাজউদ্দীন লিখেছেন ইংরেজিতে। সেটা পড়ে শোনালেন শিক্ষক। বললেন, 'এই রকম লেখা তো ইংরেজিতে এমএ পাস লোকেরাও লিখতে পারবে না।'

তাঁরা থাকেন ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে। হোস্টেলের নিয়মকানুন খুবই কড়া। নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক। নামাজ না পড়লে খাবার দেওয়া হয় না। বাইরে যাওয়া বারণ। কিন্তু তাজউদ্দীন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সবকিছুতে তিনি ভালো। বিনয়ী, নম্রভদ্র। তাকে হোস্টেলের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো। হোস্টেল সুপার অম্বর আলী ভীষণ রাগী। তাঁর ভয়ে সবাই থরথর করে কাঁপে। তিনি ছেলেদের ইংরেজি পড়ান। তাজউদ্দীনকে তিনি বললেন, 'ভালো ভালো ইংরেজি ছবি দেখতে যাবে। তাহলে তোমার ইংরেজির উচ্চারণ ভালো হবে। লিসেনিং ক্যাপাসিটি বাড়বে।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তিনি সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নিলেন। তারপর রাতের বেলা তাঁদের পাঠানো হয় ইউনিফর্ম পরে লোকালয় পাহারা দিতে। তাঁদের বলা হয় হোমগার্ড। তাজউদ্দীনের ডিউটি পড়ে বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায়। কয়েক মাস তিনি এই কাজ করেছেন। প্রতি রাতের জন্য তাঁর বেতন আট আনা। ক্লাস টেনে উঠে তিনি স্কুল বদলালেন। এবার গেলেন সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলে। উঠলেন কলতাবাজারের এক মেসে। বন্ধুদের বললেন, পরীক্ষার ফল ভালো করে কী হবে। আসল হলো দেশ। দেশের কাজে লাগতে হবে।

কামরুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা। ছোটখাটো মানুষ। তাঁর চিন্তাভাবনা সংস্কারমুক্ত। কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলেন তাজউদ্দীন।

স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই তাঁকে ঢাকা জেলা উত্তর মহকুমার মুসলিম লীগের তরুণ কর্মী হিসেবে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ফরিদপুর জেলার জন্য এই দায়িত্ব পড়ল শেখ মুজিবের ওপর।

তাজউদ্দীন খুব মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজ করতেন। পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী? স্কুলে ফিরে এসে সহপাঠীদের বলতেন, পাকিস্তান হতে পারে, কিন্তু ভায়াবল হবে না। বন্ধুরা এই সব কথার মাথামুণ্ডু বুঝত কি না, কে জানে।

তাজউদ্দীন ছিলেন অন্তর্মুখী। তিনি কখনো মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করতেন না। ফলে, সাধারণ ছাত্র বা কর্মীরা তাঁকে তেমন চিনত না। কিন্তু নেপথ্যে থেকে পার্টি গড়ে তোলার জন্য তিনি খাটতেন প্রচুর।

এত কিছু করার পরও যথাসময়ে বসলেন পরীক্ষার হলে। ১৯৪৪ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল, তিনি প্রথম বিভাগে মেধাতালিকায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করেছেন।

সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল। সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউট। দুটো খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল। মধ্যখানে মুসলিম বয়েজ। অথচ তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল মক্তবে পড়ে। ঢাকা জেলার কাপাসিয়ার দরদরিয়া গ্রামের সম্পন্ন ভূস্বামী ইয়াসিন খানের রক্ষণশীল পরিবার তাঁদের এই সন্তানকে প্রথমে পড়িয়েছিলেন মক্তবে। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা নাকি দিল্লি থেকে এখানে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য। ছেলে তাঁর শিক্ষা শুরু করল কোরআন শরিফ হিফজ করার চেষ্টা দিয়ে। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। সহজেই সে কোরআন শরিফের কয়েক পারা মুখস্থ করে ফেলল। তার এই মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে মক্তবের শিক্ষকই একদিন বলে বসলেন তার বাবাকে, 'আল্লাহ ছেলেটার মগজ ভালো দিছে। খান সাহেব, ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করায়া দিলে হতো না? এই মক্তবের পড়া তো শেষ করে ফেলছে।'

বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব দুই মাইল। নয় বছর বয়সী তাজউদ্দীন গ্রামের অন্য ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে হেঁটে পৌঁছাতেন স্কুলে। স্কুলের নামটাও সুন্দর। ভুলেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়। শাল-গজারির বন আর নদী-খালে ভরা জনপদ। গাছের ছায়ায় পাখির ডাক শুনতে শুনতে তিনি

স্কুলে যান। সমস্যা হলো, পথে অনেকগুলো খাল পেরোতে হয়। সাঁকো নাই। নৌকায় বা হেঁটে খাল পেরোতে হয়। হাফ প্যান্ট টেনে ওপরের দিকে তুলতে তুলতেও খানিকটা ভিজে যায়। 'তাহলে এক কাজ করা যায় না, আমরা নিজেরাই সাঁকো বানিয়ে ফেলি। গ্রামে বাঁশের তো অভাব নাই। কটা বাঁশই বা লাগে একটা সাঁকো বানাতে।' বন্ধুদের উৎসাহিত করে তিনি লেগে পড়েন সাঁকো তৈরির কাজে। বাঁশঝাড়ে বাঁশের অভাব ছিল না। দা নিয়ে তাঁরা চললেন বাঁশ কাটতে। একটু বয়স্ক ছাত্ররাও এগিয়ে এসে হাত লাগাল। ব্যস, পাঁচটা সাঁকো তৈরি হয়ে গেল। এখন স্কুলে যাওয়া অনেক সহজ হলো না কি!

ক্লাস ওয়ান থেকে টুতে ওঠার সময়ই ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে গেলেন তাজউদ্দীন। তাঁকে এ জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো। পুরস্কারের মূল্য ১০ পয়সা। দেড় পয়সা দামি কালির দোয়াত, সাড়ে আট পয়সার কলম। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত তিনি এই স্কুলেই পড়লেন। এরপর পাঁচ মাইল দূরে কাপাসিয়া এমই স্কুলে ক্লাস ফোরে ভর্তি হলেন তিনি।

তখন তাঁর বয়স ১৩ বছর। তখনকার দিনে যোগাযোগব্যবস্থা খুব খারাপ ছিল। ফলে, বাড়ি থেকে স্কুলে রোজ ১০ মাইল যাতায়াত করা ছিল ওই কিশোরের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে জায়গির থেকে স্কুলে যেতে লাগলেন।

স্কুলে একদিন শুনতে পেলেন, রাজবন্দী এসেছেন।

স্কুলে রাজবন্দী?

তাজউদ্দীনের ঔৎসুক্যের সীমা নাই।

জায়গিরবাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে কাপাসিয়া পুলিশ স্টেশন। শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে বড় জায়গাজুড়ে এই থানা। সেখানে তিনজন রাজবন্দীকে রাখা হয়েছে ডিটেইনি। দিনের বেলা পুলিশ প্রহরায় তাঁরা বেরিয়েছেন এলাকা দেখতে। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা চলে এসেছেন তাঁদের স্কুলে।

তাজউদ্দীন শুনতে পেলেন এক শিক্ষকের মুখ থেকে, এঁরা সবাই ব্রিটিশবিরোধী। স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান।

তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে হেডমাস্টারের রুমের সামনে দাঁড়ানো তিনজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

প্রহরারত পুলিশ বলল, 'কী, খোকা?'

'রাজবন্দী দেখতে এসেছি।'

পুলিশ সদস্যটি হেসে ফেললেন। 'রাজবন্দী দেখবে? ওই যে দেখো?'

তাজউদ্দীন বললেন, 'রাজবন্দী কোথায়? ওরা তো দেখতে রাজবন্দীর মতো না।'

'রাজবন্দীর মতো না!' দারোগা তাঁর বেতটা মাটির সঙ্গে ঠোকাতে ঠোকাতে বললেন, 'রাজবন্দীরা দেখতে কেমন?'

'আমাদের ব্যাকরণ বইয়ে পড়েছি, রাজবন্দী মানে রাজা হইয়াও যিনি বন্দী। ওরা তো রাজা না?'

'এটা ব্যাকরণ বইয়ে লেখা আছে?'

'রাজর্ষির ব্যাসবাক্য লেখা আছে: রাজা হইয়াও যিনি ঋষি। তাহলে রাজবন্দী মানে তা-ই হওয়া উচিত, নয়?'

দারোগা হেসে বললেন, 'রাজবন্দীরা রাজা হয় না। রাজারা যাঁদের বন্দী করেন রাজনীতির কারণে, তাঁদের রাজবন্দী বলে।'

রাজবন্দী বলা হচ্ছে যাঁদের, সেই তিনজন তাঁদের কথোপকথন শুনছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, 'বাব্বাহ্, তোমাকে তো বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। এদিকে এসো তো তুমি। তোমার নাম কী?'

এইভাবে আলাপ-পরিচয়ের শুরু।

তাঁরা ছেলের সব বৃত্তান্ত—নামধাম, কোন স্কুল, কোন ক্লাস— জেনে নিলেন।

তাজউদ্দীন বললেন, 'আপনারা যদি রাজবন্দী হন, তাহলে আপনাদের বেঁধে রাখে নাই কেন? আপনাদের তো বাইরে ছেড়েই রেখেছে?'

তাঁদের একজন বললেন, 'ছেড়ে দিয়ে রাখেনি। এই যে দেখো না আমাদের পাহারা দিয়ে রেখেছে।'

আরেকজন বললেন, 'আমরা আসলে রাজার অতিথি। তাই আমাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের পাহারা।'

ওঁদের মধ্যে লম্বা মুখের একজন বললেন, 'কারণ, আমরা চাই, ব্রিটিশরা এই দেশ থেকে চলে যাক। আমাদের ভারত আমাদের হাতেই দিয়ে যাক। শুনে রানিমাতা এত খুশি হলেন যে আমাদের রাজ-অতিথি হিসেবে বরণ করলেন। বললেন, "যাও, তোমাদের থাকা-খাওয়ার চিন্তা নাই। আমরাই তোমাদের খাওয়াব-পরাব"।'

বাকি দুজন হেসে উঠলেন। ইয়া বড় গোঁফঅলা একজন বললেন, 'এই, ওকে কনফিউজড করে দিয়ো না।'

তিনি বললেন, 'দেখো, ভারতের লোক খেতে পায় না, পরতে পায়

না। কিন্তু ইংরেজদের বাবুগিরি তাতে কমে না। ওদের কোনো চিন্তাভাবনাই নাই এই দেশের মানুষকে ভালো রাখার। কেন নাই? কারণ, এটা তো তাদের দেশ না। যার দেশ, তারই শাসন করা উচিত, তাই না? সে জন্য আমরা বলছি, আমরা ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়াতে চাই। আমরা স্বরাজ চাই।'

পুলিশ সদস্যটি বললেন, 'এই, তোমরা রাজনৈতিক আলোচনা কোরো না। ব্রিটিশরাজের কর্মচারী হিসেবে আমি সেটা অ্যালাউ করতে পারি না।'

ওঁরা বললেন, 'আমাদের কাছে বই আছে। তুমি বই পড়ো। তুমি এসো থানায়। তোমার সঙ্গে গল্পও করা যাবে। আর তোমাকে বইও দেওয়া যাবে। কাজী নজরুলের কবিতা পড়েছ? তুমি থানায় এসো। তোমাকে বই দেব।'

পরের দিনই তাজউদ্দীন থানায় গিয়ে হাজির। তারপর রোজ যেতেন ওঁদের কথা শুনতে। একজনের নাম রাজেন্দ্র নারায়ণ চ্যাটার্জি। তিনি খুব আমুদে। কথায় কথায় হাসেন আর হাসান।

একজনের নাম বীরেশ্বর চ্যাটার্জি। তাঁর গোঁফ আছে। তিনি প্রতিটা ঘটনা, প্রতিটা বিষয় খুব যত্নের সঙ্গে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

আরেকজন মণীন্দ্র শ্রমণি। তিনি মাঝেমধ্যে গান করেন। তাঁর প্রিয় গান হলো, 'ধনধান্য পুষ্পভরা'।

তাজউদ্দীন রোজ একটা করে বই নিয়ে আসেন ওই রাজবন্দীদের কাছ থেকে। সেটা বাড়িতে এনে পড়েন। কী সব আগুনে তাতানো নেশা ধরা একেকটা বই। পরের দিন বইটা ফেরত দেন। নতুন বই নেন। বন্দীরা তাঁর সঙ্গে আগের দিনের পড়া বইটা নিয়ে আলোচনা করেন।

পেছনে শীতলক্ষ্যা নদী। তাজউদ্দীনের চোখ নদীতে। নৌকা চলছে। জাহাজ চলছে। কিন্তু তাজউদ্দীন সেসবের কিছুই দেখছেন না। তিনি মন দিয়ে বন্দীদের আলোচনা শোনেন। বিভোর হয়ে যান। দুনিয়াতে মানুষ মুক্তির জন্য ও শান্তির জন্য, স্বাধীনতা আর অধিকারের জন্য কী কাণ্ডটাই না করছে!

এইভাবে ৫০-৬০টা বই পড়া হয়ে যায় তাজউদ্দীনের।

এর মধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তির দিন আসে। ওপর থেকে আদেশ এসেছে, ওঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

ওঁরা এরই মধ্যে থানার বাগানে গোলাপগাছের যত্ন করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন কয়েকটা গোলাপ ফুল। সেই বাগান থেকে একগুচ্ছ

গোলাপ তুলে তাঁরা বিদায় নেওয়ার জন্য যান তাজউদ্দীনের জায়গিরবাড়িতে। এই কদিনেই এই মেধাবী ছেলেটি তাঁদের চিত্ত জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছে। ছেলেটার সঙ্গে গল্প করে, কথা বলে, বই নিয়ে আলোচনা করে তাঁরা সময়টা কাটিয়েছেন আনন্দে।

জায়গিরবাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, তাজউদ্দীন নাই। তিনি গেছেন ফুটবল ম্যাচ খেলতে।

বন্দীরা গোলাপগুচ্ছ রেখে যান ওই বাড়িতেই।

ফিরে এসে তাজউদ্দীন বাড়ির লোকদের কাছে জানতে পারেন, ওঁরা এসেছিলেন। তিনি ছুটে যান থানায়। ততক্ষণে ওঁরা কাপাসিয়া থেকে চলে গেছেন।

ওই বিপ্লবীদের সাহচর্য তাজউদ্দীনের মনের একটা দুয়ার খুলে দিয়ে যায়।

তাই তো ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'আমার লেখাপড়ার দরকার নাই। আসল কাজ হলো দেশের উপকার করা।'

ঢাকা কলেজে আইএতে ভর্তি হয়েও তাজউদ্দীন ঠিকমতো ক্লাস করেন না।

তাজউদ্দীন একদিন গেছেন সিরাজউদ্দৌলা পার্কে। এখানে জনসভা হবে। বক্তৃতা করবেন মুসলিম লীগের নেতা আবুল হাশিম।

আবুল হাশিম ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ। ভাষার ওপর যেমন তাঁর দখল ছিল, তেমনি ছিল ধর্ম-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত। তাজউদ্দীন আকৃষ্ট হলেন সেই বক্তব্যে। আবুল হাশিমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কামরুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে তাঁরা ১৫০ চক মোগলটুলীতে গড়ে তুললেন পার্টি হাউস। ঢাকার উত্তর মহকুমা মুসলিম লীগ গড়ে তুলতে এই মেধাবী ছাত্রটি কলেজের পড়াশোনায় বিরতি নিলেন।

কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সভা হবে। তাজউদ্দীন যাবেন সেখানে। তিনি একজন কাউন্সিলর। এর আগে ঢাকায় কমিটি নির্বাচনে ভোটাভুটি হয়েছে। তাজউদ্দীনদের লক্ষ্য ছিল মুসলিম লীগকে আহসান মঞ্জিল থেকে বের করে এনে সাধারণ মানুষদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। আবুল হাশিমের মতানুসারী এই উপদলকে বলা হতো বামপন্থী। ডানপন্থীদের নেতা খাজা নাজিম উদ্দিন তখন প্রধানমন্ত্রী। তাঁরা তাঁদের মতো নবাব পরিবারের সদস্যদের দিয়ে কমিটি করার জন্য

পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদরা চাইছিলেন নবাব পরিবারের বাইরে থেকে নেতৃত্ব নির্বাচন করা। শেষ পর্যন্ত বামপন্থীরাই এতে জিতেছে। তাজউদ্দীন আহমদ এই নির্বাচনের জন্য বড়ই খায়খাটুনি খেটেছেন।

কামরুদ্দীন সাহেবসমেত তাঁরা তিনজন যাবেন কলকাতা।

বাবা চান না যে তিনি কলকাতা যান। এমনিতেই পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে, এটা বাবার পছন্দ হচ্ছে না। তাজউদ্দীন ছাত্র হিসেবে খুবই ভালো বলে গণ্য। প্রতিটা ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছেন। ক্লাস এইটে বৃত্তি পরীক্ষায়ও ফার্স্ট হয়েছেন। সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে পেয়েছেন আশি। এ সবই এখন যন্ত্রণার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সবাই চাইছেন, তাজউদ্দীন যেন মন দিয়ে ক্লাস করে। রাজনীতি করে কী লাভ?

লাভের জন্য তো তিনি রাজনীতি করছেন না। তিনি রাজনীতি করতে চান মানুষের জন্য। দেশের ভালোর জন্য। সবাই যেন খেতে পায়। মাত্র গত বছরই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ঘটে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় অনাহারী মানুষ না খেতে পেয়ে মরে পড়ে ছিল। এই মানুষের মুখে খাদ্য দেওয়া যদি রাজনীতি হয়, তিনি তো সেটা করবেনই।

কলকাতা যেতেই হবে। খাজা-নবাবদের হাত থেকে মুসলিম লীগকে উদ্ধার করতে হবে। এটাকে সাধারণ মানুষের লীগ করে গড়ে তুলতে হবে। আবুল হাশিম সাহেবদের হাত শক্তিশালী করতে হবে। কলকাতা যাওয়ার পেছনে তাঁর আরেকটা উদ্দেশ্য আছে। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা হবে। গোপালগঞ্জের এই মানুষটার কথা প্রায়ই পার্টি অফিসে শোনা যায়।

বাবা বললেন, 'পড়াশোনার ক্ষতি করে কলকাতা যাওয়ার দরকার নাই।'

তাজউদ্দীন বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আব্বা, আমি কখনো আপনার কথার অবাধ্য হই নাই। এবারও হতে চাই না। আমি কলকাতা যাবই। আপনি অনুমতি দেন।'

মৌলভি ইয়াসিন খান সাহেব টুপি খুলে হাতে নিলেন। ফুঁ দিয়ে আবার পরলেন। তার মানে, তাঁর মনের মধ্যে টানাপোড়েন। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, যাও।'

জীবনে এই প্রথমবারের মতো কলকাতা যাত্রা। প্রথমে স্টিমার, তারপর ট্রেন।

শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে দেখেন, মুসলিম লীগের কর্মীরা তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য ভিড় করে আছে। একজন বলল, 'দাদা, আমি *অমৃতবাজার* কাগজ থেকে এসেছি, দেখুন, কী লিখেছি আমাদের কাগজে।' তাজউদ্দীন দেখলেন, *অমৃতবাজার* সত্যি বিরাট করে লিখেছে, খাজা নাজিম উদ্দিনের পরাজয়। আরেকজন বলল, 'দাদা, আমাদের কাগজটাও দেখুন।' সেটার দিকে দৃষ্টি দিলেন তাজউদ্দীন। আহসান মঞ্জিলের নেতৃত্বের অবসান।

তাঁদেরকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আবুল হাশিমের কাছে।

কাউন্সিল শুরু হলো। এইখানে তাজউদ্দীন আহমদের দেখা হলো শেখ মুজিবের সঙ্গে।

তাজউদ্দীন খেয়াল করলেন, শেখ মুজিব খুবই দৃঢ়চেতা, সাহসী আর পরিশ্রমী। তিনি যা করতে চান, তা করে ফেলতে কোনো দ্বিধা করেন না, আলস্য বলতে কোনো জিনিসও তাঁর মধ্যে নাই। আর প্রগতিশীল তরুণদের মধ্যে তিনি প্রবল জনপ্রিয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে তিনি ডাকেন লিডার বলে। লিডারকে তিনি খুবই মান্য করেন।

সোহরাওয়ার্দী এই কাউন্সিলে নিজেকে দুই গ্রুপের দলাদলির ঊর্ধ্বে রাখার একটা ভাব দেখাচ্ছেন।

কিন্তু তাঁর শিষ্য মুজিবের অবস্থান আবুল হাশিমের পক্ষে স্পষ্ট ও বাঙ্ময়।

শেখ মুজিব এক ফাঁকে ডেকে নিলেন তাজউদ্দীনকে। বললেন, 'তোমার নাম তাজউদ্দীন তো?'

তাজউদ্দীন বললেন, 'জি।'

'ঢাকা থেকে আসছ?'

'জি।'

'তোমরা তো চমৎকার কাজ করছ, মিয়া। আহসান মঞ্জিলরে হারায়া দিছ। এইবার আমাদের পালা।'

তাজউদ্দীন বললেন, 'শহীদ সাহেব তো মনে হচ্ছে নিউট্রাল থাকবেন। তাহলে হাশিম সাহেবের পক্ষে সুবিধা করা সম্ভব হবে?'

শেখ মুজিব বললেন, 'লিডার নিউট্রাল আছেন। থাকুক। আমি মুজিবুর রহমান তো নিউট্রাল না। ইনশাল্লাহ আবুল হাশিম সাহেবেরই জয় হবে।'

কাউন্সিলে শেখ মুজিব বক্তৃতা করলেন। অসাধারণ বাগ্মিতা দিয়ে তিনি কাউন্সিলরদের সম্মোহিত করে ফেললেন। কাউন্সিলররা বেশির ভাগই

অবস্থান নিলেন আবুল হাশিমের পক্ষে।

দিনটা ছিল ১৭ নভেম্বর ১৯৪৪। ওই দিন ভোট হয়। বামপন্থীদের প্রার্থী আবুল হাশিম আবারও জয়লাভ করেন সাধারণ সম্পাদক পদে।

ঢাকার কাউন্সিলররা ফিরে আসেন বিজয়ীর বেশে।

বিজয়ীর গৌরবের আলো পড়ে শেখ মুজিবের চোখেমুখেও।

তাজউদ্দীন ফিরে আসেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে শেখ মুজিব হারেন না। এর পরও তাঁকে বহুবার দেখেছেন, বহু সংকটে, বহু জাতীয় বা দলীয় সংঘাতে মুজিব লড়েছেন, যে লড়াইয়ে কেউ কোনো দিন জেতার কথা ভাবতেও পারবে না, মুজিব সেখানেও বাজি ধরেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জিতেছেন।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, কোনো খবর নাই, কোনো কুশল নাই, আর বিরূপ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরে তীরহারা নাবিকের মতো একটা যেন কাঠখণ্ড ধরে তাজউদ্দীন ভাসছেন, তখনো তিনি স্থিরপ্রত্যয় ছিলেন, 'মুজিব ভাইকে আমি কোনো দিনও হারতে দেখিনি। এইবারও তিনি জিতবেন।'

কলকাতা থেকে ট্রেনে ফিরে আসছেন তাজউদ্দীন আর সতীর্থরা। কলকাতা পেছনে রেখে। মুজিব ভাই বলেছেন, 'আমি আসছি! আমার গোপালগঞ্জ কমিটিটাতেও আছে বামপন্থীদের ভূত। ওইটাও তাড়াতে হবে।'

'লিডারকে সাথে নিয়া আসব।'

সেই কথাগুলোও যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

ট্রেন চলে। ঢাকা মেইল। ট্রেনের চলার একটা ছন্দ আছে। শব্দটার মধ্যে একটা সুর আছে।

স্লোগানের সুরের মতো। ট্রেনের সিটে বসেই তাজউদ্দীন ঘুমিয়ে পড়েন।

তাজউদ্দীন স্বপ্ন দেখেন। মুজিব ভাই বলছেন, 'তাজউদ্দীন, তৈরি থাকো। আমি আসতেছি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছে বসে এক ব্যাঙ্গমি তার ব্যাঙ্গমাকে বলে, 'গত দুই দিনে একটা ঘটনা ঘটল।'

'কী ঘটনা?'

'যেই পাকিস্তান জন্মায় নাই, তার মৃত্যুর জন্য যে দুইজনের সাক্ষাৎ

হওন দরকার আছিল, সেইটা হইয়া গেছে। বুঝলা কিছু?'

'কিছু কিছু...'

'কিছু কিছু বুঝবা কেন। পুরাটাই তো জলের মতো সোজা, ভোরের আলোর মতো পরিষ্কার। শেখ মুজিব আর তাজউদ্দীনের দেখাটা হইয়া গেল।'

'হ। তা হইল।'

'এইটা খুব বড় ঘটনা। ভবিষ্যতে মনে রাইখো।'

প্রত্যহ ঘটনা ঘটে হাজার হাজার।
ইতিহাসে সেসবের মূল্য কিবা আর ॥
তাজউদ্দীনের সাথে দেখা শেখ মুজিবের।
বিশাল ঘটনা এটা পরে পাবা টের ॥

৮.

রেনু বললেন, 'এবার তুমি আমাকে কলিকাতায় নিয়ে যাবা?'

বাইগার নদী থেকে বাড়ির পাশ ঘেঁষে খালটা এই শীতে শীর্ণ। হিজলগাছগুলো বর্ষাকালে কোমরপানিতে ডুবে যায়। এখন পানি নাই, পুরো গাছ জেগে আছে। আমন ধান উঠে গেছে। খোলাজুড়ে খড় শুকানো হয়। ইতস্তত খড় ছড়িয়ে আছে। একটি গরু বাঁধা জিগাগাছের সঙ্গে। তার পিঠে তিনটা কাদাখোঁচা পাখি। পিঠের পোকা খাচ্ছে। গরুটা আরাম করে চোখ বুজে শুয়ে আছে।

কাচারিঘরের সামনে টং। ছড়ানো খড়ের গায়ে লুটাচ্ছে বিকেলের রোদ।

সেই রোদে পা ডুবিয়ে টঙে বসে আছেন রেনু। বেগুনি ধরনের একটা শাড়ি তাঁর পরনে।

শাড়ির আঁচল মাথায় জড়ানো। বেগুনি শাড়ির ফাঁকে ফরসা মুখটাকে লাগছে শালিকের রোগা ঠ্যাঙের মতো।

মুজিব তাঁর দিকে ঘুরে বসেন। বাঁশের টং মচমচ করে শব্দ তোলে।

রেনু কলকাতা যেতে চাইছেন।

নিয়ে যাওয়াই তো উচিত। তাঁর কাজের অসুবিধা হবে। রাজনীতির কাজে তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত। আবার সামনে আইএ পরীক্ষাও। এই অবস্থায় রেনুকে নিলে হোস্টেলের বাইরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে হবে। বাসা জোগাড় করা কোনো ব্যাপার নয়। কলকাতায় এখন বাসা ভাড়া পাওয়া যায় সহজেই। যুদ্ধে জাপানি বোমার ভয়ে যারা শহর ছেড়ে চলে গেছে, তাদের অনেকেই ফেরেনি।

হোস্টেলে পরীক্ষার আগে থাকলে সুবিধা। সহপাঠীদের কাছ থেকে পড়া বুঝে নেওয়া যেত। বইপত্র, সিলেবাস, নোট—সব পাওয়া যেত হাতের কাছেই। তবে অসুবিধা হলো, সারাক্ষণ রুমে মানুষজন গিজগিজ করে। এরই মধ্যে তিনি কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ছেলেরা তাঁর রুমে নানা কারণে আসে, অকারণেই আসে বেশির ভাগ। মুজিব ভাইয়ের দরোজা সবার জন্য খোলা।

তবে রেনুর একটু হাওয়া বদল করা দরকার ও। মেয়েটা কী রকম রোগা হয়ে গেছে। ১৭-১৮ বছরের তরুণীর মুখখানা কী রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। আর কী রকম দুখী!

তাঁদের একটা ছেলে হয়েছিল। ছেলেটা কয়েক দিন বেঁচে ছিল।

মুজিব চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, হাতের কাজগুলো শেষ করেই বাড়ি চলে আসবেন। হাতের কাজ কি সহজে শেষ হয়? কলকাতায় পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন হলো। তারপর যেতে হলো কুষ্টিয়া। মুসলিম ছাত্রলীগের প্রাদেশিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে হাশিম গ্রুপের সমর্থিত বামপন্থী প্যানেল ছিল। মুজিবকে সেই প্যানেলকে জিতিয়ে আনার জন্য নানা চেষ্টাচরিত্র করতে হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে দেখা গেল, ডানপন্থীরা দলে ভারী। মারামারি পর্যন্ত লেগে গেল। শেখ মুজিব কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন খাজাদের ধামাধরা শাহ আজিজের মুখ বরাবর। শেখ মুজিবের পেছনে ছিলেন বামপন্থীদের অনেকেই। খানিকটা পেছনে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদরাও। কিন্তু শেষতক তাঁদের সমর্থিত প্যানেল হেরে গেল।

তারপর মুজিব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ফরিদপুর আর গোপালগঞ্জের সম্মেলন নিয়ে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব উঠেছেন তাঁর বন্ধুর বাসায়। আবুল হাশিম সাহেব উঠেছেন শহরের উপকণ্ঠে নদীর ধারে এক বাংলোয়।

আবুল হাশিম সাহেব নিজে দায়িত্ব দিয়েছেন মুজিবকে। ডানপন্থী মোহন মিয়া খাজার এক নম্বর দালাল। তাঁরা যেন জিততে না পারেন। না, এখানে ডানপন্থীদের জিততে দেওয়া যায় না। এটা মুজিবের নিজের এলাকা। মোহন মিয়া আর ওয়াহিদুজ্জামানের দল তাঁর চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। হাতে লাঠি, সড়কি, রামদা নিয়ে তাঁদের ভাড়াটে গুন্ডারা সম্মেলন কেন্দ্রে উপস্থিত। কিন্তু তাঁর নাম মুজিবুর রহমান। এসব দেখে ভয়ে দমে যাওয়ার পাত্র তো তিনি নন। তিনিও নির্দেশ দিলেন কর্মীদের, 'লাঠি আনো।' হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর আবুল হাশিম বসে আছেন মঞ্চে। সঙ্গে আছেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। তিনি আবুল হাশিমদের নিরাপত্তা দেবেন। শেখ মুজিব মঞ্চের একদিকে অবস্থান নিয়েছেন। বিপরীত পাশে ডানপন্থীরা। প্রথমে শুরু হলো কথা-কাটাকাটি। তারপর ধস্তাধস্তি। পুলিশ কমিশনার রিভলবার বের করলেন। সোহরাওয়ার্দী অভূতপূর্ব সাহসের পরিচয় দিলেন। তিনি মঞ্চ থেকে নামলেন। বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হতে দাও। ভোটে যে প্যানেল জিতবে, তাকেই মেনে নেব আমরা। এর নাম গণতন্ত্র।'

ভোট হলো। শেখ মুজিবের প্যানেলই জয়লাভ করল। ফরিদপুরেও তিনিই জিতলেন।

গোপালগঞ্জে সম্মেলন শেষে সোহরাওয়ার্দী আর আবুল হাশিমকে মুজিব তাঁদের গোপালগঞ্জের বাসায় নিয়ে গেলেন। চা এল। সবাই গল্পে মেতে উঠলেন।

গোপালগঞ্জ থেকে অতিথিদের বিদায় দিয়ে মুজিব রওনা দিলেন টুঙ্গিপাড়ার পথে। খবর পেয়েছিলেন, রেনুর শরীরটা ভালো নয়। কিন্তু ছেলে যে মারা গেছে, জানতেন না।

সেটা শুনলেন সমীর মাঝির কাছে। নৌকায় চড়ে বসার পরই সমীর মুখ খুলল, 'মিয়া ভাই, এত দিনে আইলেন! ছাওয়ালটার মুখটাও তো দেখতে পারলেন না। ভগবান ভগবান!'

সমীর মাঝির মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেলেন না মুজিব। তিনি শীতার্ত নদীটির দিকে তাকালেন। তখন সন্ধ্যা। আকাশ লাল হয়ে আছে। লালচে ঢেউগুলো তিরতির করে কাঁপছে।

আকাশে একঝাঁক পাখি। ঘরে ফিরছে।

একটা মাছ লাফিয়ে উঠল বইঠার আঘাত পেয়ে।

তাঁর চোখে জল এসে যাচ্ছে। তিনি চশমাটা খুলে কাচ মুছলেন পকেট থেকে রুমাল বের করে। চশমার কাচের দোষ নাই, আসলে তাঁর চোখই ঝাপসা।

রেনু তাঁর পাশে বসে আছে। এই মেয়েটি তাঁর জন্ম থেকেই যেন তাঁর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু তিনি তাকে সময় দিতে পারলেন কই। একা একা মেয়েটা দশ মাস তাঁর সন্তানকে ধারণ করেছে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে। তারপর দেখেছে ছেলের মুখ। বাবা আসার আগেই ছেলে বিদায় নিয়েছে।

সেই দুখের দিনগুলো কী করে পার করেছে রেনু!

এবার আসার পরও রেনুর কোনো অভিযোগ নেই। শুধু বললেন, 'এত দিনে আসলা? ভালো ছিলা? শুনেছ সব?'

শেখ মুজিব তাঁর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, শুনলাম।'

'কালকে কবরস্থানে যাইয়ো। রাতের বেলা আর যাওয়ার দরকার নাই। হাতমুখ ধোও। আমি পানি তুইলে দেই।'

'তোমাকে পানি তুলে দেওয়া লাগবে না। বাড়িতে লোকের অভাব পড়েছে নাকি।'

মা-ই বরং কাঁদলেন, 'খোকা, পোলা হয়েছিল। ঠিক তোর মতন দেখতে হয়েছিল।'

শেষরাতে সেদিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মুজিবের। নিঝুম রাত্রিতে ঝিঁঝির ডাক, বাঁশঝাড় থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাক ভেদ করে তিনি শুনতে পান কান্নার শব্দ। লেপটা সরিয়ে রেনুর চোখে হাত দিয়ে টের পান অশ্রু।

রেনু কাঁদছে।

'কী হয়েছে, রেনু? কানতেছ ক্যান?'

'তুমি আসলা না, আমি তো তোমার ছেলেরে তোমারে দেখাতে পারলাম না!'

'কাইন্দো না, রেনু। দোষ তো আমারই। আমিই তোমার পাশে থাকতে পারি নাই।'

সকালবেলা ছেলের কবরের কাছে এলেন মুজিব। জিয়ারত করলেন। বাঁশঝাড়ের নিচে পারিবারিক গোরস্থান। সেখানে একটা ছোট্ট কবর। বাঁশের বেড়া এখনো কাঁচা। শিথানে খেজুরের পাতা হলদে হয়ে গেছে।

বিকেলে রেনুকে নিয়ে একটু বের হলেন। মেয়েটা কত দিন ঘরের বাইরে আসে না! শরীরটা সূর্যের আলো পায়নি কত দিন, তাই তাকে আরও ফরসা, আরও নীরক্ত দেখাচ্ছে।

উঠান পেরিয়ে কাচারিঘরের পাশে এই টঙে এসে বসলেন দুজন। মুজিবের পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। রোদটা চনমনে থাকায় চাদরটা আর নেননি।

রেনু লাল রঙের গায়ের চাদরটা নিয়েছিল, সেটা গুটিয়ে কোলের ওপর রেখেছেন।

মুজিব বললেন, 'আচ্ছা, বাবাকে বলে তোমাকে নিয়ে যাব কলকাতায়।'

লুৎফর রহমান সাহেব রাজি হলেন না। বললেন, 'এমনিতেই মাইয়ার শরীরটা ভালো না, তার ওপরে ও কলকাতায় নিয়ে গিয়ে মেয়েটারে কষ্ট দেবে। নিজের কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। কলিকাতা ঢাকা কুষ্টিয়া কইরে বেড়ায়। আজ হিল্লি তো কাল দিল্লি। মিছিল-মিটিং করে। মাইর খায়। আবার কোন দিন অ্যারেস্ট হবিনে। এর মধ্যে বউমারে নিয়ে গিয়ে সে থাকবে কই, বউমা থাকবে কই? সারা দিন সে বউয়ের খোঁজখবর নিতে পারবে?'

বাবার কথার ওপর তো কথা চলে না। রেনুও বললেন, 'থাক তাইলে, বাবা যখন মানা করতেছেন।'

মুজিব গিয়ে ধরলেন মাকে। 'মা, তুমি বাবারে বুঝাও, আমি কিন্তু রেনুরে নিয়া যাবই। কলিকাতা গেলে ওর মনটা যদি একটু ভালো লাগে!'

মা মুশকিলে পড়লেন। এক দিকে বাপ, আরেক দিকে পোলা। তিনি এখন কী করবেন?

শেষে বললেন, 'খোকা, তুই যা। আমি বউমারে পাঠায়া দিব নে।'

'কেমনে দিবা?'

'তুই যা না। দ্যাখ, কেমনে কী করি?'

'আচ্ছা, আমি কলিকাতা গিয়া বাসা ঠিক কইরা তোমারে চিঠি লিখতেছি। তখন তুমি পাঠায়া দিয়ো।'

মুজিব চলে গেলেন কলকাতা। কিন্তু মনটা ভার হয়ে রইল। যাওয়ার দিন রেনুর দিকে তাকানোর সাহসও হচ্ছিল না। মেয়েটা তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। তিনি তাকে সঙ্গে নিতে পারলেন না!

মা বললেন, 'খোকা, অত মন খারাপ করে আছিস কেন? বললাম না, আমি পাঠায়া দিব।'

মুজিব কলকাতা গেলেন। বাসা ভাড়া করলেন একটা। চিঠি লিখলেন মাকে। 'মা, এই যে আমার বাসার ঠিকানা। তুমি বলিয়াছিলা পাঠাইবা। এখন ব্যবস্থা করো।'

চিঠি পেয়ে সায়রা বেগম গেলেন লুৎফর রহমানের কাছে।

বললেন, 'খোকার চিঠি আসছে।'

লুৎফর রহমান বললেন, 'চিঠি আসছে? কেমন আছে খোকা? পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

'সামনে পরীক্ষা। কিন্তু পড়াশোনা ভালো হচ্ছে না। আলাদা বাসা নিছে। হোটেলে খায়। সেখানকার রান্না ভালো না। খোকার পেটের অসুখ।'

'আলাদা বাসা ভাড়া নিছে ক্যান?'

'পরীক্ষার সময় হোস্টেলে রুমে ভিড়-হইচইয়ে সে পড়তে পারে না।'

'তাইলে এখন কী করবা? ভালো ডাক্তার দেখাইতে কও?'

'রান্না খারাপ হইলে ডাক্তার কী করব?'

'তাইলে তো দুশ্চিন্তার কথা?'

'বউমারে পাঠায়া দেই। পরীক্ষার কয়টা দিন থেইকে আসুক। রান্নাও করতে পারবে, আবার একটু হাওয়াও বদল হবেনে। পোলাটা মারা যাওয়ায় বউমার মনটাও খারাপ।'

'কার সাথে যাবে?'

'তুমি রাজি হইলে সে ব্যবস্থাও আছে।'

লুৎফর রহমান রাজি হলেন। রেনুকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মুজিবের পরীক্ষার কটা দিন কলকাতায় থেকে আবার ফিরে এলেন রেনু।

কারণ, মুজিবের অনেক কাজ। দেশ তাঁকে চায়।

৯.

মুসলিম লীগের সম্মেলন হচ্ছে কলকাতায়। মুসলিম ইনস্টিটিউটে। ঢাকা থেকে তাজউদ্দীন গেছেন কাউন্সিলর হিসেবে। শরৎকালের শেষ দিক। ধীরে ধীরে গরমের ভাব কমে গিয়ে আবহাওয়াটা মিষ্টি হয়ে উঠেছে। এই

কাউন্সিলটা হচ্ছে মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠনের জন্য। এই বোর্ড থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কারা হবেন প্রাদেশিক নির্বাচনের প্রার্থী।

এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের। তাজউদ্দীন সব সময়ই বামপন্থী গ্রুপের সঙ্গে আছেন।

শেখ মুজিব আছেন সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে।

কিন্তু সোহরাওয়ার্দী নিজেই দোটানায় পড়ে গেছেন। তরুণেরা সবাই আবুল হাশিমের ভক্ত। শেখ মুজিব নিজেও চান আবুল হাশিমই সাধারণ সম্পাদক থাকুন। এদিকে প্রবীণদের মধ্যে কানাঘুষা, আবুল হাশিম আসলে কমিউনিস্ট। তাকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে রাখা ঠিক হবে না। খাজা নাজিম উদ্দিন, মওলানা আকরাম খাঁ এসে ধরলেন সোহরাওয়ার্দীকে। আবুল হাশিমকে সরাতে হবে। আবুল হাশিমের বদলে ডাক্তার আবদুল মোত্তালিব হবেন সাধারণ সম্পাদক। সোহরাওয়ার্দী সেই কথা জানিয়ে দিলেন আবুল হাশিমকে। আবুল হাশিম বিনা বাক্যে সেই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

সোহরাওয়ার্দী মানতে পারেন, আবুল হাশিমও মানতে পারেন। কিন্তু তরুণেরা কি তা মানবে? শেখ মুজিব কি তা মেনে নেওয়ার পাত্র?

সন্ধ্যার পর কাউন্সিল চলছে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সামনে তরুণেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করল।

ডানপন্থীরা খেপে গেল। তারা শুরু করল হাতাহাতি।

ফরিদপুরের মোহন মিয়া হঠাৎই মুন্সিগঞ্জের বামপন্থী গ্রুপের শামসুদ্দিন আহমেদকে সজোরে লাথি মেরে বসলেন। লাথি তাঁর পেটে লাগল। তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। শেখ মুজিব এই দৃশ্য সহ্য করার ব্যক্তি নন। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন মোহন মিয়ার ওপর। তাঁর গলা চেপে ধরে তাঁকে ফেলে দিলেন মাটিতে। ওইখানে চেপে ধরে রাখলেন।

সভার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে গেল।

পরের দিন আবার শুরু হলো অধিবেশন।

তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন।

তিনি আবুল হাশিমের পক্ষে। আর কে সাধারণ সম্পাদক হবে, সে সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে নেওয়ার পক্ষে জোরালো ভাষায় বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন। শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বরে অমিত তেজ, তার বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। পুরো সভা স্তব্ধ হয়ে রইল তার ভাষণের সময়। ওই বক্তব্যে

কেবল পুরো কাউন্সিল মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল না, সোহরাওয়ার্দী নিজেও অভিভূত হয়ে গেলেন।

সোহরাওয়ার্দী দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। একটা সিদ্ধান্ত তিনি জানিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক কে হবে, তার সিদ্ধান্ত নেবে কাউন্সিলররা, ভোটের মাধ্যমে। আরেকটা সিদ্ধান্ত সোহরাওয়ার্দী নিলেন মনে মনে, তাঁর বাকি জীবনের জন্য। এত এত কর্মীর মধ্যে কে হবেন তাঁর একান্ত নির্ভরতা, কার ওপরে বাকিটা জীবন তিনি ভরসা করবেন, আজীবন কাকে তিনি তার স্নেহ ও সমর্থন দিয়ে যাবেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এই কর্মীদলের মধ্যে শেখ মুজিবই শ্রেষ্ঠ। যেমন তাঁর সাহস, তেমনি তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা, তেমনি পরিষ্কার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। এই রকম একজন রাজনৈতিক কর্মীকেই তাঁর দরকার, দরকার দেশের।

কাউন্সিলররা ভোট দিলেন। বামপন্থীরা জয়লাভ করল। আবুল হাশিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

সোহরাওয়ার্দী ভবিষ্যতে হতে যাচ্ছেন পার্লামেন্টারি দলের নেতা, সেটাও স্থির হয়ে গেল।

কাউন্সিল শেষে মুজিব গেলেন লিডারের বাসায়। সোহরাওয়ার্দী মুজিবকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'মুজিব, আমার জীবনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আবুল হাশিমকে আর সাধারণ সম্পাদক রাখব না। এই সিদ্ধান্ত আবুল হাশিম সাহেবও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তোমরা তরুণেরা এটা মানলে না। কিন্তু আমি আমাদের আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছি কেবল তোমার বক্তৃতা শুনে। সত্যি তো, কাউন্সিলররা সিদ্ধান্ত নেবে কে হবেন সাধারণ সম্পাদক। এটাই তো ডেমোক্রেসি। তোমাকে ধন্যবাদ আমার চোখ খুলে দেওয়ার জন্য।'

মুজিব সোহরাওয়ার্দীর আলিঙ্গনে। তাঁর কালো ফ্রেমের চশমার নিচে জল টলমল করছে। এত বড় নেতা সোহরাওয়ার্দী, তিনি কী অনুপ্রেরণাই না দিচ্ছেন একজন তরুণ কর্মীকে। গণতন্ত্রের জন্য সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অঙ্গীকারটাও কত তীব্র।

কেন্দ্রীয় আইনসভার ১৩২টি আসনের নির্বাচন নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে মুসলমানদের আসন ৩০টি। শেখ মুজিবুর রহমানের ওপরে দায়িত্ব পড়েছে ফরিদপুরের মুসলিম লীগের প্রার্থীদের জিতিয়ে

আনা। দিন নাই, রাত নাই তাঁকে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে হচ্ছে।

ঢাকার দায়িত্ব পড়েছিল কামরুদ্দীন সাহেবের ওপর। তিনি ছিলেন তাজউদ্দীনের নেতা, আর তাজউদ্দীনকে করা হলো উত্তর মহকুমার নির্বাচনী সম্পাদক। কাজেই মুসলিম লীগের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য তাজউদ্দীনও যে দিবারাত্রি খাটবেন, তাতে আর সন্দেহ কী!

শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন—এ দুই তরুণ নেতা তখন একই উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার দুই প্রান্তে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে লাগলেন।

মুজিব ফরিদপুরের সব মহকুমা আর থানায় যান। বক্তৃতা করেন। অসাধারণ বাগ্মী মুজিব এই সময় ফরিদপুরে সবার মুজিব ভাই হয়ে ওঠেন। ১৯৪৫ সালের ১০ ও ১২ ডিসেম্বরের শীতের দিন দুটো নির্বাচনের হাওয়ায় গরম হয়ে ওঠে।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীরা ৩০টি আসনেই জয়লাভ করে। বাংলার ছয়টি আসনের সব কটিতেই।

কলকাতার অক্টার লি মনুমেন্টের পাদদেশে মুসলিম লীগ শুকরিয়া দিবসের সভা আহ্বান করে। দলে দলে মুসলমানেরা সেই জনসভায় যোগ দেয়। তাদের মুখে স্লোগান : ছিনকে লেয়েঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্তান, সিনামে গুলি লেয়েঙ্গে পাকিস্তান।

ছেলেপুলেরা ছড়াও কাটে : কানমে বিড়ি মুখে পান, লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্তান।

কামরুদ্দীন আহমদ কলকাতায় সেই দৃশ্য দেখেন। তাঁর বুক ভেঙে আসতে চায়। তিনি বিড়বিড় করতে থাকেন, সমস্তটা সমাজ যেন পাগল হয়ে গেছে।

এরপর ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন।

নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব মনোনয়ন ঘোষণা করবেন। তার আগে এলাকায় পৌঁছে একটু জনমত যাচাই করে নেওয়া দরকার। সিন্দিয়াঘাট থেকে দেশি নৌকায় চলেছেন সোহরাওয়ার্দী। সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানসহ গোটা ১৫ জন কর্মী। রাতের মধ্যে গোপালগঞ্জ পৌঁছানো দরকার। সকালবেলাতেই সোহরাওয়ার্দীকে মনোনয়ন ঘোষণা করতে হবে।

এমনিতেই যাত্রারম্ভ করতে দেরি হয়ে গেছে।

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'আমরা কি ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারব, মুজিব?'

মুজিব বললেন, 'আচ্ছা, একটা কাজ করি। মাঝি ভাই, আপনারা নেমে যান নৌকা থেকে। গুণ টানেন।'

মাঝিরা বলল, 'আমরা গুণ টানলে দাঁড় বাইব কেডা? হাল ধরব কেডা?'

মুজিব বললেন, 'আমরা বসে থাকব নাকি। আমরা পালা করে দাঁড় বাইব, হাল ধরব। আপনারা গুণ টানেন।'

মাঝিরা নেমে গেল।

মুজিব নিজে দাঁড় টানতে লাগলেন।

পানিতে দাঁড় পড়ছে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠছে। পানির ছিটা এসে পড়ছে তার গায়ে।

তারা বহুক্ষণ কিছু খাননি। সবারই খিদে পেয়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না।

সাতপাড় বাজার দেখা যাচ্ছে। দূর মাঠে আলপথে বাঁক কাঁধে, ঝাঁকা মাথায় হাটুরেরা যাচ্ছে হাটের দিকে।

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'তোমরা একটু নৌকাটা থামাবে? আমি আসছি।'

তিনি নেমে গেলেন নৌকা থেকে। ফিরলেন খেজুরের গুড় আর চিড়া কিনে।

সেই চিড়া-গুড় তিনি বিতরণ করলেন সবার মধ্যে। আগে দিলেন নৌকার মাঝিদের। তারপর কর্মীদের। শেষে তিনি নিজেও চিড়া আর গুড় চিবুতে লাগলেন।

ওই চিড়া-গুড় খেয়েই তারা কাটিয়ে দিলেন। কেউই ভাতের নাম মুখে আনলেন না।

বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০ আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১১৯ আসন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ আর শেরেবাংলা ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে। ১০ হাজার যুব স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে শেখ মুজিব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণার কাজে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করতে লাগলেন। তাজউদ্দীন ব্যস্ত রইলেন ঢাকা অঞ্চলে।

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'মুজিব, আমার একটা গোপন প্ল্যান আছে। আমি চাই, তুমি ফজলুল হক সাহেবকে বরিশালে ব্যস্ত রাখো। তাহলে তিনি আর বাংলার অন্যত্র প্রচার চালাতে পারবেন না। তাহলে আমাদের মুসলিম লীগের কাছে তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি সহজেই হেরে যাবে।'

মুজিব বললেন, 'তা-ই হবে, লিডার।' তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের নামিয়ে দিলেন বরিশাল অঞ্চলে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রচারাভিযানে বেরোলেন। ৪২টি জলযানের এক বিশাল বহর নিয়ে বরিশাল চললেন তিনি। সঙ্গে শেখ মুজিবসহ আরও আরও নেতা। তাঁরা এক মাস প্রচার চালালেন বরিশাল অঞ্চলে।

ফরিদপুরে মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন মোহন মিয়া। তিনি ডানপন্থী গ্রুপের লোক। মুজিব ফরিদপুরের নির্বাচনী প্রচারদলের প্রধান। স্বেচ্ছাসেবক, নির্বাচনী প্রচারণার নানা জিনিসপাতি—সব তাঁর অধীনে। তিনি নানা জায়গায় মুসলিম লীগের জন্য ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন, শুধু ফরিদপুরে মোহন মিয়াকে টাকা দিচ্ছেন না, স্বেচ্ছাসেবক পাঠাচ্ছেন না, জিনিসপাতি দিয়েও সাহায্য করছেন না। মোহন মিয়া লিখিত অভিযোগ দিলেন মুজিবের বিরুদ্ধে। মুজিব বললেন, 'অভিযোগ সত্য। মোহন মিয়া নিজে জমিদার। তাঁর কেন কেন্দ্রের সাহায্য লাগবে। এসব যার নাই তার জন্য, যার আছে তার জন্য না।'

১৯৪৬ সালের মার্চে নির্বাচন হলো। সর্বত্র মুসলিম লীগের জোয়ার। ১১৭টা আসনের ১১০টাই জিতল মুসলিম লীগ। যে সাতটা আসনে জিততে পারল না, তার একটা ফরিদপুরের মোহন মিয়ার আসন।

শেখ মুজিব এইখানে রাজনীতির মধ্যে একটু 'পলিটিকস' ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

বৈশাখের এক উত্তপ্ত দিনে অখণ্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবের লিডার সোহরাওয়ার্দী শপথ নিলেন।

১০.

সোহরাওয়ার্দী তাঁর বাসভবনে ডেকেছেন। মুজিব কয়েকজন ছাত্রনেতাসমেত গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর থিয়েটার রোডের বাড়িতে। সোহরাওয়ার্দীকে আজ বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। তিনি আঙুল ফোটাতে ফোটাতে বললেন, জিন্নাহ ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সারা ভারতে ডাইরেক্ট

অ্যাকশন ডের ডাক দিয়েছেন। জেনারেল স্ট্রাইক হবে।

মুজিব বললেন, 'লিডার, ২০টা ট্রাক দেন। আর মাইক দেন কতগুলো। ১৫ আগস্ট থেকেই প্রচার চলবে। লিডার, খাজা নাজিম উদ্দিন তো ঘোষণা করে দিয়েছে, এই অ্যাকশন হিন্দু ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে আবুল হাশিম বিবৃতি দিলেন, এই অ্যাকশন ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে; কংগ্রেস বা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'খাজা তো বলবেই। সে তো ব্রিটিশ প্রভুদের খুশি করতে চায়।'

'আমাদের সাবধান থাকতে হবে।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'শিয়োর। আমরা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করতে চাই না। আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিব; কংগ্রেসের বিরুদ্ধে না।'

চা-বিস্কুট খেয়ে মুজিব বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর অনেক কাজ। সব ছাত্রকে সংগঠিত করতে হবে। সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে গড়ের মাঠে যেতে।

১৫ আগস্ট বিকেলবেলা বেকার হোস্টেলের সামনে ট্রাক আর মাইক এসে যায়। সবাই সমবেত হয়েছে ডাইনিংরুমের সামনের লনে। মুজিব বললেন, 'সবাই খেয়ে নাও।'

খাওয়া সেরে নিয়ে সবাই ভিড় করে আছে লনে। মুজিব বললেন, 'আমরা এখন ট্রাকে করে মিছিল নিয়ে বার হব। স্লোগান দেব। স্লোগান যেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হয়, উসকানিমূলক না হয়। সবাই ট্রাকে ওঠো।'

সবার সামনের ট্রাকে শেখ মুজিব। তাঁর হাতে একটা চোঙা। তিনি স্লোগান ধরলেন। স্লোগান উঠল : 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর,' 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ,' 'গড়ের মাঠে মিস্টার জিন্নার জনসভায় যোগ দিন,' 'ডাউন ডাউন ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজম,' 'আপ আপ লীগ ফ্লাগ লীগ ফ্লাগ।' বড়বাজার থানার সামনে মিছিল গেলে থানার ইনচার্জ শেখ মুজিবকে অনুরোধ করলেন, মিছিল যেন শান্তিপূর্ণ থাকে। স্লোগান যেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে না হয়। ওসি নিজেও মুসলমান। মুজিব বললেন, 'এই, সবাই সুশৃঙ্খলভাবে মিছিল নিয়ে চলো।'

তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল সেরে ফিরে এলেন হোস্টেলে।

পরের দিন সভা। বিকেল তিনটায় সভা শুরু হবে। মুজিবের নেতৃত্বে বেকার হোস্টেলের ছেলেরা মিছিল করে আগেভাগেই পৌঁছে গেছে মাঠে।

তাদের হাতে মুসলিম লীগের পতাকা।

কিন্তু পরের দিন সভা চলাকালেই শোনা গেল, শহরে সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়ে গেছে।

সোহরাওয়ার্দী নির্দেশ পাঠালেন, 'মুজিব, শান্তভাবে সব ছেলেকে নিয়ে হোস্টেলে ফিরে যাও। সারা রাত গেটে তালা দিয়ে রাখবে। কাউকে বের হতে দেবে না।'

মুজিব সব ছাত্রকে নিয়ে ফিরে আসছেন। সবাইকে অভয়ও দিচ্ছেন, বলছেন, 'একসাথে আছি আমরা, কিছু হবে না।'

কিন্তু ফেরার পথে হ্যারিসন রোডের ছাদের ওপর থেকে হঠাৎই মিছিলে আক্রমণ শুরু হয়।

বেকার হোস্টেলের ছেলেরা হোস্টেলে ফিরে এলে মুজিব গেটে তালা লাগিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করলেন। ছাত্রদের বাইরে যাওয়া মানা।

সোহরাওয়ার্দী হোস্টেলের ছেলেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ৪০-৫০ জন অস্ত্রধারী পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন।

মুজিব ছাত্রদের সঙ্গে নিজের রুমে সারা রাত আলোচনা করে কাটালেন। তাঁর মন খুবই খারাপ। মানুষ এইভাবে মানুষকে হত্যা করতে পারে! মানুষ এইভাবে ঘৃণার অস্ত্র শানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে অন্য মানুষের ওপর! মানুষ কি কোনো দিনও মানুষ হবে না?

কলকাতার সেই দাঙ্গা ছিল খুবই মারাত্মক। হাজার হাজার মানুষ মারা গেল। 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে সেই ঘটনা ইতিহাসে কালো অক্ষরে লেখা আছে।

মুজিব ছাত্রদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দাঙ্গাবিরোধী তৎপরতায়। তাঁরা রাস্তা পাহারা দিতে লাগলেন, যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না পারে। বালিগঞ্জ থেকে ইসলামিয়া কলেজের রাস্তা হিন্দুদের জন্য হয়ে পড়েছিল বিপজ্জনক। মুজিব সেই রাস্তায় অবস্থান নিলেন। এই পথে কোনো হিন্দু গোয়ালা বা মুচি বা শিক্ষক বা উকিল যদি ভুল করে এসে পড়ে, তার জন্য এটা হতো ভয়ংকর ব্যাপার। তেমনি হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকায় কোনো মুসলমান ভুলে গিয়ে যদি পড়ে, তার প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। এমন ভয়ংকর ছিল ওই দিনগুলো।

ভবতোষ দত্ত ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক। তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেও দুটো গ্রুপ। দুদলই পাকিস্তান চায়, এমনকি মুসলমান শিক্ষকেরাও। কিন্তু একদল আছে উর্দুভাষী। তারা

নিজেদের কুলীন ভাবে। আরেক দল আছে বাংলাভাষী, তাদের নেতা শুকনো লম্বা একটা ছেলে। তার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তার দলটাই ভারী। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতির দিকেই তার টান।

দাঙ্গার দিন কটায় তিনি দেখলেন, মুজিবের নেতৃত্বাধীন অংশটা শান্তির পক্ষে কাজ করছে। তারা রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। ভবতোষ দত্ত ওল্ড বালিগঞ্জের মোড়ে এসে দেখতেন, ছেলেরা আছে পাহারায়। তাঁকে দেখে নমস্কার দিয়ে তারা বলত : 'আর ভয় নাই, স্যার। চলুন, আমাদের সঙ্গে। আমরা এগিয়ে দিচ্ছি।' ওরা তাঁকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে কলেজ পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত। ছুটির পর আবার ছাত্ররাই ফিরিয়ে দিয়ে যেত। এই শান্তি প্রহরীদলের নেতা ছিলেন মুজিবুর রহমান।

ব্যাঙ্গমা ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে নিজের পিঠের পালক খুঁটরে বলে, 'বুঝছ?'

'না কইলে বুঝুম কেমনে?' ব্যাঙ্গমি একটা ছোট্ট পোকা টুপ করে গিলে বলে।

'এই যে ভবতোষ বাবু, শেখ মুজিবের এই সকল ঘটনা কিন্তু তার মনে দাগ কাইটা ফেলতাছে। জীবনেও তিনি ভুলতে পারবেন না এই ঘটনা। এই ঘটনার ৪২ বছর পরে এই লোকে একখান বই লিখব। সেই বইয়ে উনি লেখব শেখ মুজিবের এই সব ঘটনা।'

ব্যাঙ্গমি বলে,

ভবতোষ বাবু লেখে নিজ স্মৃতিকথা,
মুজিব শান্তির পক্ষে লেখা রহে তথা।
সময় বহিয়া চলে নদীর মতোন,
সিন্দুকে রহিয়া যায় স্মৃতির রতন।

পার্ক সার্কাসের কাছে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ। সেখানে ছাত্ররা ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে শুরু করল। দুস্থ মুসলিম পরিবারগুলোকে তারা সাহায্য করছে। শেখ মুজিব ছুটে এলেন তাঁর দল নিয়ে। বললেন, 'আমি এসে গেছি, আর কোনো দুশ্চিন্তা নাই। এখন থেকে সব কাজের ভার তোমরা নিশ্চিন্তে আমার ওপরে ছেড়ে দাও।' তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা সাংঘাতিক, নেতৃত্বের গুণ অপ্রতিরোধ্য, মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন তিনি অমোঘভাবে। ঠিকই এই ত্রাণকেন্দ্রটির পুরোটাই যেন তাঁরই হয়ে গেল।

দিনরাত পরিশ্রম করছেন তখন মুজিব। নাওয়া-খাওয়ার কথা তাঁর মনে থাকত না। কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক তিনি, তাঁর দায়িত্ব তো কম নয়।

১১.

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'বিহারিদের প্রথম ব্যাচটা আসবে বাংলায়। শরণার্থীদের জন্য সীমান্তে আমরা আশ্রয়শিবির খুলেছি। সরকারি লোকেরা তো করবেই। আমাদের মুসলিম লীগের পক্ষ থেকেও তো করা উচিত। ছাত্রলীগ আর মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ডের ভলান্টিয়ার কোর ফর্ম করো। এ কাজটার নেতৃত্ব তুমি দাও। বর্ডারে গিয়ে তুমি যদি শরণার্থীদের প্রথম ব্যাচটাকে অভ্যর্থনা জানাও, খুবই ভালো হয়। যাবে?' গলা থেকে টাইটা ঢিলা করে নামিয়ে নিলেন সোহরাওয়ার্দী। সারা দিনের পরিশ্রমে তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

মুজিবও ক্লান্ত। দাঙ্গাদুর্গত মানুষের ত্রাণের কাজে ব্যস্ত তিনি। আহতদের শুশ্রূষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, গৃহহারাদের আশ্রয় দেওয়া, উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর খাদ্যের ব্যবস্থা করা—কাজ কি কম!

মুজিব বললেন, 'আমাকে কয়েকটা দিন সময় দেবেন। আমি আপনাকে জানাই।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'কয়েকটা দিন সময় চাচ্ছ কেন?'

মুজিব বললেন, 'রেনু একটু বলছিল বাড়ি যেতে। কলিকাতার নানা খারাপ খবর ওরা পায়। দেখতে চায়।'

'রেনুর শরীরটা কেমন? বাচ্চাটা মারা গেল। ওর মনটা নিশ্চয়ই খারাপ থাকে। তোমার উচিত ছিল ওকে একটু বেশি করে সময় দেওয়া। দেখো। এদিকে বিহারে লক্ষ লক্ষ বিহারি শরণার্থী। আমার মনটা ভালো না। শরীরটাও। দেশটার কী হলো? এই সব দেখেশুনে মনটা খুবই দমে গেছে।'

'মানুষে মানুষে এত হিংসা, এত বিদ্বেষ ভালো লাগে না। আমারও খুব

বিষণ্ণ লাগে। তবে মন খারাপ করবেন না, লিডার। আপনি আপনার সাধ্যমতো করেছেন। আমরা জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি জানমাল রক্ষার। আমাদের দিক থেকে আন্তরিকতার, চেষ্টার কোনো কমতি নাই, এটা বলতে পারি।'

থিয়েটার রোডের মুখ্যমন্ত্রীর বাসা থেকে বেরিয়ে মুজিব হাঁটতে লাগলেন। নেতাকে তিনি এত মন খারাপ করতে কখনো দেখেননি। তাঁর নিজেরও শরীরটা ভালো না। এই কদিন খাওয়াদাওয়া একদমই ঠিকমতো করা হয়নি। গোসল হয়নি। মানুষ মারা যাচ্ছে, মানুষ কাতরাচ্ছে, মানুষের ঘরদোর নাই, সেখানে নিজের শরীর আবার কী? কিন্তু শরীরটা একসময় ভেঙেও তো আসে। তার ওপর যদি মন ভেঙে যায়?

মুসলিম লীগের দোষ দেওয়া হচ্ছে ঘটনার জন্য। বিশেষ করে, সোহরাওয়ার্দীকে। কেন তিনি ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করলেন? তাতেই তো বেশি করে এই দাঙ্গা ঘটতে পারল।

কথা ঠিক নয়। ছুটি ছিল বলেই যে যার বাড়িতে থাকতে পেরেছিল, ফলে রাস্তায় দাঙ্গা কম হয়েছে। আরেকটা অভিযোগ উঠেছে নেতার বিরুদ্ধে। তিনি কেন লালবাগে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়ে বসে ছিলেন। তিনি নাকি পুলিশকে বলেছেন অ্যাকশন না নিতে। ঘটনা তা নয়। তিনি গিয়ে অনুরোধ করেছেন সেনাবাহিনী ডাকতে। আর আগের দিন তিনি পুলিশকে বলেছিলেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ না করতে।

যদি দোষ কারও থাকে তো খাজা নাজিম উদ্দিনের। উনি কেন বলতে গেলেন, এই অ্যাকশন কংগ্রেস আর হিন্দুদের বিরুদ্ধে?

আর দোষ যদি কারও থাকে তো সেটা হিন্দু-মুসলমানের নিয়তির।

মুসলমানেরা ওই দিন জনসভায় যোগ দিতে মিছিল করে আসছে, হিন্দুবাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া হয়েছে। আর মুসলমানেরাও মিছিল থেকে হিন্দু দোকানে ঢিল ছুড়েছে, ওরা কেন দোকান খোলা রেখেছে? এইভাবে শুরু। ঢিল-পাটকেলে আহত লোকেরা আসতে লাগল ময়দানের জনসভায়। আহত লোকদের রক্তমাখা পতাকা হয়ে উঠল তাদের নিশান। জনতা ফুঁসে উঠল। তারই পরিণতি এই দাঙ্গা। কত নিরপরাধ মানুষের অকারণ মর্মান্তিক মৃত্যু! কলকাতা থেকে দাঙ্গা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো—নোয়াখালীতে, বিহারে, ঢাকায়। মানুষ যখন মানুষকে হত্যা করতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন মানুষের ওপর আস্থা রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব বিড়বিড় করে, রবিবাবু, আপনি বলেছেন,

মানুষের ওপর আস্থা হারানো পাপ, এত মৃত্যু দেখেও কি আস্থা রাখা যায়?

মুজিব হাঁটছেন। আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। শিউলি ফুলের গন্ধ আসছে নাকে। ফুটপাতের ধারে একটা ঝাঁকড়া শিউলিগাছ। মাথার ওপর তার পাতা, ফুল আর শাখা-প্রশাখার সম্ভার। হাত বাড়িয়ে তিনি গাছের একটা ডাল অলক্ষ্যে স্পর্শ করলেন। একটা চিকন ডাল ধরে টেনে নিচে নামিয়ে ছেড়ে দিতেই সেটা ঝাঁকি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। শিশির আর শিউলি ফুল টুপটাপ করে ঝরে পড়ল তাঁর মাথায়, শরীরে, পায়ের কাছে। তিনি দুটো ফুল কুড়িয়ে নেবেন বলে উপুড় হলেন। তখন মনে হলো, বাকি ফুলগুলো ফুটপাতে পড়ে থাকলে কোনো পথচারীর পায়ের চাপে পড়ে থেঁতলে যেতে পারে। তিনি সব কটা ফুল কুড়িয়ে হাতে নিয়ে দুই হাতে ধরে হাঁটতে লাগলেন। মাথার ওপরের চাঁদটাও হাঁটছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

হোস্টেলে ফিরে নিজের রুমে ঢুকে প্রথম কাজ যেটা করলেন, তা হলো চিঠি লেখা। চিঠি লেখার প্যাডের কাগজ আর কলম তাঁর তৈরিই থাকে। প্রায়ই তাঁকে চিঠি লিখতে হয়।

তিনি লিখলেন :

প্রিয় রেনু, ভালোবাসা নাও।

আশা করি, তুমি ভালো আছ। বাড়ির সকলেও খোদার ফজলে ভালো আছে। তুমি আমাকে বাড়ি এসে কটা দিন সময় কাটাতে বলেছিলে। আমিও তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, সেপ্টেম্বরে আসব। কিন্তু আসা হয়ে ওঠে নাই।

তুমি জানো, আমরা দেশের জন্য কাজ করছি। মানুষের সেবা করছি। মানুষের বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছি। নিজের আরাম-আয়েশের কথা আমি কখনো চিন্তা করি নাই।

লিডার সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাকে একটা নতুন কাজ দিয়েছেন। তিনি চান, আমি বিহারের সীমান্তে যাই। ওখানে বিহারি শরণার্থীদের জন্য যে অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়েছে, সেটার দেখাশোনা করি। তুমি জানো, লিডার এই সব ব্যাপারে আমার ওপর কত নির্ভর করে থাকেন। সরকারি লোকজনের চাইতে আমার ওপরেই তাঁর বেশি ভরসা।

এদিকে তোমার জন্যও আমার খুবই মায়া বোধ হচ্ছে। তোমার কাছে যেতে ইচ্ছা করছে। তোমার কাছে যেতে পারি নাই, সেই অপরাধবোধে আমি এমনিতেই আক্রান্ত আছি।

এখন আমার কী করা উচিত আমি ঠিক জানি না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তোমার ওপরে। এর আগেও আমি বহু ব্যাপারে তোমার পরামর্শ

নিয়েছি। তোমার বিচক্ষণতার ওপরে আমার ভরসা আছে। তুমি যা বলবে, আমি তা-ই করব।

তোমার শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ো।

আব্বা-মাসহ গুরুজনদের সালাম দিয়ো। ছোটদের স্নেহাশিস দিয়ো। ইতি—

তোমার মুজিব

চিঠিটা পরের দিনের জরুরি ডাকে ধরিয়ে দিলেন মুজিব। ১০ দিন পর এল উত্তর।

রেনু লিখেছেন, 'তুমি শুধু আমার স্বামী, এইটাই তোমার একমাত্র পরিচয় নয়। দেশের একজন সেবক তুমি, এইটাও তোমার একটা পরিচয়। তুমি কেবল আমার স্বামী হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করো নাই, দেশমাতার সেবার জন্যও জন্মেছ। দেশের কাজই তোমার সবচেয়ে বড় কাজ। তুমি নিশ্চিন্ত মন নিয়ে সেই কাজে যাও। আমার জন্য চিন্তা করবে না। আল্লাহর ওপরে আমার ভার ছেড়ে দাও।'

মুজিব পড়লেন। তাঁর বুকের ওপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল। তিনি আরেকবার চিঠিটা পড়ে তাতে একটা চুমু দিলেন। খামসহ যত্ন করে চিঠিটা রেখে দিলেন।

এবার তাঁর ছুটে যাবার পালা নেতার কাছে। একেবারেই তৈরি হয়ে বের হলেন। বিহারের সীমান্তে যেতে হবে। সোহরাওয়ার্দীকে বললেন, 'আমি ভলান্টিয়ার বাহিনী নিয়ে বিহারে যেতে প্রস্তুত। একবারে তৈরি হয়েই এসেছি।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'তুমি বিবির সাথে কথা বলেছ?'

মুজিবের চোখ চকচক করে উঠল। তিনি বললেন, 'আমি তার চিঠি পেয়েছি, লিডার। সে লিখেছে, "তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিহার যাও, আমার জন্য ভেবো না।"'

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাধারণত আবেগাক্রান্ত হন না। কিন্তু আজ তাঁকে খানিকটা দ্রবীভূত মনে হলো। তিনি মুজিবের কাছে এসে বললেন, 'মুজিব, শি ইজ অ্যা ভেরি প্রেশাস গিফট টু ইউ ফ্রম গড। ডোন্ট নেগলেক্ট হার, প্লিজ...'

মুজিব কী বলবেন বুদ্ধি না পেয়ে পকেটে হাত দিলেন। পকেটে কতগুলো কী যেন লাগছে। বের করে দেখলেন, সেদিনের শিউলি—সেই শিউলি ফুলগুলো। শুকিয়ে গেছে। তবে বোঁটার লালচে ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

১২.

খুবই শীত পড়েছে কলকাতায়। ট্রেনের জানালা দিয়ে শীতের বাতাস আসছে। তখন সকাল আটটা মতো বাজে। শিয়ালদা স্টেশন আসতে আরও আধঘন্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি হবে। আকাশে এখনো কুয়াশা। জানালা দিয়ে তবু এক টুকরো ম্লান আলো ঢুকে পড়েছে কামরার মেঝেতে আর সিটে। কোনো গাছ বা বাড়ি সেই রোদটুকরাটাকে বাধা দিলে তা একবার জ্বলছে, একবার নিবছে।

তাজউদ্দীন বললেন, 'কামরুদ্দীন সাহেব, এই যে শুনি পশ্চিমে শীত নাই। শীত তো ভালোই পড়েছে। আপনি চাদরটা গলা পর্যন্ত উঠিয়ে নিন। আপনার শীত করতে পারে।'

কামরুদ্দীন বললেন, 'আপনার শীত লাগছে তাই বলেন। মাঘ মাস চলছে। মাঘের শীতে বাঘ পালায়।'

তাজউদ্দীন বলেন, 'না, আমার তেমন লাগছে না শীত। কারণ, আমাদের কাপাসিয়ার বনে বাঘ আছে। আমি একবার বাঘ শিকারে গিয়েছিলাম। আমি বন্দুক ধরিনি। কয়েকজন বীরের হাতে বন্দুক ছিল। আমাদের হাতে ছিল লাঠি। বাঘের গায়ে গুলি লাগল। বাঘ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। বন্দুকওয়ালারা সব পালাতে লাগল। আমার সাথে যে ছিল, সে বলল, "বাঘ তো এদিকেই আসছে। চলেন, পালাই।"

'আমি বললাম, হাতে লাঠি আছে কী জন্য? আসুক না বাঘটা, তারপর দেখা যাবে?'

'কবেকার ঘটনা?' কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে অ্যাডভোকেট কামরুদ্দীন আহমদ জিজ্ঞেস করলেন।

'এই তো ছেলেবেলার।'

'আরে, আপনার ছেলেবেলা কেটেছে নাকি?'

'কী বলেন, আমার বয়স এখন একুশ। সাড়ে বিশ তো বটেই।'

'আর বাঘের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন কবে?'

'এই তো বছর পাঁচেক আগে হবে।'

'হুম। তাহলে তো তখন রীতিমতো বালক ছিলেন।'

'তখন বালক থাকলে এখনো বালকই আছি।'

'না না। মুসলিম লীগ করতে গিয়ে আপনার বয়স বেড়ে গেছে। বিশেষ করে, আমার মনে পড়ে সেই দিনের ঘটনা।'

'কোনটা, বলুন তো?'

'ওই যে গফরগাঁওয়ে। সেদিনও এই রকম ট্রেনে করেই তো যাচ্ছিলাম আমরা। আপনি সেদিন ওই বুদ্ধি না করলে কী যে হতো!'

তাজউদ্দীন হাসেন। বুদ্ধি কি আর এমনি বেরিয়েছিল। জীবন বাঁচানোর জন্য।

গফরগাঁওয়ে মুসলিম লীগের সম্মেলন ছিল। সব কেন্দ্রীয় নেতা গেছেন সেখানে। এর মধ্যে আছেন নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন প্রমুখ। কিন্তু গফরগাঁওয়ে এমারত পার্টি নামের স্থানীয় একটা পার্টি খুব শক্তিশালী। তাদের হাজারো সমর্থক লাঠিসোঁটা-সড়কি-রামদা-বর্শা নিয়ে প্রস্তুত। মুসলিম লীগারদের ঢুকতে দেবে না গফরগাঁওয়ে। পুলিশ প্রহরায় নেতারা নামতে যাবেন। অমনি ঢিল এসে পড়ল দরজায়। পুলিশি তৎপরতায় নেতারা ট্রেন থেকে নামতে পেরেছিলেন।

তাঁরা টেলিগ্রাম করলেন ঢাকায়: জলদি তিন-চার শ গুন্ডাজাতীয় নির্ভীক লড়িয়ে লোক নিয়ে গফরগাঁও আসো। এসওএস। সেভ আওয়ার সোলস।

কামরুদ্দীন আর তাজউদ্দীন পার্টির সঙ্গে মিটিং করে দেড় শ বাছাই করা দুর্ধর্ষ মাস্তান নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। গফরগাঁও স্টেশনে গিয়ে দেখেন, বড় বড় রামদা হাতে হাজার হাজার লোক। তারা চিৎকার করছে—এমারত পার্টি, জিন্দাবাদ।

এই সশস্ত্র হাজারো মানুষের কাছে এই দেড় শ গুন্ডা কিছু না।

তাজউদ্দীন তখন এক বুদ্ধি করলেন। স্লোগান ধরলেন: 'লাঙল যার জমি তার, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করো, জমিদার নিপাত যাও।' তাঁর সঙ্গে দেড় শ গুন্ডা এই স্লোগান দিতে দিতে নামল। তাজউদ্দীন একবারও নিলেন না মুসলিম লীগের নাম। মারমুখী স্থানীয় জনতা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। 'এরা আবার কারা। এরা যে দেখছি আমাদের মনের কথা বলে।' তারা তাদের ওপর আর হামলা করল না।

ঠিক এক বছর আগের ঘটনা। এমনই শীতকাল। এমনই এক ট্রেনেই তাঁরা গিয়েছিলেন ময়মনসিংহের গফরগাঁও।

আজকে তাঁরা যাচ্ছেন কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে।

কামরুদ্দীন বললেন, 'আমরা কিন্তু সম্মেলনে আবুল হাশিমকেই সভাপতি পদে সমর্থন করব।'

তাজউদ্দীন বললেন, 'তাঁর তো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকার কথা নয়। তিনি হয়ে যাবেন।'

কামরুদ্দীন বললেন, 'না। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবার সভাপতি হবার চেষ্টা করতে পারেন। জিন্নাহ সাহেব যেহেতু তাঁকে মুসলিম লীগে ফেরার অনুমতি দিয়েছেন, ফজলুল হক সাহেবই সভাপতি হয়ে যাবেন। আমরা গিয়ে দেখি পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়। শুনি সোহরাওয়ার্দী সাহেব কী বলেন।'

এর মধ্যে ট্রেন শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। আস্তে আস্তে তার গতি মন্থর হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের মালপত্র গুছিয়ে নিলেন।

সম্মেলনস্থলে এসে দেখলেন, এ কে ফজলুল হকের দিকেই সমর্থনের পাল্লা ভারী। এর আগে মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ। তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

আশ্চর্য যে সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিরপেক্ষ অবস্থান নিলেন।

কামরুদ্দীন সাহেব রাতের বেলা গেলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বাসায়। তাঁকে বললেন, 'আপনি এটা কী করছেন! ফজলুল হক সাহেব সভাপতি হলে তিনিই তো প্রধানমন্ত্রী হবেন। আপনার তো তখন বিদায় নেওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।' কিন্তু তিনি নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করলেন না।

একসময় ছাত্ররা আবুল হাশিমের ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছে, তারা লোহার রেলিং আর গেট ভেঙে আবুল হাশিমের ওপর চড়াও হবে। ছাত্রনেতারা দোতলা থেকে বিক্ষোভ দেখছেন।

এই সময় মারমুখী ছাত্রদের সামনে এগিয়ে গেলেন অকুতোভয় একজন—শেখ মুজিবুর রহমান। বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন, 'সব চুপ। কেউ এক পা আগাবা না। একটা কথা বলবা না।'

কামরুদ্দীন সাহেবের মনে হলো, ছাত্ররা না আবার মুজিবকেই আক্রমণ করে বসে।

না, তা হলো না। শেখ মুজিবের ওই ধমকেই যেন কাজ হলো।

তাজউদ্দীনের শ্রদ্ধা চিরদিনের জন্য কিনে নিলেন শেখ মুজিব।

কিন্তু আবুল হাশিম আর এ কে ফজলুল হকের এই দ্বন্দ্বের সুযোগে মওলানা আকরম খাঁ খবর পাঠালেন, তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করছেন। কাজেই তিনিই সভাপতি।

এটা ছিল একটা খেলা, ফেরার পথে ট্রেনে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তাজউদ্দীন বললেন কামরুদ্দীনকে।

কামরুদ্দীন বললেন, 'হ্যাঁ। এক ঢিলে তিন পাখি মারা হলো। আবুল হাশিম আউট। এ কে ফজলুল হক আউট। এর পরের ধাপ হবে সোহরাওয়ার্দীকে আউট করা।'

কামরুদ্দীন সাহেব হতাশায় নিচের ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। তাজউদ্দীন বললেন, 'সোহরাওয়ার্দী সাহেব কেন এই রকম আচরণ করলেন? জিন্নাহ সাহেবের আস্থা অর্জনের জন্য?'

'হতে পারে। পলিটিকসটা তো উনি আমাদের চেয়ে ভালো বোঝেন বলেই মনে হয়।'

রাতের ট্রেন। কলকাতা শহরের আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। আস্তে আস্তে অন্ধকারের পেটের ভেতর ঢুকে গেল ট্রেনটা।

শীতের ঝাপটা আসছে খোলা জানালাপথে। তাজউদ্দীন জানালার কবাট নামিয়ে দিতে দিতে বললেন, এক মাঘে শীত যায় না।

১৩.

মুজিব এখন ব্যস্ত অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রচারণায়। তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড স্বাধীন বাংলা চান। তিনি এই বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করছেন, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিচ্ছেন, কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে দেখা করছেন, জিন্নাহকে চিঠি লিখছেন, ব্রিটিশদের বোঝাচ্ছেন। অতএব, শেখ মুজিবও আছেন অখণ্ড বাংলার পক্ষে। আসাম, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা—সবটা মিলে একটা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা।

সোহরাওয়ার্দীর প্রতিষ্ঠিত দৈনিক *ইত্তেহাদ*-এ অখণ্ড বাংলার পক্ষে খুব লেখা হচ্ছে।

আর নাজিম উদ্দিন প্রমুখের দৈনিক *আজাদ*-এ বলা হচ্ছে, অখণ্ড বাংলা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য মৃত্যুপরোয়ানা।

মুজিব যাচ্ছেন ইসলামিয়া কলেজের দুই হোস্টেলের রুমে রুমে। ছাত্রদের বোঝাচ্ছেন। তাঁর বিরোধিতা করছেন ছাত্রলীগের ডানপন্থী গ্রুপের নেতা শাহ আজিজ প্রমুখ।

হোস্টেলের লনে দাঁড়িয়ে এখন মুজিব কথা বলছেন, অখণ্ড বাংলার পক্ষে যুক্তিগুলো উপস্থাপন করছেন। ছাত্ররা গোল হয়ে তাঁর বক্তব্য শুনছে। তিনি বললেন, 'স্বাধীনতা এলে হিন্দু-মুসলিম সমস্যাও থাকবে না। এটা হচ্ছে, কারণ, ঔপনিবেশিক শাসকরা বিভেদ জিইয়ে রাখতে চায়। মানুষের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই; তাই তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য হিন্দু বা মুসলমানকে দায়ী ভাবছে। বাংলা স্বাধীন হলে এই সমস্যা থাকবে না। বাংলা হবে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা না থাকলে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাও থাকবে না।'

একজন বললেন, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি যে বলছেন, বাংলা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু বাংলা দিল্লি থেকে প্রতিবছর ৬৪ কোটি রুপি পায়। সেটা না পেলে আমাদের কী হবে?'

মুজিব একটু থমকে গেলেন।

তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে এলেন তাঁর সহপাঠী একজন। তাঁর নাম সালাহউদ্দীন। তিনি অর্থনীতি ভালো বোঝেন। তিনি বললেন, 'দিল্লি বাংলাকে ৬৪ কোটি রুপি দেয়, কিন্তু বাংলা ট্যাক্স থেকে, কাস্টমস থেকে ৬৪ কোটি রুপির চেয়ে অনেক বেশি দেয় দিল্লিকে।'

মুজিব বললেন, 'তাহলেই বুঝুন, আমাদের কী করা উচিত? আমরা চাই বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা।'

১৪.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টির পানি জমে আছে। কাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ত্রিকালদর্শী ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি

গাছের ডালে বসে পরস্পরের চোখের দিকে তাকায়। বৃষ্টিটা হওয়ায় গরমটা একটু কমেছে। শহরের মানুষেরা একটু জিরোতে পারবে। যা গরম পড়েছে এবার!

ব্যাঙ্গমা বলে, 'ব্যাঙ্গমি, নেহরু কী করতেছে, খেয়াল করতেছ!'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'নেহরু কী করে, সেইটা দেখার আমার দরকার নাই। তুমি দেখো!'

'আহা, শোনো না, ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কী কন?'

'উনি তো এখন ব্যস্ত কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে সালিসিতে। ভারত কীভাবে স্বাধীন হইব। ভাগ হইব, নাকি প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসন পাইয়া যুক্তরাষ্ট্র গড়া হইব—এই সব নিয়া তিনি ব্যস্ত।'

ব্যাঙ্গমা হাসে। 'উনি তো এই সব নিয়াই ব্যস্ত থাকবেন। ওনার ঘর-সংসার নিয়া তো কোনো টেনশন নাই। বউ শান্তিতে আছে। উনি তাঁর প্যালেসের আঙিনায় খাড়ায়া আকাশের দিকে তাকায়া হাঁপ ছাড়তেছেন, পামেলার মা একটা ভালো বন্ধু পাইয়া গেছে, ও খুব ভালো আছে, নেহরুর সাথে ওর বনে ভালো।'

'হ, কথাটা খারাপ কইল কী?'

'আরে, জহরলাল নেহরু তখন প্রেম চালায়া যাইতেছে মাউন্টব্যাটেনের বউ এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের সাথে। দেখতেছ না?'

'অরা প্রেম করে নাকি গোস্সা করে করুক। আমগো কী?'

'কোনখানে শুরু হইল প্রেমটা, কও তো দেখি। ম্যাশোবরায়। ওই পাহাড়ি স্টেশনটা, ওইখানে তারা সবাই বেড়াতে গেল, না কী একটা ফ্যামিলি পার্টি করল। তখনই ওই প্রেমের শুরু।'

'কিসের প্রেম? ওই যে অরা সোফায় বইসা কথা কইতেছে, নেহরু আর এডুইনা। কই, খালি তো দেখি কথাই কয়। শরীরের পোশাক-আশাকও তো ঠিক আছে। তুমি খালি বানায়া কথা কও। ওনাদের মাইয়া পামেলাও তো দেখি ওইখানে ঘুরঘুর করে।'

'তুমিও তো দেখি মাউন্টব্যাটেনের মতো নিশ্চিন্ত। যাক। এডুইনা ভালো আছে। নেহরুর সাথে তার বনে ভালো। অরা একসাথে থাকলে বড় ভালো থাকে। থাকুক।'

'হ, ভালো থাকলে থাকুক।'

'আর এই সুযোগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিয়া দিতেছে।'

'ভালো। স্বাধীনতা পাইতেছে ভারত। খারাপ কী?'

'খারাপ-ভালো বলার তো আমরা কেউ না। আমরা শুধু কী ঘটতেছে, সেইটা দেখতে পারি। ঘটনার গতিপথ তো আমরা বদলাইতে পারি না। তাই না?'

'সেই। আগামী ১০ বছর ধইরা এডুইনা আর নেহরু চিঠি লেখালেখি চালায়া যাইব। এইটাও আমগো দেখতেই হইব। আমরা কিছু কইতে পারব না।'

'এক সুটকেস ভরা চিঠি লেখব। ১০ বছর পরে চিঠিতে মনে করব এখনকার দিনগুলানের কথা, কী লেখব আমি তোমারে কই—সম্ভবত তুমিও বুঝতে পারলে, আমাদের মধ্যে আছে এক গভীর গভীরতর লগ্নতা, কী এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি যেন আমাদের দুজনকে পরস্পরের কাছে টানছে। আমি অভিভূত হলাম, হলাম উল্লসিত, এই নতুন আবিষ্কারে। আমরা আরও অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে লাগলাম, যেন কোনো পর্দা গেল সরে, আমরা পরস্পরের চোখে তাকাতাম কোনো শঙ্কা বা অস্বস্তি ছাড়াই।'

'তুমি তো দেখি ভালোই পড়ো। শেখো শেখো। দেখলা, কত সুন্দর কইরা লিখছে। তুমি কোনো দিনও আমারে এমন সুন্দর কথা কইছ?' ব্যাঙ্গমি বলে।

'নেহরু তার বউরে কোনো দিনও কইছে?' ব্যাঙ্গমা জিজ্ঞেস করে।

'তার বউ তো মইরা গেছে।' ব্যাঙ্গমি জানায়।

'তাইলে। তুমি চাও, আমি লেডি মাউন্টব্যাটেনরে এই সব কথা কই?' ব্যাঙ্গমা রসিকতা করার চেষ্টা করে।

ব্যাঙ্গমি কপট রাগ দেখায়, 'ওরে। মনে মনে তোমার এই...'

'আরে না। কাউরে প্রেম করতে দেখলে ভালো লাগে, তাই না? নেহরু কত কী করব এই লেডির লাইগা। এরপরে নেহরু হইব ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তারপর ব্রিটেনে নেহরু রানিরে চিঠি লিখব: লর্ড মাউন্টব্যাটেন আর তার বউ লেডি মাউন্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য অনেক কিছু করছেন, তাঁদেরকে পুরস্কার দেন। এই চিঠি নিয়া রানির অফিসে অনেক হাসাহাসি হইব। যে উত্তরটা অরা লিখব, সেইটা মোটেও ভালো কিছু না।' ব্যাঙ্গমা বলে।

ব্যাঙ্গমি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, 'আরে, বাদ দাও। অরা প্রেম করে, অন্যদের সহ্য হয় না।'

'তবে প্রেমটা কিন্তু হইব অমর প্রেম। ১০ বছর পর যখন এডুইনা মারা

যাইব, তখন প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ পাঠায়া দিব সেইখানে, যেইখানে সাগরের বুকে সমাহিত করা হইব এডুইনারে। নৌবাহিনী গিয়া নেহরুর পক্ষ থাইকা ফুল দিব এডুইনার সলিলসমাধিতে।'

ব্যাঙ্গমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আহা, কী গভীর ভালোবাসা!'

ব্যাঙ্গমা ঠেস দিয়ে বলে, 'অরা যখন প্রেম করে, তখন মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করে। পাকিস্তান হইব। ভারত হইব। কাটাছেঁড়া চলব।'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'তাই তো।'

ব্যাঙ্গমা বলে,

নেহরু এডুনা করে পিরিতি যখন।
মাউন্টব্যাটেন ভাঙে ভারত তখন ॥
কলমের দাগ দিয়া খণ্ডিল ভারতে।
এডুনা নেহরু ওড়ে ভালোবাসা রথে ॥
এক বাক্স চিঠি লিখবে প্রেমিকযুগলে।
এই কথা লেখা থাকে কর্তিত ভূগোলে ॥
এডুনার মাথা নিল নেহরু ছিইনা।
পোকা কাটা পাকিস্তান পাইল জিন্নাহ ॥

ব্যাঙ্গমি বলে,

আমরা সেসব দেখি দর্শক কেবলি।
করতে পারি না কিছু শুধু কথা বলি ॥

১৫.

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। কাঁঠালপাকা গরম। কাঁঠালগাছগুলোর কাঁঠাল নিশ্চয়ই পাকতে শুরু করেছে। শুধু নদীর ধারের মড়াঘাটির কাঁঠালগাছটার কাঁঠাল অবশ্য বর্ষাকালে পাকে। কিন্তু এই রকম গরম

পড়লে কাঁঠাল তো কাঁঠাল, পাথরও পেকে গলে যেতে পারে।

এই গরমে শেখ লুৎফর রহমান সাহেব বেরিয়েছেন তাঁর বাড়ি থেকে। হেঁটে হেঁটে নদীর ঘাটে গেলেন তিনি। ওখানকার দোকান থেকে চারটা ব্যাটারি কিনলেন। রেডিওটা কাল খুব শোঁ শোঁ আওয়াজ করেছে। ব্যাটারি না বদলালেই নয়।

হেঁটেই ফিরলেন বাসায়।

রেডিওতে আজ আছে বিশেষ অনুষ্ঠান। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ভাইসরয় লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন (অব বার্মা) তাঁর ঘোষণা দেবেন। ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে হবে এই ঘোষণা।

শেখ লুৎফর রহমান সাহেব হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। সাতটা ১০ বাজে। দিল্লি সময় সাতটায় ভাষণ হবে। তার মানে, ঢাকার সময় সাতটা ৪০ মিনিট। এখনো ২০ মিনিট দেরি আছে।

সাতটা ২৪ বেজে গেল। আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন শেখ লুৎফর রহমান।

মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা দিলেন আরও কয়েক মিনিট পর। ইংরেজিতে বললেন, ভারত দুটো দেশে ভাগ হবে—ভারত আর পাকিস্তান। এইভাবে ভারত স্বাধীনতা পাচ্ছে।

এরপর বললেন জওহরলাল নেহরু আর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দুজনেই জানালেন, এই প্রস্তাবে তাঁরা সম্মত আছেন। জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা করলেন হিন্দিতে। তাঁর গলার স্বরেই বোঝা গেল, তিনি কিছুটা হতাশ। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ দিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল আত্মবিশ্বাস।

লুৎফর রহমান সাহেব খুশি।

তিনি হাঁক ছাড়লেন, 'রেনু রেনু।'

রেনু এল। 'বাবা, ডেকেছেন?'

'মা, তোমার স্বামীর মোকসেদ তো পুরো হয়ে গেল। পাকিস্তান হয়েই যাচ্ছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাষণ দিল। কায়েদে আজম ভাষণ দিলেন। যাও। খুশির খবরটা তোমার মারে জানাও।'

রেনু বলল, 'বাবা, বাংলা কি দুই ভাগ হবে?'

'হ্যাঁ। তাই তো।'

'কলকাতা কি ইন্ডিয়াতে পড়বে, আর ঢাকা পাকিস্তানে?'

'তা-ই তো মনে হয়।'

'সোহরাওয়ার্দী সাহেব তো এখন সেইটা আর চায় না।'

'চায় না! তাইলে কী চায়?'

'তারা এখন চায়, বাংলা স্বাধীন হোক। কিন্তু বাংলা ভাগ করা যাবে নানে।'

'একেক সময় একেকটা চাইলে হবে?'

'কী জানি।' রেনু বলল।

'আরে, আমি আরও খুশি মনে চাইরটা ব্যাটারি কিইনে আনলাম। খবরটা শুনে খুশি হলাম। এর মধ্যে অরা আবার নতুন লাইন ধইরেছে।'

শেখ মুজিব ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলে আর সবার সঙ্গে বসে মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা শুনলেন। তবে তিনি হতাশ নন। দিল্লিতে বসেছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল। সেখানে সোহরাওয়ার্দী সাহেব, আবুল হাশিমরা বাংলার পক্ষ থেকে কথা বলবেন। জানিয়ে দেবেন, বাংলা ভাঙার পক্ষে তাঁরা নন। শরৎ বসু, আবুল হাশিম এই মর্মে একমত হয়েছেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের এই দুই নেতার মধ্যে। জিন্নাহও বলেছেন, দুই বাংলা এক থাকলে তো খুব ভালো হয়। কলকাতা ছাড়া বাংলাকে নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কাজেই এই মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা মুসলিম লীগের কাউন্সিলে প্রত্যাখ্যানও হতে পারে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব, আবুল হাশিম সাহেব আর বাংলার কাউন্সিলররা বসেছিলেন থিয়েটার রোডের সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বাসভবনে। সবাই ঠিক করেছেন, বাংলা ভাঙার প্রস্তাব এলে তাঁরা বিরোধিতা করবেন। এর অন্যথা তো হওয়ার কথা না। কাউন্সিলরদের একজন ঢাকার তাজউদ্দীন। তাঁর সঙ্গে মুজিবের কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমরা আপনাদের সঙ্গে একমত। জিন্নাহই তো বলেছেন, পোকায় খাওয়া পাকিস্তান তিনি চান না।'

তাজউদ্দীন আহমদ আর ঢাকার কাউন্সিলররা আবুল হাশিমকে ঘিরে বসে আছেন দিল্লির ইম্পিরিয়াল হোটেলের লবিতে। এই হোটেলেই আজ তাঁদের কাউন্সিল হয়ে গেছে। সকালবেলা। এখান থেকে গিয়ে জিন্নাহ রেডিওতে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁরা খুবই হতাশ। কারণ, সোহরাওয়ার্দী তাঁর কথা রাখেননি। তিনি আগেভাগে দিল্লি এসেছিলেন প্লেনে। সোহরাওয়ার্দীকে ডেকে জিন্নাহ বলেছিলেন, জিন্নাহর প্রস্তাব যেন তাঁরা সমর্থন করেন। জিন্নাহর কথায় সোহরাওয়ার্দী রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।

আজ রেডিওতে ভাষণের আগে, সকালবেলা, কাউন্সিলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জিন্নাহ পাস করিয়ে নিয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বাংলা ভাগ করে পাকিস্তান বানানোর প্রস্তাবটা সমর্থন করার জন্য জিন্নাহ উপস্থাপন করলেন।

এই সময় তাজউদ্দীন যা ঘটতে দেখলেন, তা মনে করে তাঁর শরীর এখনো কাঁটা দিচ্ছে।

হোটেলের রান্নাঘর থেকে খাকসার আন্দোলন নামে একটা স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীর সদস্যরা বেলচা হাতে আক্রমণ করতে এল সভাকক্ষের সামনে ও পেছনে—দুই দিক থেকেই। সামনের দিকে সভা পাহারা দেওয়ার জন্য ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আর পেছন দিকে ছিল পাঞ্জাবি স্বেচ্ছাসেবকের দল। খাকসারদের ওপরে তারা চড়াও হলো। খাকসারদের রক্তে ভেসে গেল সম্মেলনকক্ষের মেঝে।

রক্তাক্ত খাকসারদের সরিয়ে আবার সভার কাজ শুরু হলো।

আবুল হাশিম বললেন, 'আমার কিছু কথা আছে।'

জিন্নাহ বললেন, 'না, আবুল হাশিমকে বলতে দেওয়া হবে না।'

কাউন্সিলররা বললেন, 'না, আমরা আবুল হাশিমের কথা শুনতে চাই।'

জিন্নাহ বললেন, 'আমি যদি এখন আবুল হাশিমকে বলতে দেই, তাহলে তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করতে আমার ১০ জন প্রথম শ্রেণীর বক্তাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এত সময় আমার হাতে নাই।'

কাউন্সিলররা তবু হইচই করতে লাগলেন।

জিন্নাহ কঠিন গলায় বললেন, 'আলোচনা করার কী আছে। বাংলা আর পাঞ্জাবের ভাগ নিয়ে কথা তো! এই বিষয়ের মীমাংসা হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। আপনাদের মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদ হয় সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে, না হয় সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিতে হবে। বলুন, হ্যাঁ কি না?'

হাত উঠিয়ে ভোট হলো। সোহরাওয়ার্দী বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, 'কায়েদে আজম, কেবল ১১ জন আমাদের বিপক্ষে, আর সবাই পক্ষে। প্রস্তাব পাস।'

তাজউদ্দীন আর কামরুদ্দীন আবুল হাশিমকে বললেন, 'কী করবেন এখন।'

আবুল হাশিম বললেন, 'একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছি। তাতে লিখেছি, মুসলিম লীগের কাউন্সিলরদের সিদ্ধান্ত তিন প্রকার ভয়ের পরিণাম—এক.

জিন্নাহর প্রতি চিরাচরিত ভীতি, দুই. অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কা আর তিন. জিন্নাহ অসন্তুষ্ট হলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানে সরকারি পদ পেতে অসুবিধা হবে, এই ভয়। তাজউদ্দীন, কেমন হলো আমার বিবৃতিটা?' আবুল হাশিম জিজ্ঞেস করলেন।

'ভালো। কিন্তু এই সব বলে এখন কী হবে?'

'বলে রাখলাম। ভবিষ্যতের ইতিহাস জানবে, আবুল হাশিম প্রতিবাদ করেছিল।'

'এরপর আমাদের আর কোনো আশা নাই?'

কামরুদ্দীন বললেন, 'একমাত্র আশার জায়গা হলো বাংলার এমএলএদের ভোট। তাঁরা যদি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, তাহলে বাংলা ভাগ রোধ করা যাবে।'

সেই আশা নিয়ে তাজউদ্দীনসমেত পূর্ব বাংলার কাউন্সিলররা গেলেন দিল্লির খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা শরিফে। সেখানকার পরিদর্শক বইয়ে স্বাক্ষর করলেন তাঁরা।

প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বসল। প্রথমে পূর্ব বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর এমএলএরা ভোটাভুটিতে অংশ নিলেন। ১০৬-৩৫ ভোটে প্রস্তাব পাস হলো, বাংলা ভাগ করা চলবে না।

এরপর পশ্চিম বাংলার অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর এমএলএরা ভোট দিলেন। এবার বাংলা ভাগ না করার প্রস্তাব গৃহীত হলো ৫৮-২১ ভোটে।

এরই মধ্যে একটা কিছু ঘটল। এরপর উভয় অংশের যুক্ত অধিবেশন বসল। এবার দেখা গেল, বাংলা ভাগের পক্ষে প্রস্তাব পাস হলো ১২৫-৯০ ভোটে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংবাদপত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন, 'আশা-নিরাশার যন্ত্রণার ইতি হলো অবশেষে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের আদর্শের পিঠে ছুরিকাঘাত করা হলো। বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হবে অচিরেই। মুসলিম বাংলার ক্ষোভের বিশেষ কোনো কারণ নেই। আমরা অবশ্য চেয়েছিলাম সুষম ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র, যেখানে আমরা স্বনির্ভর হয়ে আমাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করে বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী জাতি গড়তে পারতাম। কিন্তু সেই লক্ষ্যের পথে যৌথভাবে এগিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।'

এবার তিনি কেন আবার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বললেন, তাজউদ্দীন কিছুই

বুঝছেন না। খবরের কাগজে সব পড়ছেন। কামরুদ্দীন সাহেবের বাসায় গিয়েই খবরের কাগজ পড়েন তিনি। *ইত্তেহাদ*-এ ছাপা হয় সোহরাওয়ার্দীর পক্ষের খবর ও লেখা। *আজাদ*-এ ছাপা হয় খাজা নাজিম উদ্দিনের পক্ষের খবর। পরস্পরকে আক্রমণও করছে তারা।

কামরুদ্দীন সাহেব বললেন, 'মনে হয় সোহরাওয়ার্দী সাহেব বুঝে গেছেন, পাকিস্তানে তিনি মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন না। লিয়াকত আলী খান তো তাঁকে দুই চক্ষে দেখতে পারেন না।'

'কী জানি।' তাজউদ্দীন মাথা চুলকাতে লাগলেন।

'চলেন, কলকাতা থেকে ঘুরে আসি। আবুল হাশিম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।'

'চলেন।'

১৬.

তাজউদ্দীন আবার গেলেন কলকাতা। তিনি একা নন। পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগের বিভিন্ন জেলার আবুল হাশিমপন্থী কর্মীরা। এখন তাঁদের কর্তব্য কী। এত দিন তাঁরা একবার পাকিস্তান, একবার অখণ্ড বাংলার পক্ষে কাজ করেছেন। সব সময় তাঁরা আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপে ছিলেন। খাজা নাজিম উদ্দিনদের দলে কখনো ভেড়েন নাই। এবার তাঁরা কী করবেন। বাংলা যদি সত্যি ভাগ হয়ে যায়, তাহলে আবুল হাশিম ঢাকায় আসবেন তো?

আবুল হাশিম বললেন, 'না, আমি কলকাতা ছাড়ব না। আপনারা, বাংলাদেশের সমস্ত বামপন্থীরা একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন করুন। ঢাকা যান। ঐক্য রচনা করুন।'

শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, 'আমি তো এখন ঢাকায় ফিরতে পারব না। কারণ, সামনে আমার পরীক্ষা। বিএটা দিয়ে যাই অন্তত। তার ওপর সামনে প্রাদেশিক পরিষদ তাদের নেতা নির্বাচন করবে। এবার মনে হচ্ছে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ওরা সরাতে চাচ্ছে। আমি দেখি, লিডারের পাশে থাকি। আপনারা যান। পরীক্ষা দিয়ে আমিও আসব। আমাদের আবার

শুরু করতে হবে। আমরা পূর্ব বাংলাতেই আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমরা হার মানব না।'

এই বার্তা নিয়ে তাজউদ্দীন ফিরে এলেন ঢাকায়।

মুজিব রইলেন তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে। নেতা আদেশ করলেন, 'সিলেটে গণভোট হবে। ওরা পাকিস্তানে থাকবে, নাকি ভারতে থাকবে। মুজিব, তুমি যাও। সিলেটবাসীকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করো।'

৫০০ কর্মী নিয়ে শেখ মুজিব চলে গেলেন সিলেটে। ব্যাপক প্রচার চালালেন পাকিস্তানের পক্ষে। সিলেটবাসী পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিল।

এখানেই শেখ মুজিবের দেখা হলো মওলানা ভাসানীর সঙ্গে। তিনিও সিলেটে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। মুজিব গিয়ে তাঁর পায়ে সালাম করলেন, 'হুজুর, আমার নাম শেখ মুজিব। আমার জন্য দোয়া করেন।'

'তুমি শেখ মুজিব? মুজিবকে জড়িয়ে ধরলেন ভাসানী। 'মিয়া, তোমার নাম আমি অনেক শুনছি। তোমারে দেখার ইচ্ছা ছিল। আল্লাহ সেইটা মিটায়া দিল।'

সিলেট রেফারেন্ডামে পাকিস্তানপন্থীদের জয় হলো।

ক্লান্ত দেহে কিন্তু হৃষ্টচিত্তে মুজিব ফিরলেন কলকাতায়।

এবার বঙ্গীয় আইন পরিষদের নেতা নির্বাচন। কে হবে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী (চিফ মিনিস্টার)।

এইবার আবুল হাশিম বললেন, 'আমি যখন সভাপতি হতে চেয়েছিলাম, সোহরাওয়ার্দী নিরপেক্ষতা দেখিয়েছিলেন। এবার আমি নিরপেক্ষতা দেখাব।'

বামপন্থীরা আবারও দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

আর তখন পাকিস্তানের জোশ সর্বত্র। এত দিন ধরে খাজাপন্থীরা প্রচার করেছে যে অখণ্ড বাংলার সমর্থক সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান নিয়ে কথা বলার অধিকার নাই।

সিলেটের ১৭ জন পরিষদ সদস্য সোহরাওয়ার্দীর কাছে প্রস্তাব দিলেন, তাঁদের থেকে যদি তিনজন মন্ত্রী নেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা সোহরাওয়ার্দীকেই সমর্থন দেবেন। সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'শর্ত দিয়ে আমি ভোট কিনে নেতা হতে চাই না।'

খাজা নাজিম উদ্দিন টাকা ছড়াতে লাগলেন।

মির্জাপুরের আর পি সাহা টাকার ব্যাগ নিয়ে হাজির হলেন সোহরাওয়ার্দীর বাড়িতে। বললেন, 'ওরা এমএলএ কিনছে। আপনিও কিনুন। আপনার জন্য এই যে টাকা...'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'টাকা দিয়ে এমএলএ কিনতে হবে? আমি কেনাবেচার রাজনীতি করি না।'

ভোট হলো। প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন—সোহরাওয়ার্দী আর খাজা নাজিম উদ্দিন। সোহরাওয়ার্দী পেলেন ৩৯ ভোট, নাজিম উদ্দিন ৭৫ ভোট।

তিনি পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব খাজাকে, আর পশ্চিম বাংলার দায়িত্ব প্রফুল্ল ঘোষকে অর্পণ করলেন।

মুজিব গেলেন তাঁর কাছে। 'নেতা, এখন আমার কী কর্তব্য? কাজ দেন।'

নেতা বললেন, 'গান্ধীজির সঙ্গে আমি যাব শান্তিমিশনে।'

মাথায় কংগ্রেসি টুপি, পরনে খদ্দর পরে গান্ধীজির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন সোহরাওয়ার্দী।

শেখ মুজিবের মনে হতাশা। এখন তাঁরা কী করবেন? তিনি ইসলামিয়া কলেজের সিরাজউদ্দৌলা হলে ডাকলেন তাঁর ছাত্র-যুব নেতা-কর্মীদের। 'দরজা বন্ধ করো।' দরজা বন্ধ হলো।

'এখন আমরা কী করব?' একেকজন একেক রকম বক্তব্য দিলেন। এবার মুজিবের বলার পালা। মুজিব বললেন, 'স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ হয়নি। এবার আমাদের যেতে হবে বাংলা দেশের পবিত্র মাটিতে। এই স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়। মুসলিম লীগের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি ও তাতে পশ্চিমাদের যে প্রাধান্য, তা থেকে আমার মনে হচ্ছে, হয়তো বাংলার মাটিতে নতুন করে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে।'

তারপর শেখ মুজিব বসলেন পরীক্ষার হলে।

১৭.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটন ডিস্ট্রিক্ট কলম্বিয়ায় এখন গ্রীষ্মকাল। রাস্তায় রাস্তায় ছেলে-বুড়ো সব হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভেতরে শীত বা গ্রীষ্ম আলাদা করে বোঝার উপায় নাই। শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র সরকারি দপ্তরগুলোর ভেতরের আবহাওয়া বারো মাস একই রকম রেখে দেয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল তাঁর নিজের কেদারায় বসে

আরামে পা দোলাচ্ছেন। তাঁর পরনে ঘিয়ে রঙের স্যুট। টাইয়ের রং নীল আর লাল। আমেরিকার পতাকার রং। তাঁর হাতে একটা চিঠি। এই চিঠি যাবে প্রেসিডেন্টের কাছে।

তাঁর দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সহকারী চিঠিটা মুসাবিদা করেছেন। করেছেন তাঁরই নির্দেশ ও পরামর্শমাফিক। তিনি দুটো ছোট সংশোধনী দিলেন। আরেকবার ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে খটখট শব্দ তুলে সংশোধিত হয়ে কাগজটি এল তাঁর হাতে। তিনি নিচে স্বাক্ষর করে দিলেন।

স্মারক চলে গেল প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের কাছে। চিঠিটা প্রেসিডেন্ট হাতে তুলে নিয়েছিলেন অন্যমনস্কভাবে। পড়তে গিয়ে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিঠি।

মার্শাল লিখেছেন, '১৫ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান রাষ্ট্র বলে একটা নতুন সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, ভারতের উত্তর-পশ্চিমের একটা বড় অংশ আর দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটা ছোট্ট অংশ নিয়ে।

'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হবে যদি আমরা রাষ্ট্রটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বীকৃতি দিয়ে দিই। এটা করা যাবে সম্ভাব্য রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে।

'পঁচাত্তর মিলিয়ন লোকের পাকিস্তান হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র, আর এটা হবে রণকৌশলের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।'

হ্যারি এস ট্রুম্যান হাত পাকিয়েছেন হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করে। যুদ্ধে জেতার জন্য এটা দরকার ছিল না, দরকার ছিল ওই বোমা কতটা মানুষ মারতে পারে, সেটা যাচাই করে দেখা।

এবার তিনি সেই হাত ব্যবহার করলেন একটা ইশারা প্রদানের কাজে। তিনি মার্শালকে হাত নেড়ে সম্মতি দিলেন, এগিয়ে যাও। মার্শাল শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটার গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে।

জিন্নাহ ১৫ আগস্টের চার দিন আগে, অ্যাসেম্বলির বৈঠকে জানিয়ে দিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আর জনগণ আমাদের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। আপনাদের আসন্ন মহান কর্তব্যের সুমহান সাফল্য কামনা করেছেন তাঁরা।

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি তখন সূর্যস্নান করছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছের ডালে। হঠাৎই ব্যাঙ্গমা উদাসীন হয়ে গেল। ব্যাঙ্গমি বলল, 'কী হলো?'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'বর্ষাকালে আজকে একটু রোদ উঠছে, কী একটু আরাম কইরা পালকগুলা তাপায়া নিব, ওই দিকে শোনো না আমেরিকানরা কী করে? এই পাকিস্তান রাষ্ট্রটা কী হইব না হইব, না জাইনাই তারা তাগো পেছনে ত্যাল ঢালা শুরু করতাছে।'

ব্যাঙ্গমি ঠোঁট দিয়ে লেজটা ঠুকরে নিয়ে বলল, 'গরিব দেশগুলান ভাবে, তারা নিজের ভাগ্যের চাকা নিজে ঘোরায়। ঘোরায় বটে, তবে সেইটা কোন দিকে যাইব, সেই দিকটা ঠিক কইরা দেয় ওপরঅলা।'

'ঠিক করব, কিন্তু পুরাটা এবার শ্যাম চাচা পারব না। সেইটা বুঝতে দুই যুগ অপেক্ষা করতে হইব।'

ব্যাঙ্গমি বলে,

কোন দেশে কী ঘটবে, কে বা করে ঠিক।
নেতা নাকি সৈন্যদল, কিংবা পাবলিক ॥
শ্যাম চাচা কলকাঠি নাড়ে তলে তলে।
গরিবের ভাগ্যচাবি তাদের দখলে ॥

ব্যাঙ্গমা বলে,

তলে তলে নয় কাঠি প্রকাশ্যেই নাড়ে,
পাকিস্তানে নেবে তারা দুর্নীতির দ্বারে?
ছয় দশকের পরে পাকিস্তান কবে—
আমারে ছাড়িলে তুমি মোর ভালো হবে ॥
তোমার ভাতিজা আমি, তুমি শ্যাম চাচা,
আমারে ছাড়িয়া চাচা প্রাণ মোর বাঁচা ॥

১৮.

আজ রাতে স্বাধীন হবে দেশ?

কীভাবে?

পাঞ্জাবিদের অধীনে?

খাজা নাজিম উদ্দিন, লিয়াকত আলী খাঁকে মন্ত্রী বানিয়ে?

তাজউদ্দীনের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নাই। তিনি সকালবেলা উঠে আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন। প্রেসে যেতে হবে। নতুন দলের কর্মসূচি ছাপাতে হবে এক হাজার।

মুসলিম লীগের সভ্য তিনি। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আজ রাত ১২টায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান হতে যাচ্ছে। তাঁর তো স্বাধীনতা নিয়ে খুশি থাকার কথা। কিন্তু তাঁর মনে এই সব নিয়ে কোনো ভাবনা নাই, উত্তেজনা নাই। তিনি আছেন তাঁর নতুন দলের ম্যানিফেস্টো ইত্যাদি নিয়ে।

তাঁরা আবুল হাশিমের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। ঢাকায় এসে প্রগতিপন্থী সবাই বসেছেন অনেকবার। এবার তাঁরা ঠিক করেছেন, নিজেরা একটা দল করবেন। দলটার নাম একবার ভাবা হয়েছে গণ-আজাদি লীগ। এর মানে হলো, যে আজাদি আমরা পাচ্ছি, তা জনগণের নয়। গণ-আজাদি লীগ তাই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কামরুদ্দীন সাহেব আছেন। তিনিই আহ্বায়ক।

সেই গণ-আজাদি লীগের ম্যানিফেস্টো প্রেসে কম্পোজ করতে দেওয়া হয়েছে।

তাজউদ্দীন প্রেসে ঢুকলেন। এখনো পেছনের দিকে পাটি বিছিয়ে একজন কর্মচারী ঘুমুচ্ছে। তিনি ঢুকতেই আরেক কর্মচারী তাকে জাগানোর জন্য 'এই উঠ, এই উঠ, হালায় কত ঘুমায়' বলে চিৎকার করে উঠল।

প্রুফ তোলা হলো। কাগজে আঠা দিয়ে সেই কাগজ ঠেসে ধরা হয় কম্পোজ করা পাতের ওপর। কালি লাগানো থাকে। ছাপ পড়ে।

তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রুফ দেখলেন। ভুল ছিল। তিনি লাল পেনসিল দিয়ে সেসব কেটে সঠিক অক্ষর বসালেন। বললেন, 'এখনই এই সব কারেকশন করো। সেকেন্ড প্রুফ দেখে যাব।'

রোজার দিন। তিনি রোজা আছেন।

কোরআন শরিফ খুব সুন্দর পড়তে পারেন।

এখনো গ্রামে গেলে মসজিদে নামাজে ইমামতি করেন।

একটা একটা করে অক্ষর বদলে সংশোধনের কাজ চলছে। কম্পোজিটর ছেলেটার বয়স বেশি নয়। কিন্তু এরই মধ্যে চোখে চশমা নিতে হয়েছে। তার শুকনো পাতলা মুখটাকে দেখাচ্ছেও বুড়োর মতো।

সেকেন্ড প্রুফ এসে গেল। তিনি সেটাও মন দিয়ে দেখলেন।

এক হাজার কপি ছাপবেন। তিনি অর্ডার দিলেন।

বাইরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আনমনে বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। বাংলার বৃষ্টির অপরূপ রূপ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। বৃষ্টি থেমে গেল আধঘণ্টা পরই। আকাশ একদম ঝকঝকে। রোদ উঠে গেল। রাস্তায় একটু একটু পানি জমেছে।

একটা ইনজেকশন নিতে হবে। ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন হাসপাতালে। ইনজেকশনটা নিলেন।

তারপর আবার ছাপাখানা। ছাপার জিনিসটা নিজে সব সময় তত্ত্বাবধান করতে হয়। এখন ধরিয়ে না দিলে কাজটা তারা মেশিনে তুলবেই না। ছাপাখানার ম্যানেজার এরই মধ্যে এসে গেছেন। তিনি বললেন, 'ভাই, বিলটা তো দেওন দরকার আছিল।'

তাই তো। বিল দিতে হবে। কাজ তো উঠে গেছে। আবার ছুটলেন কামরুদ্দীন সাহেবের বাসায়। বাহন তাঁর সাইকেলটা। ২২ বছরের যুবক সাইকেলে চলাচল করেন অনায়াসে।

কামরুদ্দীন সাহেব চেক লিখলেন। কুড়ি টাকার চেক। তাজউদ্দীনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'শহরে কোনো কিছু দেখলেন? আজ রাতে না স্বাধীন হচ্ছে ভারত।'

তাজউদ্দীন বললেন, 'আরে আমাদের দেশটা হচ্ছে পাকিস্তান। না, তেমন কোনো কিছু দেখিনি। তবে ডেকোরেটরের লোকজন দেখলাম তোরণ বানাচ্ছে।'

'কাল কি ওরা র‍্যালি-ট্যালি করবে?'

'নবাব তো বলে দিয়েছেন র‍্যালি মিছিল না করতে। কমিটিরও তো সেটাই সিদ্ধান্ত। কী করবে ওরা, কে জানে?'

চেক নিয়ে তাজউদ্দীন গেলেন পার্টি অফিসে। সেখান থেকে আবার ছাপাখানায়। ম্যানেজারের হাতে চেক তুলে দিলেন। একজন বাইন্ডার দরকার। নিজেই বেরিয়ে গেলেন বাইন্ডারের খোঁজে। কুমারটুলী গিয়ে ধরে আনলেন একজনকে। নিজেরই সাইকেলের সামনে বসিয়ে তাকে নিয়ে চলে এলেন ছাপাখানায়। ততক্ষণে ছাপা শুরু হয়ে গেছে। পড়তে গিয়ে দেখলেন, ভুল রয়েই গেছে। উফ্! কোনো কিছু শুদ্ধভাবে প্রকাশ করা যে কত কঠিন। মেশিন থামালেন। আবার প্রুফ কাটলেন। আবার কারেকশন হলো। ছাপা শেষ হতে হতে বিকেল পেরিয়ে গেল। বাইন্ডারের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন সেখান থেকে।

পার্টি অফিসে এলেন। সেখান থেকে আবার কামরুদ্দীন সাহেবের বাসায়। ইফতারের সময় হয়ে এসেছে। ইফতারি খেলেন।

এর মধ্যে নবাববাড়ি মুসলিম লীগ থেকে প্যাম্ফলেট বেরিয়েছে। কাল শোভাযাত্রা বেরোবে। খাজা নাজিম উদ্দিন এসে পৌঁছেছেন ঢাকায়।

তারাবির নামাজসহ এশার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলেন, রাতের আকাশে তারা ঝলমল করছে। তারই পাশে আবার মেঘ। আকাশে এত তারা! সেই আকাশে আবার মেঘ। তিনি তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

এখন থেকে এটা আর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া না। এ আকাশ স্বাধীন। আজ শুরু হচ্ছে নিজেদের শাসন।

রাত ১২টার পর ঘুমুতে গেলেন।

স্বাধীনতার ভোরে উঠে নামাজ সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন বাইন্ডারের কাছে। সকাল আটটার মধ্যে সেখানে পৌঁছালেন তাঁরা। ৫০০ কপি ম্যানিফেস্টো নিয়ে গেলেন কামরুদ্দীন সাহেবের বাসায়। তিনি বাসায় নেই। কার্জন হলে গভর্নর আর তাঁর কেবিনেটের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেছেন।

বিকেলে শুরু হলো স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রা। সামনে একটা গাড়িতে খাজা নাজিম উদ্দিন। মধ্যখানে ঢাকার নবাব। বিরাট শোভাযাত্রা। তবে গত বছর ১৬ আগস্টের ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসে এর চেয়ে বড় শোভাযাত্রা হয়েছিল। অবশ্য গতবারের সঙ্গে আজকের শোভাযাত্রার একটা বড় পার্থক্য আছে। আজকেরটায় হিন্দুরাও যোগ দিয়েছে।

সাড়ে চারটার দিকে শোভাযাত্রা পৌঁছাল ভিক্টোরিয়া পার্কে। খাজা নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে পতাকা তোলা হলো। মুসলিম লীগের পতাকা। এখনো জাতীয় পতাকা ঠিক হয়নি। জাতীয় সংগীত ঠিক হয়নি। মাইকে গান বাজতে লাগল। আব্বাসউদ্দীন ও জসীমউদ্‌দীন সাহেব বেদার উদ্দীন আর সোহরাব হোসেনকে নিয়ে গাইতে লাগলেন 'আমার সোনার পূর্ব পাকিস্তান' আর গোলাম মোস্তফার 'পাকিস্তানের অভাব কী!' প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিনসমেত মুসলিম লীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা বক্তৃতা করলেন।

লাখো লোকের সমাগম হয়েছে। ঢাকার বাইরে থেকে বিনি পয়সায় ট্রেনে চড়ে এসেছে অনেকে।

তারা এসেছে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী দেখতে। রমনা দেখল তারা, সেখানেই রেসকোর্সের মাঠ। পাশেই ঢাকা ক্লাব। রমনার ভেতরে কালীমন্দির। গাছ আর গাছে সবুজ এই এলাকা। ওই ওখানে চামেরি হাউজ,

মেয়েদের হোস্টেল। তার পাশে তোপখানা রোডে ইডেন কলেজ। সেই ইডেন কলেজ এখন হবে সচিবালয়। বর্ধমান হাউস আজ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি। যুদ্ধের সময় নির্মিত মুরলি বাঁশের নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাক। সদরঘাট ঢাকার কেন্দ্র। পাঁচ রাস্তার মোড়। বুড়িগঙ্গার পাশে করোনেশন পার্ক। সদরঘাটের কাছেই সবচেয়ে বড় পোস্টাফিস। নবাবপুর রোড সবচেয়ে জমজমাট সড়ক। দুধারে সারি সারি বাড়ি আর দোকান। ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন।

রাজধানী দেখতে আসা জনতার বেশির ভাগই এসেছে ময়মনসিংহ থেকে।

তাজউদ্দীন সভা শেষ হওয়ার আগেই অকুস্থল ত্যাগ করলেন। তারপর নামল বৃষ্টি। অল্পক্ষণ পরই থেমেও গেল।

ভাগ্যিস তোরণগুলো বানানো হয়েছিল পাতা দিয়ে। কাজেই ভিজে নষ্ট হয়নি।

কার্জন হলের সকালের অনুষ্ঠানে কী হলো জানতে পারলেন তারপর। সকালে খাজা নাজিম উদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

রাতের বেলা ফুটে উঠল আলোকসজ্জা। বংশীবাজার, বাবুবাজার সেতু থেকে মোগলটুলী পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে জ্বলজ্বল করছে রঙিন বৈদ্যুতিক বাতি। আহসান মঞ্জিলের চূড়ায় আলোকসজ্জা হয়েছে নয়নজুড়ানো।

সারা রাত আতশবাজি, পটকাবাজি ফুটল।

হোটেল, মসজিদ, রেলওয়ে স্টেশন, এমনকি খোলা মাঠে লোক আর ধরছে না। অনেকেই সারা রাত ঘোরাঘুরি করল। তারা তাদের অনেক স্বপ্নের আর কষ্টের স্বাধীনতা লাভ করেছে।

আকাশে তারাও জ্বলছে।

শুধু এক কোণে তারা দেখা যাচ্ছে না। মেঘ জমছে সেই কোণটায়।

টুঙ্গিপাড়ার গ্রামে রেনু এপাশ-ওপাশ করছেন। তাঁর ঘুম আসছে না। প্রচণ্ড গরম। আর তাঁর শরীরটাও ভালো নয়। তিনি সন্তানসম্ভবা। তাঁর স্বামী এখনো কলকাতায়। কিন্তু কলকাতা আলাদা দেশ হয়ে গেছে।

তবু তিনি আসছেন না। পরীক্ষা দিচ্ছেন। আচ্ছা। দিক। বিএটা তো পাস করতেই হবে। শুধু দেশের সেবা করলে হবে! কিছুদিন আগে তাঁর চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন, 'রেনু। তুমি সারাটা জীবন কষ্ট করেছ।

জন্মের পর থেকেই তুমি কষ্টই পেয়েছ শুধু। আর এমন একটা লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলো, যে তোমাকে সময়ও দিতে পারে না! এমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।'

কী বলে লোকটা!

লোকটা কি জানে না, তাকে তিনি কত ভালোবাসেন? কী অলক্ষুনে কথাই না লিখে ফেলল!

তবে এত যে দেশের জন্য কাজ করল, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জন্য কাজ করল, কী হলো?

সোহরাওয়ার্দী সাহেবও তো মন্ত্রী হতে পারলেন না। কায়েদে আজম তো তাঁকে পাত্তাই দিলেন না। আর এত দিন যে তাঁরা স্বাধীন বাংলার কথা বললেন, সেটাও তো হলো না। তবে?

ভোর হচ্ছে। বাইরে কাক ডাকছে। রেনু আস্তে আস্তে বাইরে গেলেন। বারান্দায় পিতলের বদনায় পানি তোলাই ছিল। তিনি অজু করলেন।

আবার আঁধার করে এল।

তিনি আকাশে তাকালেন। তারা তো দেখা যাচ্ছে। তার মানে মেঘ নাই। তাহলে আবার অন্ধকার হয়ে এল কেন?

তাঁর মনে পড়ল, এ হলো সুবহে কাজিব। কপট প্রভাত।

দুই দিন পর ঈদ। তবু তিনি আসবেন না? আর কী কাজ তাঁর? রেনু এসে আবার শুয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরের ভেতরে আরেকটা শরীর। আরেকটা প্রাণ। মাঝেমধ্যে তা জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব, তার আগমনী সংবাদ। তাঁর সন্তান। তাঁদের সন্তান।

১৯.

ট্রেন শেয়ালদা ছাড়ল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের হুস হুস শব্দটার মধ্যে কেমন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস। বাক্স-পেটরা নিয়ে মুজিব আর শাহাদৎ উঠেছেন ট্রেনে। মুজিব যাবেন ঢাকায়। শাহাদৎ নামবেন গোয়ালন্দ, সেখান থেকে চলে যাবেন গোপালগঞ্জ।

ট্রেনে বেশ ভিড়। হিন্দু-মুসলিম, পূর্ববঙ্গীয়-পশ্চিমবঙ্গীয়, বাঙালি-বিহারি সব গাদাগাদি করে আছে। মুখ না খুললে বোঝাই যাবে না কে বিহারি, কে বাঙালি, কে বাঙাল, কে ঘটি। যতক্ষণ ট্রেনটা থেমে থাকে, দমবন্ধমতো লাগে। মানুষের ভিড়েরও একটা গন্ধ আছে। ট্রেন ছেড়ে দিলে বাতাস ঢোকে জানালা দিয়ে। আরাম বোধ হয়। শেখ মুজিব বসেছেন জানালার ধারে। সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট, কাঠের আসন। ট্রেন চলতে থাকলে স্টেশনের ঘরবাড়ি, স্তম্ভ, কড়িবর্গা—সব পেছাতে থাকে। প্রথমে যেন ওই সব দরদালান-স্থাপনা-বৃক্ষরাজি হাঁটছিল, পরে জোরে দৌড়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। দূরের আকাশে আলো আর মেঘ, মেঘগুলো কিন্তু সামনের দিকেই দৌড়াচ্ছে।

শেখ মুজিব মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকেন তার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা,

এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে!"

কলকাতার পাট তাঁর চুকল। তিনি তাঁর পূর্ব বাংলায় ফিরে যাচ্ছেন। কলকাতা থেকে তিনি এর আগেও বহুবার গেছেন টুঙ্গিপাড়ায়, যাওয়ার সময় বলেছেন, 'দেশে যাচ্ছি'; সবাই তা-ই বলে, গ্রামের বাড়িটাকে বলে দেশের বাড়ি। টুঙ্গিপাড়াই তাঁর দেশ! দেশ আসলে কী? এত দিন ছিল ব্রিটিশ ভারত। তার পর তিনি স্লোগান দিলেন, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। চোঙা তাঁর হাতে থাকত, নাকের নিচে মুখে ধরতেন চোঙা, গোঁফের জায়গাটায় চোঙার কোনা লেগে ক্ষতমতো হয়ে গিয়েছিল। তারপর সোহরাওয়ার্দী সাহেব, শরৎ বসু আর আবুল হাশিমের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনি অবিরাম প্রচার করে গেলেন অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার কথা, বৃহত্তর বাংলার কথা, যে বাংলায় থাকবে আসাম, দার্জিলিং, পূর্ব আর পশ্চিম বাংলা। কায়েদে আজম পর্যন্ত তাতে রাজি ছিলেন। রাজি হলো না কংগ্রেস, রাজি হলো না সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু আর মুসলিম নেতারা, রাজি হলেন না নেহরু আর বল্লভ ভাই প্যাটেল। আর এদিকে মুসলিম লীগের উর্দুঅলা নেতা খাজা নাজিম উদ্দিন প্রমুখ চান না কলকাতা পূর্ব পাকিস্তানে পড়ুক, তাহলে তাঁদের কর্তৃত্ব থাকবে না, সোহরাওয়ার্দী

সাহেবই তখন হয়ে উঠবেন গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই তাঁরাও কলকাতাকে বাদ দেওয়ার পক্ষে। তাঁরা বলে বেড়াতে লাগলেন অখণ্ড স্বাধীন বাংলাকে সমর্থন করা মানে পাকিস্তান আন্দোলনের পিঠে ছুরি মারা। গান্ধীজিও বাংলা ভাগকেই মেনে নিলেন। বাংলা ভাগ হলো। পূর্ব বাংলা এখন পাকিস্তানের অংশ। কলকাতা ভারতের।

নিজের দেশের মধ্যে যাতায়াত করছেন, এই বাস্তবতা হিসেবে একদিন গোপালগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। সেখান থেকে যখন ফিরছেন, কলকাতা তখন অন্য দেশ হয়ে গেছে, ঢাকা পড়েছে নিজের দেশে। তাহলে নিজের দেশে তিনি ফিরছেন? বিদেশ থেকে?

পাকিস্তান আন্দোলনে তো মুজিবও ছিলেন। এখনো তো তিনি মুসলিম লীগারই। কিন্তু তাঁর মুসলিম লীগ আর লিয়াকত আলী খান বা খাজা নাজিম উদ্দিনের মুসলিম লীগ কখনো এক ছিল না।

পাকিস্তান হাসিল হয়েছে, তাই বলে তাঁর কাজ শেষ হয়নি। মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ক্ষমতায়। তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ১৫ আগস্টে কলকাতা শহরে মিছিল বেরিয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। সেই মিছিলে তিনি যোগ দেননি, কিন্তু এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে মিছিলের পাশাপাশি হেঁটে বেড়িয়েছেন অনেক জায়গায়। ফিরে এসে লেখাপড়ায় মন দিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাঁর সহকর্মী বন্ধুদের জানিয়ে দিয়েছেন, পূর্ব বাংলায় গিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করা তাঁদের পরের কাজ। হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।

আজকাল ট্রেনে বড় বেশি ভিড় হয়। দেশভাগ লাখ লাখ মানুষকে পথে পথে ঘোরাচ্ছে। লোকজন কলকাতা ছাড়ছে। যদিও কলকাতায় ১৫ আগস্ট এসেছে শান্তি ও সম্প্রীতির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কারণ অবশ্য গান্ধীজি। এখানে তিনি অবস্থান নিয়েছেন স্বাধীনতার বেশ কয়েক দিন আগেই। করাচি থেকে এসে সোহরাওয়ার্দীও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

তবে সেপ্টেম্বরের শুরুতে আবার কিছুটা বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে গান্ধীজি অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশনের কারণে দাঙ্গার শক্তি পিছু হটে, শান্তিবাদীরা এগিয়ে আসেন।

সোহরাওয়ার্দী কাল গান্ধীজিকে নিজ হাতে ফলের রস তুলে দিয়ে অনশন ভঙ্গ করিয়েছেন।

আজ মুজিব তাঁর লিডার সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে তাঁর

সবচেয়ে প্রিয় ২৭ বছর বয়সী এই যুবক কর্মীটিকে বিদায় দিয়েছেন। বলেছেন, 'শেখ মুজিব, টুঙ্গিপাড়ায় যেয়ো। বউমার সঙ্গে কিছুদিন সময় কাটিয়ো। বউমাকে তোমার যে সময় দেওয়ার কথা ছিল, তা থেকে আমি অনেকটাই নিয়ে নিয়েছিলাম। আপাতত আমার হাত থেকে তোমার মুক্তি।'

মুজিবের চোখ ছলছল করে ওঠে। তিনি বলেন, 'লিডার, আপনি চলুন পূর্ব বাংলায়। খাজা নাজিম উদ্দিনের মতো সাম্প্রদায়িকতাবাদী লোকদের হাতে পাকিস্তানের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া হলে সেটা হবে সবার জন্য খারাপ। আপনাকে পাকিস্তানের দরকার হবে।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'ভারতের চার কোটি মুসলমানকে অনিশ্চয়তার হাতে ফেলে রেখে আমি চলে যেতে পারি না। আমি গান্ধীজির সঙ্গে আছি। দেখি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কতখানি ফিরিয়ে আনা যায়।'

নেতাকে খদ্দর আর গান্ধীমার্কা টুপিতে এমনিতেই অদ্ভুত লাগছে। শেখ মুজিব তাঁর চোখের দিকে তাকালেন। ছোটখাটো মানুষটির চৌকোনো মুখে দুটো ঠান্ডা চোখ। সেই চোখে মুজিব দেখতে পেলেন অপার্থিব মায়া।

মানুষটা এখন পর্যুদস্ত। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগে জিন্নাহ তাঁকে রাখলেন না। প্রাদেশিক আইনসভায় পার্লামেন্টারি দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন খাজা নাজিম। সোহরাওয়ার্দী সব দিক থেকে হেরে গেলেন। অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব নিয়ে ছোটাছুটি করলেন তত দিন, জিন্নাহ যত দিন এতে সম্মত ছিলেন। তারপর জিন্নাহ যেদিন বললেন, তিনি চান মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব মেনে নিতে, সঙ্গে সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী সাহেবও মত পাল্টালেন। সবকিছু করেছেন জিন্নাহর আস্থা অর্জন করতে। কিন্তু স্তাবকতায় নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে তিনি পারবেন কেন!

পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা মনে করছে, তিনি জিন্নাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আর হিন্দুরা বিশ্বাস করে, ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে হাজার হাজার হিন্দুর মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী।

অথচ শেখ মুজিব খুব ভালো করে জানেন, (পরবর্তীকালে ব্রিটিশ তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও বলা হবে), সোহরাওয়ার্দী সেদিন লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে বসে সব জায়গায় পুলিশ পাঠাচ্ছিলেন শান্তি স্থাপনের জন্য। তিনি সেনাবাহিনী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রের কাছে, নিজের জীবন বিপন্ন করে ছুটে বেড়িয়েছেন পাড়ায় পাড়ায়, শান্তি স্থাপনের জন্য।

কিন্তু শান্তি আসেনি। সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। মানুষ মারা গেছে।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীকেই দায়ী করেছে সর্বমহল।

এমনকি গান্ধীও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনের ব্যর্থতার দায়িত্ব তো তাঁকেই নিতে হবে।

১৫ আগস্টে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো।

এরই মধ্যে করাচি থেকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এসেছেন সোহরাওয়ার্দী।

গান্ধীজি হিন্দুদের ওপর হামলার আশঙ্কায় নোয়াখালী গেলেন। সোহরাওয়ার্দী করাচি থেকে কলকাতায় ফিরে এসে গান্ধীজিকে বললেন, তিনি যেন কলকাতায় থাকেন। কলকাতায় সম্ভাব্য দাঙ্গা মোকাবিলার জন্য কলকাতায় তাঁর থাকাটা জরুরি।

গান্ধী বললেন, 'যদি আপনি আমার পাশে থেকে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমি কলকাতায় থাকতে রাজি আছি।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

গান্ধী উঠলেন একটা বস্তিবেষ্টিত পরিত্যক্ত প্রাসাদ হায়দারি ম্যানশনে।

হাজার হাজার হিন্দু সেখানে গান্ধীকে ঘিরে ধরল। তারা বলল, 'কেন আপনি মুসলমানদের রক্ষা করতে এখানে এসেছেন। আপনি কেন নোয়াখালী যাচ্ছেন না?'

এই তুমুল হট্টগোলের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী সেখানে হাজির হলে জনতা 'চোর' 'খুনি' বলে তাঁর প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করতে লাগল। গান্ধীর শিষ্যরা এসে সোহরাওয়ার্দীকে গাড়ি থেকে বের করে ভেতরে নিয়ে গেলেন আর জনতাকে এই বলে শান্ত করেন যে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁদের দেখা হবে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এরই মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ঢিল-পাটকেল-থুতু।

তারা সোহরাওয়ার্দীর নাম ধরে ডাকছে, 'খুনি চোর সোহরাওয়ার্দী, বেরিয়ে এসো।'

সোহরাওয়ার্দী জানালার ধারে দাঁড়ালেন। তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গান্ধীজি।

জনতা বলল, 'সোহরাওয়ার্দী, স্বীকার করুন কলকাতার মহানিধনযজ্ঞের জন্য আপনিই দায়ী।'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই দায়ী।' সোহরাওয়ার্দী বললেন।

আমাদের প্রশ্নের জবাব দিন।

সোহরাওয়ার্দী পলকহীন চোখে জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার দায়িত্ব।'

বরফের মতো চোখে জনতার দিকে তাকিয়ে আছেন সোহরাওয়ার্দী। তাঁর চোখে এমন কিছু আছে, সেই ক্রুদ্ধ-রাগী জনতা শান্ত হয়ে এল।

আওয়াজ উঠল, 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।'

হত্যাকাণ্ড বন্ধ হলো কলকাতায়।

১৫ আগস্টের মিছিলে একটাই স্লোগান, 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।' এ এক অপূর্ব দৃশ্য। মুসলমানপাড়ায় হিন্দুরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মসজিদ থেকে মিঠাই বিলি করা হচ্ছে হিন্দু পথচারীদের মধ্যে। ট্রামে, বাসে সর্বত্র খুবই ভিড়। শেখ মুজিব তাঁর বন্ধুদের নিয়ে হাঁটছেন। পার্ক স্ট্রিট থেকে চৌরঙ্গী, এসপ্লানেড, কার্জন পার্ক। সেখান থেকে ময়দান ঘুরে গঙ্গার তীরে তাঁরা দাঁড়ালেন রেলিং ধরে। গঙ্গার জলে সূর্য ডুবছে। সূর্যের সোনালি প্রতিবিম্ব কাঁপছে জলের গায়ে। পাখিরা নীড়ে ফিরছে। আকাশে লাল রঙের মেঘ। সকালে বৃষ্টি হয়েছিল। এখন বৃষ্টি নাই।

মুজিব আবৃত্তি করতে লাগলেন :

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

কলকাতায় ব্রিটিশ অবসানের দিনগুলোয় দাঙ্গা হলো না বললেই চলে। রক্ত ঝরল পাঞ্জাবে। ছয় লাখ হিন্দু-মুসলমান খুন হয়েছিল বিভক্ত পাঞ্জাবে।

শেখ মুজিব জানেন, তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দী এখন ফিরবেন না পূর্ব বাংলায়। এর মধ্যে তিনি মুসলিম লীগের পশ্চিম বাংলার পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন।

কিন্তু শেখ মুজিবকে ফিরতে হবে। পূর্ব বাংলায় তাঁর জন্ম।

পদ্মাপাড়ের ছেলে তিনি।

হারার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি।

তিনি বললেন, 'লিডার। আমি যাচ্ছি ঢাকায়। আপনি থাকেন। চার কোটি মুসলমানের স্বার্থ দেখেন। কিন্তু মনে রাখবেন, ওই বাংলাতেও আপনাকে লাগবে। আমি যাই। গ্রাউন্ড ঠিক করি। আপনি কথা দেন, আপনি বাংলায় আসবেন।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'মুজিব, তোমাকে একটা কথা বলি। রাজনীতিতে কথা দেওয়া বলতে কিছু নাই। কিন্তু তুমি জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাংলাকে ভালোবাসি। পাকিস্তানকেও ভালোবাসি। আমার মন বলছে, আমি পাকিস্তানে যাবই।'

'পাকিস্তানে যাবেন। এবং আমার মন বলছে, আপনাকে আমরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানাব। আজ আসি।'

মুজিব হনহন করে চলে এলেন সোহরাওয়ার্দীর সামনে থেকে। এরপর আর পেছনে তাকানো বিপজ্জনক। মুজিবের চোখের জল লোকে কম দেখেছে। সব সময় দেখেছে তাঁর কর্মীমূর্তি। নির্ভীক রুদ্রমূর্তি। নেতাকে তাঁর চোখের জল দেখানোর মানে হয় না।

নেতা অবশ্য ব্যস্ত গান্ধীজিকে নিয়ে। এখন ভারতে আর পাকিস্তানে শান্তিমিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ানোই হবে তাঁর কাজ।

মুজিব ঢাকায় আসার জন্য গোছগাছ করেন। ইসলামিয়া কলেজের সবার কাছ থেকে বিদায় নেন। ২৪ নম্বর রুমটার দিকে শেষবার তাকিয়েও তাঁর বড় মায়া হয়। বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

এর মধ্যে টুঙ্গিপাড়া থেকে রেনুর চিঠি এসেছে। রেনু লিখেছেন, তাঁর সন্তানের জন্মক্ষণ এগিয়ে আসছে। শরীরটাও খুব ভালো যাচ্ছে না। তিনি যেন পরীক্ষা শেষ করেই দেশে চলে আসেন।

প্রথম সন্তানের জন্মের সময় মুজিব রেনুর পাশে থাকেননি। সেই সন্তানটা বাঁচেনি। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় তিনি তাঁর পাশে থাকতে চান।

কিন্তু তবু তিনি সরাসরি টুঙ্গিপাড়ায় যাচ্ছেন না। আগে তিনি নামবেন ঢাকায়। ঢাকার পরিস্থিতি তাঁকে বুঝতে হবে। এরই মধ্যে ঢাকার মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ একটা প্রতিনিধি সভা ডেকেছে। সেটাতে কী হয়, তাদের উদ্দেশ্য কী, একটু বোঝা দরকার। ঢাকায় কয়েক দিন থাকবেন। সেখান থেকে যাবেন টুঙ্গিপাড়ায়।

গোয়ালন্দ ঘাটে এসে থামে ট্রেন। তখন রাতের শেষ প্রহর। চারদিক অন্ধকার।

কুলিরা দৌড়ে এসে ওঠে চলন্ত ট্রেনের কামরায়।

শাহাদৎ বিদায় নেবেন। মুজিবকে স্টিমারে উঠতে হবে। তাঁরা দুজনেই ট্রেন থেকে নামেন। প্রায় একটা পাথারে এসে থেমেছে ট্রেনটা। আকাশে নক্ষত্ররাজি। দূরে স্টিমারের সার্চ লাইট। কালো আকাশের গায়ে আলোর ঝাপটা ছোটাছুটি করছে। পায়ের নিচে নদীচর। জোনাক পোকার আলো দেখা যায় অন্ধকারে, থোকা থোকা।

মুজিবের স্যান্ডেলের মধ্যে বালি ঢুকে গিয়ে কিচকিচ করে।

সবাই ছুটছে স্টিমারের দিকে। যেন খানিক পরে গেলে স্টিমারে সিট পাওয়া যাবে না। কিংবা স্টিমার ছেড়ে দেবে এখনই।

মুজিব শাহাদৎকে আলিঙ্গন করেন। বলেন, 'ভালোভাবে যাও বাড়ি। আমি কদিন পরেই আসতেছি। আব্বার সঙ্গে দেখা করে বলো, আমি ভালো আছি।'

চলন্ত মানুষের ধাক্কায় কথা বলাই মুশকিল।

তাঁরা দুজন মানবস্রোতের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

স্টিমারের নাম নারায়ণগঞ্জ মেইল।

বড়সড় স্টিমার।

সেকেন্ড ক্লাসে একটা আসন ঠিকই জুটে যায় মুজিবের। পাঞ্জাবির ওপর একটা চাদর মুড়ি দিয়ে নেন তিনি। স্টিমার সাইরেন বাজাচ্ছে। এখনই বোধ হয় ছেড়ে দেবে। মুজিব চোখ বন্ধ করেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবে যান ঘুমের অতলে।

ঘুম ভাঙে যখন, তখন চারদিক ঝকঝক করছে আলোয় আলোয়।

অনেক পরিচিত মুখ দেখা যায়। এরা ঢাকা যাচ্ছে। মুজিব ভাইকে পেয়ে ঘিরে ধরে তারা। স্টিমারের খাবার ঘরের দিকে মুজিব এগিয়ে যান সদলবলে। চা খাওয়া দরকার।

নদীর ওপারে নারায়ণগঞ্জ।

স্টিমারটা ঘাটে ভেড়ার আগেই কুলিরা কী কায়দায় যে স্টিমারে উঠে যায়। কিছু বলার আগেই দুটো বাক্স ওদের মাথায় উঠে গেছে। স্টিমার থেকে জনস্রোতে গা ভাসিয়ে নেমে পড়ে সোজা প্ল্যাটফরমে। আবার ট্রেন। ওপারে রেল ছিল ব্রডগেজ। এপারে এসে হয়ে গেল মিটারগেজ।

দিনের আলোয় ট্রেনের জানালা দিয়ে তিনি দেখেন তাঁর পূর্ব বাংলা। যতবার তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে এসেছেন, ততবার তাঁর একই

অনুভূতি হয়েছে। পূর্ব বাংলা অনেক সবুজ, অনেক জলমগ্ন। চারদিকে জলা আর জংলা। সুন্দর করে বললে বলা যায়, যাকে বলে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। আর যতই তুমি পশ্চিমে যেতে থাকবে, আস্তে আস্তে সবকিছু হয়ে যেতে থাকবে ধূসর।

ট্রেন ধীরে ধীরে ফুলবাড়িয়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে থেমে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামছে। প্ল্যাটফরমের আলোকস্তম্ভে বাতি জ্বলছে।

ট্রেন পুরোপুরি থেমে যায়। 'কুলি কুলি' বলে রব তুলে লাল শার্ট পরা কুলিরা এসে মালপত্রে হাত লাগায়। শেখ মুজিবের সঙ্গে দুটো বড় বড় বাক্স। একটা বাক্সে শুধু বই। আরেকটায় তাঁর কাপড়চোপড় ইত্যাদি। কলকাতা থেকে তিনি কতগুলো গানের রেকর্ডও এনেছেন। তাঁদের গ্রামের বাড়িতে গ্রামোফোন আছে। গান শোনাটা তাঁর নেশা। রেনুও খুব গান পছন্দ করেন। রেনুর জন্য আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া দুটো রেকর্ড, কাজী নজরুল ইসলামের গান, রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে এসেছেন তিনি।

আর আছে মা, বাবা, ভাইবোনের জন্য ছোটখাটো উপহার। বাবার জন্য নিয়েছেন মহাভৃঙ্গরাজ তেল, মার জন্য ব্লাউজের কাপড়, বোনদের জন্য চুড়ি, ফিতা ইত্যাদি। রেনুর জন্য কিনে এনেছেন শাড়ি আর তাঁর আসন্ন সন্তানের জন্য একটা ছোট্ট মশারি।

কুলির সাহায্য নিতেই হলো।

ফুলবাড়িয়া স্টেশনে নেমে দেখেন গোপালগঞ্জের মোল্লা জালাল আর খন্দকার আবদুল হামিদ তাঁর জন্য স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকেন। কুলি মালপত্র গাড়িতে তুলে ফেলে ঝটপট। তাঁরা গাড়িতে ওঠেন।

গাড়ি চলছে কোর্ট-কাচারির দিকে।

সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে ঢাকাকে একটা প্রায় মফস্বল শহরের মতো লাগে। চলন্ত গাড়িতে বসে থাকায় মুখে ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগে।

মুজিব বলেন, 'এখানকার কী অবস্থা? কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা?'

হামিদ বলেন, 'না। এই দিক থেকে ঢাকা ঠিক আছে।'

মোল্লা বলেন, 'কলকাতার কী অবস্থা?'

মুজিব গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন, 'গান্ধীজি আর সোহরাওয়ার্দী সাহেব কলকাতাবাসীকে ঠিক করে ফেলেছেন। এবার আর গন্ডগোল করার সুযোগ দেন নাই। তো নতুন রাজধানী কেমন চলছে?'

রিকশার পেছনে জ্বলা লণ্ঠনের আলোগুলোর দিকে তাঁর দৃষ্টি।

হামিদ বলেন, 'আরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো কিছুই নাই। ইডেন কলেজে বসানো হয়েছে সেক্রেটারিয়েট। ঢাকা ইউনিভার্সিটির জগন্নাথ হলে অ্যাসেম্বলি, স্কুলে হাইকোর্ট।'

টমটমের হুডের রেলিং শক্ত করে ধরে মোল্লা বলেন, 'তবে পাকিস্তানে অপশন দিয়ে যে আইসিএস অফিসাররা এসেছে, তারা খুব আন্তরিকতার সাথে খাটছে। সবাই ঝাড়ু হাতে ঘর পরিষ্কার করছে। মাথায় রুমাল বেঁধে ইট সরাচ্ছে। দেখার মতো দৃশ্য।'

মুজিব বলেন, 'ওরা ভাবছেন, ওরা সব পেয়ে গেছেন।'

হামিদ বলেন, 'আর সবার খুব রাগ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম আর শরৎ বসুর ওপরে। ওরা কেন অখণ্ড বাংলা চেয়েছিলেন।'

মোল্লা বলেন, 'খাজা নাজিম উদ্দিন চিফ মিনিস্টার। প্রত্যেক সন্ধ্যায় নবাব পরিবারের মেম্বারদের নিয়ে দরবার বসান। পান-বাজনা হয়।'

মুজিব বলেন, 'সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজের ছেড়ে দেওয়া আসনে খাজাকে এমএলএ নির্বাচিত করে আনলেন তো, এই হচ্ছে তার প্রতিফল।'

টমটম ছুটে চলেছে। ঘোড়ার খুরের ঠকঠক আওয়াজ ওঠে পিচঢালা রাস্তায়। সন্ধ্যার ম্লান আলো শুষে নিয়ে রাত্রি জেঁকে বসছে। ভ্রাম্যমাণ রিকশার পেছনে লণ্ঠনের আলো সেই অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ় করে তুলছে। দোকানে দোকানে আলো আর লোবানকাঠি জ্বলে ওঠে।

তাঁরা কোর্ট-কাচারির পেছনে খাজে দেওয়ান লেনের মেসের সামনে থামেন।

শেখ মুজিব উঠে টাকা বের করে টমটমঅলার ভাড়া মিটিয়ে দেন।

২০.

যুব সম্মেলন হবে আবুল হাসনাতের বাড়িতে।

সম্মেলনের এই স্থান ঠিক করা হয়েছিল যে সভায়, সেটার কথা তাজউদ্দীনের খুব মনে পড়ে। ঘটনার শুরু একটা চিঠি থেকে।

কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে কামরুদ্দীন আহমদের কাছে।

কামরুদ্দীন আহমদের বয়স মধ্য তিরিশ, গোলগাল প্রসন্ন মুখশ্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ করে আইন পড়েছেন। মুন্সিগঞ্জের এই মানুষটা থাকেন পুরান ঢাকায়, দারুণ সক্রিয় রাজনীতিতে। '৪৭-এর আগে করতেন মুসলিম লীগের আবুল হাশিম গ্রুপ, যাদের বলা হতো বামপন্থী। আগে ছিলেন স্কুলশিক্ষক। এখন পুরোদস্তুর আইনজীবী কাম রাজনীতিবিদ। ২২ বছরের দিব্যকান্তি গোলগাল নাতিদীর্ঘ তরুণ তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। কামরুদ্দীন আহমদ কয়েক বছর আগে ১৫০ মোগলটুলীতে মুসলিম লীগের অফিস খুলেছেন, যাকে তাঁরা বলেন পার্টি হাউস। তিনতলা বাড়ির দোতলায় পার্টি হাউস। নিচতলায় কাগজের দোকান। এর আগে মুসলিম লীগের ঢাকার সব কাজকর্ম পরিচালিত হতো আহসান মঞ্জিল থেকে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ঢাকার প্রগতিশীলদের উদ্বুদ্ধ করেন মুসলিম লীগ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে। তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কামরুদ্দীন আহমদরা এই পার্টি হাউস খোলেন।

তাজউদ্দীন আহমদ ফুলটাইম কর্মী। আর পার্টটাইম কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন কুমিল্লার ছোটখাটো শুকনো এক যুবক, তাঁর নাম খন্দকার মোশতাক আহমদ।

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি আমগাছের ডালে বসে খুনসুটি করে। হঠাৎ ব্যাঙ্গমা কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলে,

> আলোকের পাশে পাশে থাকে অন্ধকার,
> তাজউদ্দীনের পাশে আছে খন্দকার ॥
> খন্দকার তাজউদ্দীন দুজনের দিকে,
> লক্ষ্য রাখতে হবে ঐতিহাসিকে ॥
> আজ তারা পাশাপাশি করছেন কাজ,
> খন্দকারের সহিত আমাদের তাজ ॥
> একদা তাজউদ্দীনে হত্যার অর্ডার
> ৩১ বছর পর দেবে খন্দকার ॥

'কলকাতা থেকে আসা চিঠিতে বলা হয়েছে'—কামরুদ্দীন সাহেব পায়চারি করেন আর বলেন, 'বামপন্থী যুবকদের নিয়ে একটা সংগঠন করতে। সে জন্য ঢাকায় একটা কনফারেন্স করতে বলছে।'

তাজউদ্দীন আহমদের কপালে ভাঁজ পড়ে।

তাঁরা আলোচনায় বসেছেন পার্টি হাউসেই। আরও দু-চারজন নিয়মিত বিশ্বস্ত কর্মী সেখানে উপস্থিত।

খুব সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কারণ, এখন বামপন্থীদের সমাবেশ করার চেষ্টা মানেই খাজা নাজিম উদ্দিনের গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।

কামরুদ্দীন বলেন, 'শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক পর্যন্ত এই গুন্ডাদের ভয়ে আলাদা বাসাও নিতে পারছেন না, ঘর থেকে বের হয়ে আইন ব্যবসাও করতে পারছেন না। অথচ উনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী আর লাহোর কনফারেন্সে পাকিস্তানের প্রস্তাবক।'

তাজউদ্দীন বলেন, 'হ্যাঁ, ফজলুল হক সাহেব যেদিন ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে আসেন, সেদিন তাঁকে গুন্ডারা কালো পতাকা দেখিয়েছে।'

কামরুদ্দীন বলেন, 'উনি যাতে বাসা ভাড়া করতে না পারেন, সেই জন্য নাজিম উদ্দিন নিয়ম করেছে, এখন প্রাদেশিক রাজধানীর জন্য বাড়ি দরকার, কোনো বাড়ি ভাড়া দিতে হলে সরকারের পারমিশন লাগবে। শেরেবাংলাকে বাড়িভাড়া দেওয়ার পারমিশন কেউ পাচ্ছে না।'

তাজউদ্দীন বলেন, 'স্যার সলিমুল্লাহর ভাগনে সাহেবে আলম ট্রাকে করে আদালত প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েছিল। কারণ কী? কারণ, ফজলুল হক সাহেব নাকি জিন্নাহ সাহেবকে খর-দজ্জাল বলেছিলেন।'

কামরুদ্দীন বলেন, 'শেরেবাংলার পক্ষে এটা বলা সম্ভব। কারণ, আমি একদিন শেরেবাংলার সাথে দেখা করতে বার লাইব্রেরিতে গেছি। উনি বললেন, "খর-দজ্জালের চেহারা কেমন হবে, তা তোমরা জানো! তার এক চোখ কানা, স্বর্গে এক পা আর মর্ত্যে এক পা থাকবে।" নাম বলেননি। কিন্তু আমরা বুঝলাম। জিন্নাহ তো একচোখো চশমা ব্যবহার করেন। তাঁর এক পা পশ্চিম পাকিস্তানে, এক পা পূর্ববঙ্গে।'

তাজউদ্দীন বললেন, 'ফজলুল হক তাঁর লাহোর প্রস্তাবে বলেছিলেন মুসলমানপ্রধান দেশ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা, "স্টেটস" বলেছিলেন, জিন্নাহ সেটাকে বানালেন প্রিন্টিং মিস্টেক, বানালেন একটা পাকিস্তান, আর ফজলুল হকও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হতে পারলেন না, সব মিলিয়ে জিন্নাহর ওপরে ফজলুল হকের রাগ তো থাকতেই পারে।'

'আরে শুধু রাগ,' কামরুদ্দীন বলেন, 'উনি কী করেন, জানো, একবার পকেট থেকে আট শ টাকা হারিয়ে গেল। উনি লিখে রাখলেন, জিন্নাহ

ফান্ড আট শ টাকা, রিকশাওয়ালা হাইকোর্টে যাবার ভাড়া চাইল বারো আনা, হাইকোর্টে পৌঁছে বলল, দিতে হবে এক টাকা, উনি দিলেন এক টাকা, আর বাড়ি ফিরে নোট রাখলেন, রিকশাভাড়া বারো আনা, জিন্নাহ ফান্ড চার আনা। আমি একদিন তাঁর নোটবই দেখে অবাক। আপনি জিন্নাহকে সারা দিন গালি দেন, আবার জিন্নাহ ফান্ডে টাকা দান করেন। উনি বললেন, "যে টাকা চুরি হয়, যে টাকা লোকে আমাকে ঠকিয়ে নেয়, সে সবই তো জিন্নাহ ফান্ডে যায়, নইলে যায় কোথায়। হা হা হা।" তাহলে আমরা কোথায় করতে পারি যুব সম্মেলন?'

একজন কর্মী বলেন, 'বার লাইব্রেরিতে।'

'আরে বললাম না, বার লাইব্রেরিতেও সাহেবে আলম গুন্ডা নিয়ে হামলা চালায়'—কামরুদ্দীন সাহেবের চোখেমুখে উদ্বেগ।

'তাহলে?'

কামরুদ্দীন বললেন, 'একমাত্র উপায়, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হাসনাতের বাসায় করা। হাসনাত খেপে আছেন মুখ্যমন্ত্রী খাজার ওপরে। কারণ, খাজা সাহেবে আলমকে এখন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান করতে চান।'

'সেটাই ভালো।' উপস্থিত সবাই এই প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন।

এইভাবে এই সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত হয়।

সম্মেলন আগামীকাল। আজ তাই পার্টি অফিসেই ব্যস্ত সময় কাটছে তাজউদ্দীনসহ ঢাকার অনেক যুবকর্মীর।

প্রতিনিধিরা আসছেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে, তাঁদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন তাঁরা। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বিরামহীনভাবে।

এরই মধ্যে এক মাথা বৃষ্টি নিয়ে হাজির হলেন শেখ মুজিব।

কলকাতা থেকে এসে এই প্রথম তাঁর পার্টি হাউসে আসা।

মুজিবকে দেখে সবাই হইহই করে ওঠে।

মুজিব সবার সঙ্গে হাত মেলান। প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকেন। কথা বলেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি লোকটার। তাজউদ্দীন খেয়াল করছেন। যাকে তিনি একবার দেখেছেন, তার নামই কি তাঁর মনে থাকে!

তাজউদ্দীনের দিকেও এগিয়ে আসেন মুজিব। 'কী খবর, তাজউদ্দীন, খাজা নাজিম উদ্দিনের আজাদ পাকিস্তান কেমন লাগছে?'

তাজউদ্দীন হাত বাড়িয়ে মুজিবের সঙ্গে করমর্দন করলেন। প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। উত্তর তাঁদের দুজনেরই জানা। উর্দুভাষী নাজিম উদ্দিন

পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, এটা তাঁদের পছন্দ নয়। নবাব পরিবারই দেশ শাসন করবে, এটাও না। আর পাকিস্তানিরা ব্রিটিশদের মতো বাংলাকে উপনিবেশ বানিয়ে তুলুক, সেটাই বা কে চায়। কিছু না বলে বরং তাজউদ্দীন মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুললেন। শেখ মুজিব বললেন, 'উজিরে আলার মর্জি। ভালোই আছ। হা হা হা।'

মুজিব কথা বলছেন। অফিসের সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল। মুজিব বললেন, আসার সময় লিডারের সাথে দেখা করে এসেছি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেছেন, "তুমি যাও। গ্রাউন্ড ঠিক করো। সময়মতোই এই পূর্ব বাংলায় আমি আসব"।'

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ আলোর ঝলকানি, একটু পর প্রচণ্ড গর্জন। আজ আর বাসায় ফেরা হবে না। পার্টি হাউসের মেঝেতেই শুয়ে পড়েন তাজউদ্দীন।

কিন্তু তাঁর ঘুম আসতে চাইছে না। নানা কথা মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন দশেকের মাথায় তিনি গিয়েছিলেন ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে। নতুন স্বাধীনতা পেয়ে লোকজন চেষ্টা করছে সবকিছু সুন্দর করে তুলতে। স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল, সুন্দর নিয়ম করা হয়েছে। টিকেট বা প্ল্যাটফরম টিকেট ছাড়া কেউ প্ল্যাটফরমে যেতে পারবে না। কিন্তু সমস্যা হলো, গাড়িভাড়া নিয়ে গাড়িঅলা আর যাত্রীদের মধ্যে বচসা চলছে। কলকাতা থেকে লোকজন আসছে, তাদের স্টেশন থেকে ঢাকার বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে দিতে গাড়িচালকেরা অনেক বেশি ভাড়া চাইছে। এর একটা প্রতিকার করতে হবে। একটা ট্রাক ভাড়া করতে হবে। কিন্তু এ কী!

আপার ক্লাসের প্রবেশপথের মেঝেতে একজন উলঙ্গ বৃদ্ধা পড়ে আছেন। মৃত্যুপথযাত্রী। কেউ তাঁর দিকে খেয়াল করছে না। তাজউদ্দীন মিটফোর্ড হাসপাতালে টেলিফোন করলেন। সাড়া পেলেন না। তিনি ছুটলেন হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা বললেন, 'আমাদের তো কিছু করার নাই।' লীগ অফিসে গিয়ে আবারও ফোন করলেন একজন সহকারী স্টেশনমাস্টারকে। তিনি আশ্বাস দিলেন ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তারপর তাজউদ্দীন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কলকাতা থেকে আসা কর্মকর্তাদের রেলওয়ে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থা করতে। একটা ট্রাক জোগাড় করলেন ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকা থেকে। ট্রাকের গায়ে সাঁটালেন মুসলিম

লীগের ব্যানার। ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন মেইল ট্রেনের জন্য। ট্রেন এলে নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাক আর চকবাজারে দুটো ট্রিপ দেওয়া হলো।

পরের দিন তাজউদ্দীন আবার গিয়ে দেখলেন, ওই বৃদ্ধা পড়েই আছেন মেঝেতে। তিনি গেলেন স্টেশনমাস্টারের খোঁজে। পাওয়া গেল সহকারী মাস্টারকে। সহকারী মাস্টার নোট দিলেন রেলওয়ে পুলিশ আর ডেপুটি মেডিকেল অফিসারকে। কেউ কর্ণপাত করলেন না। তিনি এবার ফোন করলেন ডিএমওকে। সহকারী স্টেশন ম্যানেজারের নোট নিয়ে তাঁর সতীর্থ শামসুদ্দিন দেখা করলেন ডিএমওর সঙ্গে। তিনি আবার যথাযথ কর্তৃপক্ষকে আরেকটা নোট দিলেন।

সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তাজউদ্দীন আর শামসুদ্দিন দৌড়াদৌড়ি করলেন বিভিন্ন অফিসারের কাছে, বিভিন্ন শাখায়। এর নামই আমলাতন্ত্র!

সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখা গেল মহিলা ওখানে নাই। প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই হয়তো প্রকৃতিই ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছে। জায়গাটা পরিষ্কার। আর পরিষ্কার ছিল সন্ধ্যার পরের আকাশ।

কিন্তু তাজউদ্দীনের মনের ভেতর থেকে ময়লা যায় না। ২২ বছরের যুবক, রাজনীতি করেন। 'কিন্তু মানুষের দুঃখ যদি দূর করতে না পারি, কিসের রাজনীতি?' তাজউদ্দীন ভাবেন।

আস্তে আস্তে পার্টি হাউসের মেঝেতে তাজউদ্দীন ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন আবুল হাশিমের বাড়িতে প্রতিনিধি সভা শুরু হয় দুপুরে। পার্টি হাউস থেকেই সবাই সরাসরি যান সম্মেলনে যোগ দিতে।

বাইরে তখন খাজা নাজিম উদ্দিনের সমর্থকেরা ট্রাকে করে শহরময় মিছিল করছে। স্লোগান দিচ্ছে এই যুব সম্মেলনের বিরুদ্ধে, 'ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার, সাবধান, পাকিস্তান ধ্বংসের চক্রান্ত বন্ধ করো, বন্ধ করো।' স্লোগানে স্লোগানে গুন্ডারা ঢাকার আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

প্রচণ্ড বৃষ্টি এসে তাদের সেই বিষোদ্‌গারকে ধুয়েমুছে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

২১.

টুঙ্গিপাড়ায় ফিরছেন শেখ মুজিব। নৌকায় চড়ে। ঢাকা থেকে প্রথমে লঞ্চ। লঞ্চঘাট থেকে নৌকা। এই হলো বাহন। বেশ সময় লেগে যায়। দিনে দিনে টুঙ্গিপাড়া পৌঁছানো যায় না। ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ যাতায়াত করতেই লাগে ৬০ ঘণ্টা।

এখন তাঁর নৌকা ভাসছে বাইগার নদীতে। মধুমতীর শাখা এই বাইগার তাঁকে মধুমতী থেকে নিয়ে যাচ্ছে টুঙ্গিপাড়ায়। হেমন্তকালের বিকেল। নদীর দুধারে সবুজ ধানখেত। ধানগাছে শিষ এসেছে। তবে পুষ্ট হয়নি শিষের ধান। বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে ধানখেতে। দূরে দূরে ঘরবাড়ি। গাছগাছড়ায় ছাওয়া সবুজে ঢাকা ঘরদোরগুলো। কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ। সুপারিগাছ আর বাঁশঝাড়ও চোখে পড়ে খুব। মাছরাঙা ঝাঁপিয়ে পড়ছে পানিতে, তারপর ঠোঁটে মাছ ধরে উড়াল দিচ্ছে আকাশে। পানকৌড়ি আর ডাহুকও দেখা যাচ্ছে কখনো কখনো। পানকৌড়ি ডুব দিচ্ছে, আবার জেগে উঠছে পানির ভেতর থেকে। দূরে আধো ডোবা ধানখেতে একটা সাদা বক।

চরাচরজুড়ে কাশবন। কাশফুলে সাদা হয়ে গেছে সব। এত নরম, এত শুভ্র, এত বিস্তারিত।

কতগুলো গরু সাঁতরে নদী পার হচ্ছে। তাদের পেছনে ভাসছে একটা রাখাল। রোজ সকালে গরু নিয়ে সাঁতরে নদী পার হয়ে চরে আসে এরা। সারা দিন গরু চরিয়ে আবার সাঁতরে নদী পার হয়ে ঘরে ফেরে গরু আর গরুর রাখাল।

নৌকার পাটাতনে বসে আছেন মুজিব। তাঁর চশমা পরা চোখ বাংলার অপূর্ব নিসর্গশোভা তৃষিতের মতো পান করে চলেছে। তাঁর পরনে পাঞ্জাবি আর পায়জামা। ২৭ বছরের পরিপূর্ণ যুবক বহুদিন পর বাড়ি ফিরছেন। মধ্যিখানে কিছুদিন রেনুই গিয়ে থেকে এসেছেন কলকাতায়।

কলকাতায় আর যাওয়া পড়বে না। এর মধ্যে রেজাল্ট হয়ে গেছে। বিএ পাস করেছেন তিনি। ঢাকা থেকে তাই মিষ্টি কিনে নিয়েছেন কয়েক

সের। শুকনো লাড্ডু নিয়েছেন, যাতে দেরি করে বাড়ি পৌঁছালেও নষ্ট না হয়।

বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে তাঁর মেসের ঠিকানায়। তাঁর একটা মেয়ে হয়েছে। মেয়ে হওয়ার খবর পেয়েই তিনি বাড়ির উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন।

ঢাকায় থাকলে কাজ থাকবেই। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়েছে। তার কমিটিতে তিনিও আছেন। মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ কেন্দ্রে আর প্রদেশে ক্ষমতায়। তারা এখনই নানা ধরনের অথর্বতা আর বাঙালিবিরোধিতার স্বাক্ষর রেখেছে যথেষ্ট পরিমাণে। তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে হবে। সে জন্য চাই সংগঠন। চাই কর্মসূচি। নেতৃত্বও দরকার। লিডার সোহরাওয়ার্দী খুব তাড়াতাড়ি আসছেন না। এ কে ফজলুল হক তো ঘর থেকেই বের হতে পারছেন না গুন্ডাদের অত্যাচারে। আরেকজন আছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সিলেটের রেফারেন্ডামের সময় তাঁর সঙ্গে সিলেটেই পরিচয়। মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা আছে তাঁর। এই সময়ের কর্তব্য কী, সেটা আগে স্থির করা দরকার। তো সেসব করতে গেলে ঢাকায় থাকতে হয়। কিন্তু এই কাজের কোনো শেষ নাই, বিরামও নাই। মেয়ের জন্মের খবর পেয়েই তাই শেখ মুজিব বেরিয়ে পড়েছেন টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশে।

লঞ্চে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এদের অনেককেই তিনি চেনেন। অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাদের খোঁজখবর করা—এই সব তাঁর মজ্জাগত অভ্যাস। আর এই যে পরিচিত হলেন, এদের আর আজীবন ভুলবেন না তিনি।

নৌকায় আরও জনা ছয়েক যাত্রী। টুঙ্গিপাড়ার যাত্রীদের সবাইকেই তিনি চেনেন। তরুণদের চেনেন না, কিন্তু তাদের বাবা-মাকে চেনেন। গল্প করতে করতেই যাচ্ছেন তিনি। 'কী রে হাশেম আলী, তোর কী খবর? তোর বড় চাচার যে পা ভেঙেছিল জামগাছ থেকে পড়ে, পা ঠিক হয়েছে? খোঁড়ায়া হাঁটে। আবদুল মজিদের কী খবর। তুই না মাদারীপুরে দোকান দিয়েছিলি। কিয়ের দোকান? মনোহারি? আছে দোকান?

'গোপালের কী খবর। ছেলেটার নাম যেন কী? নেপাল। খুব ভালো গানের গলা না?'

'মজিদ চাচা দেখি অনেক শুকিয়ে গেছেন। গালটা বসে গেছে। থুতনির ডগায় দাড়ি আগাছার মতো।' মুজিব নৌকার মাথার গলুইয়ে বসা বছর পঁয়তাল্লিশের একজনকে দেখে মনে মনে ভাবেন।

'চাচা, ও মজিদ চাচা, নীল রঙের পাঞ্জাবিটা তো ভালো পরেছেন।'

মজিদ হাসেন। বলেন, 'বাবা, তুমি এত দিন পরে আইলা। ভালো আছো তো, বাবা।'

'জি চাচা, আপনাদের দোয়া।' মুজিব একটু বাঁ দিকে সরে বসেন। সবাই ডান দিকে সরে আসায় নৌকার ডান পাশটা হেলে আছে।

মজিদ বলেন, 'বাবা মজিবর, তোমার লাইগা আমি প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে দোয়া করি। বাবা, তুমি জানো, তুমি আমার ছোট পোলাটার জান বাঁচাইছিলা। সেই যে গেরামে খুব আকাল পড়ল, বাবা, কারও ঘরে খাওয়া নাই। তুমি আমগো বাড়ি গেলা। গিয়া কইলা, "লাল মিয়া আছে নাকি।"

'লাল মিয়া তো তখন খিদায় আধমরা। আর অর ছোটটা ফুল মিয়া, সে মারা যায় যায়। কিছু খায় নাই। খালি "খিদে লেগেছে, খিদে লেগেছে" বইলে কান্দে। অর মা ওরে কলার থোর সেদ্ধ কইরে দিয়ে কয়, "খা।" তুমি বাবা, ফেরেশতার মতো এইসে পড়লে। বললে, "কী হয়েছে। ফুল মিয়া কান্দে কেন।" আমি কই, বাবা, ঘরে কিছু নাই। খাতি দিতি পারি না। তাই কান্দে।

'তুমি বললে কি, "চলো আমার সাথে। আমাদের গোলায় তো ধান চাউল আছে।" তুমি আমারে ডেইকে নিলে। "আসো আসো, চাউল দিমু।" শুনে আমগো বাড়ির আরও তিনজন তোমার পিছে পিছে দৌড় ধরল। বাবা, কী করব, কারও ঘরে তো খাবার নাই। তুমি গিয়ে গোলাঘর খুইলে আমগো চাউল দেওয়া শুরু করলে। আমি লুঙ্গির কোছা ভইরে চাউল নিলাম। অরা তিনজনও নিল। সেই সময় এলেন তোমার বাপে। কয়, "ও খোকা, কী করলে।" তুমি বললে, "লাল মিয়া, ফুল মিয়া না খায়া আছে, বাবা। অগো চাউল দেই।" তোমার বাপে হাসব না কানব বুঝতে পারে না। আমি কই, "ভাইজান, পোলায় ডাইকে এনে দিয়েছে। কইলে ফেরত দেই।" লুৎফর ভাই কয়, "ক্যান, ফিরত দিবা ক্যান। আমার পোলায় কি তোমগো ফেরত দেওনের লাইগা দিছে। শেখ বাড়িতে এয়েছ আশা নিয়া। নিরাশ হইয়ে ফিরত যাবা?" সেই দিন ওই চাউলটা না পাইলে ফুল মিয়া মইরেই যাইত, বাবা। তোমারে অনেক দোয়া করি। তোমার শত বছর পরমায়ু হোক।'

মুজিবের চোখ ছলছল করে ওঠে। আহা রে আমার বাংলার গরিব মানুষ! কত অল্পে খুশি! কত কম তাদের চাওয়া! খালি একটু মুখের অন্ন

পেলেই ওরা সুখী। এই সুখটাই তাদের কেউ দিতে পারল না!

রেনু ভালো আছে তো? মেয়েটা কেমন আছে? আহা রে! প্রথম বাচ্চাটা বাঁচল না। বেঁচে থাকলে আজকে বছর দেড়েক বয়স হতো। তিনি স্বামী হিসেবে, বাবা হিসেবে তো ভালো না। স্ত্রী-সন্তানের খোঁজখবর তো ঠিকভাবে নেন না।

যে কন্যাকে তিনি এখনো দেখেননি, তার জন্য তার বুকের ভেতরটা মাঝির বৈঠার আঘাত পাওয়া নদীর পানির মতো ছলাৎ ছলাৎ করে উঠছে। পড়ন্ত বিকেলবেলার রোদ শুয়ে আছে কেবল শিষ আসা ধানগাছগুলোর বুকের পরে, আকাশ ঘন নীল, মাঝেমধ্যে সাদা মেঘ, দিগন্তব্যাপী যেন মায়া আর মায়া।

তিনি অকারণে বিড়বিড় করতে থাকেন—

> গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
> দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।
> ভরা-পালে চলে যায়, কোনো দিকে নাহি চায়,
> ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু ধারে—
> দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

তিনি তাঁর সদ্যোজাত কন্যাটিকে দেখেননি। অথচ 'মনে হচ্ছে সে আমার কত দিনের চেনা।' কেন এমন হয়! নিজের মেয়ে বলে? নিজের অস্তিত্বেরই একটা উৎসারণ বলে।

নৌকা ঘাটে ভেড়ে। তাঁর বাক্স দুইটা বহন করার জন্য নৌকাযাত্রীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। তিনি মাঠ পেরিয়ে বাড়ির খোলায় ওঠেন। সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে। আলোর রং হলুদ। কাচারিঘরের টিনের চালটাকে হলুদ নদীর ঢেউ বলে মনে হচ্ছে।

সাদা গাভির পাশে একটা সাদা রঙের বাছুর। মা তার সন্তানের গা চাটছে পরম যত্নে। বাছুরটা গা এলিয়ে দিয়ে সেই আদর উপভোগ করছে।

মায়া, মায়া! এই জগৎটা মায়ার বন্ধনে জড়ানো।

তাকে ঘাট থেকে উঠে আসতে দেখে এরই মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে খবর রটে গেছে। বাচ্চাকাচ্চারা সব ছুটে ছুটে আসছে। বউঝিরাও মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, কেউ বলছে, 'মিয়া ভাই, মাইয়া খুব সুন্দর হইছে, যান, ঘরে যান।' কেউ বলছে, 'মজিবর, আইলা, একেবারে পাকিস্তান বানায়া তারপর আইলা!'

একজন বলে, 'মজিবর, বাবা, এত শুকায়েছ কেন!'

শেখ মুজিব নিজেদের বাড়ির উঠানে পা রাখেন। মা ছুটে আসছেন রান্নাঘর থেকে। 'কেমন আছো, বাবা?'

'ভালো আছি, মা, তোমাদের দোয়ায়। তোমরা কেমন আছো?'

মা আসেন। ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন। মায়ের গায়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ। মনে হয়, আলোয়ার গন্ধ।

'বাবা কই, মা? গোপালগঞ্জে?'

'হ্যাঁ, বাবা। গোপালগঞ্জ। যাও, বাবা, ঘরে যাও। বউমা তোমার মাইয়ারে খাওয়ায়।'

মুজিব নিজের ঘরে যান। পাকা ঘর। সুন্দর নকশা করা দেয়াল, স্তম্ভ। ছোট্ট কিন্তু সুন্দর।

বারান্দায় উঠে তিনি আওয়াজ দেন, 'রেনু, আমি এসে গেছি।'

রেনু বলেন, 'আসো।'

বাইরের আলোকিত প্রাঙ্গণ থেকে ঘরে ঢুকে প্রথমে তাঁর মনে হয় ভেতরটা বেশ অন্ধকার। তারপর তাঁর চোখ ধাতস্থ হলে তিনি দেখতে পান, বিছানায় রেনু অর্ধশায়িত। তাঁর কোলে ফুটফুটে একটা বাচ্চা।

মা বারান্দা থেকে বললেন, 'নাতনি আমার মাশাল্লাহ সুন্দর হইছে। সেই জন্য তোর বাবা তার নাম রাখছে হাসিনা। হাসিনা মানে সুন্দর।'

মুজিব বাচ্চাটাকে অনভ্যস্ত হাতে কোলে তুলে নেন। তাঁর বুকের কাছে ধরে বাচ্চার চোখের দিকে তাকান। তাঁর বুকটা ভরে ওঠে।

২২.

রেনু বাচ্চা নিয়ে রোদে আসেন। রোজ সকালবেলা উঠানে মাদুর পেতে হাসুর ছোট্ট শরীরে রোদ লাগান, হাতে-পায়ে সরষের তেল মাখিয়ে দেন দাদি। রেনু পাশে বসে তাঁকে সাহায্য করেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন মুজিব।

ছেলে এসেছে। নতুন ধান কাটার নির্দেশ দিয়েছেন লুৎফর রহমান।

উত্তরের ভিটায় একটা খেতে আগাম ধান ওঠে। তার বিছনই ওই রকম।

ধান কেটে মাড়াই করে আটা কোটা হবে। তারপর বানানো হবে পিঠা। নারকেলগাছে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শামসু গাছিকে। লুৎফর রহমান সেসবের তদারক করছেন।

সায়রা বেগম বলেন, 'বউমা, আজকে পোলাও রান্ধি, কী কও?'

রেনু বলেন, 'আপনি যেটা ভালো মনে করেন, মা।'

সায়রা বেগম বাচ্চাটার হাত-পা একখানে করে একটু শরীরচর্চা মতো করেন। মুখে বলেন, 'তাইলে তো মোরগ ধরা লাগে। জয়নাল কই, জয়নাল।'

জয়নাল তাঁদের গৃহপরিচারকের নাম।

লুৎফর রহমান সাহেব আসেন। জয়নাল তাঁর পেছনে পেছনে। জয়নালের দুহাতে অনেক নারকেল।

লুৎফর রহমান বলেন, 'আরে, গাছের কেউ যত্ন-আত্তি করে নাকি? ঠিকমতো গাছ পরিষ্কার না করলে নারিকেল হয়? জয়নাল মিয়া কোনো কামের না।'

মুজিব হাসেন।

বাবা বলেন, 'খোকা, বিএ তো পাস করলা? এইবার কী করবা?'

মুজিব বলেন, 'ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব, বাবা।'

'ভালো। বিএ-তে সাবজেক্ট কী নিছিলা?'

'হিস্ট্রি আর পলিটিক্যাল সায়েন্স।'

'ভালো। এইবার ল ন্যাও। আমার বড় শখ, বাবা, তোমারে অ্যাডভোকেট বানাব। বোঝো তো, আদালতে সেরেস্তাদারি করি। দেখি তো। উকিলদেরই সম্মান। আর তুমি তো পলিটিক্সও করবাই। উকিল হইলে পলিটিক্স করা যায় ভালো। তোমার নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেব, শেরেবাংলা, কায়েদে আজম—সবাই তো উকিল-ব্যারিস্টার। তাই না?'

'জি, বাবা।'

'তুমি ওকালতি পড়তে পারো না?'

'আপনি যখন, বাবা, শখ করছেন, নিশ্চয়ই আমি চেষ্টা করব। ঢাকায় গিয়া এবার আমি ল-তেই ভর্তি হব।'

এরই মধ্যে বাড়িতে ভিড় জমতে থাকে। মুজিবের শৈশবের বন্ধুরা খবর পেয়ে গেছেন। তাঁরা আসছেন। মুসলিম লীগের মাঠপর্যায়ের কর্মীরাও আসছেন দল বেঁধে। আর আছে সাহায্যপ্রার্থীদের দল। তারা

জানে, মজিবরের কাছে চাইলে না শুনতে হবে না।

জয়নাল লেগে পড়ে মোরগ ধরতে। পাড়ার আর ছেলেমেয়েরা তাকে সহায়তা করে। মোরগটার অবস্থান আঙিনাতেই। চারপাশ থেকে সবাই মোরগটাকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করে। তারপর বৃত্তটা ছোট করে আনতে থাকে।

কাচারিঘরে দর্শনার্থীদের ভিড়ে বসে নতুন দিনের কর্তব্য সম্পর্কে কথা বলতে বলতে মুজিব শুনতে পান মোরগের কক কক আওয়াজ। সবাই হুল্লোড়ও করে উঠছে। মোরগটা ধরা পড়েছে।

রাতের বেলা মুজিবের সঙ্গে দুটো কথা বলার সুযোগ পান রেনু। ঘরের এক কোণে একটা আলমারি। আর একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলের ওপরে রাখা লণ্ঠন। কেরোসিনের গন্ধ আর আলো ছড়াচ্ছে বাতিটা।

বিছানায় বসে মেয়ের কাঁথা বদলাতে বদলাতে রেনু বলেন, 'তুমি এবার একটু বেশি দিনের জন্য থাকতে পারো না, হাসুর আব্বা!'

মুজিব হাসেন। 'ও গো, হ্যাঁ গো, তার আগে দুলা। এখন থেকে হাসুর আব্বা! আচ্ছা, তাহলে এবার আমিও তোমাকে আর রেনু না বলে বলব হাসুর মা।'

'আমার প্রশ্নের জবাব তো পেলাম না!'

'কোন প্রশ্ন। এবার বেশি দিন থাকা! না গো। ঢাকায় অনেক কাজ!'

'এত দিন দেশ পরাধীন ছিল। এত দিন না হয় কাজ ছিল। তুমি কলকাতায় ছিলা। সেইখানে তোমার লিডার ছিলেন। কিন্তু ঢাকায় কী?'

'এই স্বাধীনতা তো স্বাধীনতা না, হাসুর মা। আমার আসল লক্ষ্য স্বাধীন পূর্ব বাংলা। লিডাররে কলিকাতা থেকে ঢাকায় নিয়া আসব। উনি আসবেনও কিছুদিনের মধ্যে। শান্তিমিশন নিয়া। এর মধ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে পার্টি গড়তে হবে।'

'আবার জেলে যাবা না তো?'

'যেতে হলে যাব। আমি তোমাকে বলছি না, যে মৃত্যুরে, জেল-জুলুমরে ভয় পায় না, তাকে কেউ দাবায়া রাখতে পারে না।'

'তোমার কিন্তু এখন একটা মেয়ে আছে।'

'আমার মেয়ের একটা মা-ও আছে।'

'খালি মিষ্টি মিষ্টি কথা।'

'দাঁড়াও। পড়াশুনাটা শেষ করে নেই। তারপর ঢাকায় বাসা নিয়া

তোমাকে নিয়া যাব। এরপর আর তোমাকে গ্রামে থাকতে হবে না।'

'গ্রামে থাকতে আমার কোনোই আপত্তি নাই। বাবা আছেন। মা আছেন। তাঁরা আমাকে খুব যত্ন কইরেই থুয়েছেন। তোমারে লাগবে না। আর তা ছাড়া আমি বাবা-মা মরা মেয়ে। মা আমারে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছেন। উনিই আমার মা। উনিই আমার বাবা।'

'বিয়া হয়ে গেলে নিজের মেয়েও তো ঘরে থাকে না। থাকে?'

'আচ্ছা। যুক্তি মানলাম। তুমি বললে যাব। তুমি তো রাজনীতি করবা। গ্রেপ্তার হবা। তখন আমার কী হবে?'

'তুমি চাও না আমি রাজনীতি করি? তাইলে কি আমি লক্ষ্মী ছেলের মতো ল পড়া শেষ করে কালো কোট পরে ওকালতি করব। তাইলে তুমি সুখী হবা?'

'না। একটু আগে না তুমি বললা দেশ এখনো স্বাধীন হয় নাই। তোমার আসল লক্ষ্য পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা। তুমি দেশের কাজ করতে নামছ। দেশের কাজই করবা। আমার কথা ভেবে তোমারে ওকালতি করা লাগবে না।'

'আমি জানতাম, তুমি এই রকমই বলবা। কিন্তু তুমি কী বুঝতেছ। বলো তো।'

'বাবা রেডিওর ব্যাটারি কিনা এনেছেন। উনি যখন বাড়িতে আসেন, খবর শুনেন। আমরাও শুনি। খবর তো আগেও শুনেছি, তাই না? কিন্তু আজকাল রেডিও পাকিস্তানের খবর শুনে তো কিছুই বুঝি না। উজিরে আলা ফরমাইয়াছেন। মানে কী। বাবা বলেন, এর মানে হলো প্রধানমন্ত্রী হুকুম করেছেন। সদরে রিয়াসাত মানে কী? বলেন, দেশের প্রধান। সংবাদরে বলেন এলান। ছবিরে বলে তসবির। আমি আর কইতে পারছি না গো। তুমি বাবারে জিগাও। শুনলে হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে যাবানে।'

'তুমি ঠিকই ধরেছ। খাজারা কোনো ঘোষণা না দিয়াই চুপে চুপে উর্দু ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। খামে, পোস্টকার্ডে সব জায়গায় উর্দু আর ইংরাজি। পুরা পাকিস্তানের জনসংখ্যার মধ্যে বাঙালিরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। বাংলা হবে সরকারি ভাষা। কিন্তু অরা উর্দু চাপায়া দিতে চায়। ঢাকায় এই নিয়া ছাত্ররা অসন্তুষ্ট। এই নিয়া আন্দোলন শুরু করা দরকার। মওলানা ভাসানী আছেন সন্তোষে। আবুল কাশেম ফজলুল হক বাইর হইতে পারতেছেন না খাজা নাজিম উদ্দিনের গুন্ডাদের ভয়ে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব খোঁজ পাঠাইছেন ঢাকায় আসা যাবে কি না। ফলে ছাত্রদেরই দায়িত্ব নিতে হবে।'

'তুমি এমএটা শেষ কইরো।'

'সে আমি জেলখানায় গিয়াও শেষ করতে পারব। তুমি চিন্তা কইরো না। রাজনীতিকদের জন্য জেলখানাই পড়াশোনা করার আসল জায়গা। আসল পাঠশালা।'

'তোমার একটা মেয়ে হয়েছে। এইটা যেন খেয়াল থাকে।'

'আমার একটা বউ আছে। সে কি বুঝবে না যে স্বামী দেশের কাজ করে?'

'বুঝবে।'

রাত বাড়ে। দূরে কাশবনে শিয়াল হুক্কাহুয়া বলে ডাকে। পাল্লা দিয়ে ডেকে ওঠে গৃহস্থবাড়ির কুকুরের দল। তারা হঠাৎ থেমে গেলে চারদিক নিস্তব্ধ বলে মনে হয়। শুধু কানে আসে ঝিঁঝির একটানা ডাক।

ঘুমের জাদুকরি স্পর্শ এসে মুদে দেয় সব কটা চোখ।

টুঙ্গিপাড়ার শেখবাড়ির আঙিনায়, খুলিতে, খালে, বাইগার নদীতে, কাশবনে, চরে, ঘুমন্ত ধানখেতে জোছনা পড়ে থাকে বালিতে শুকোতে দেওয়া চাদরের মতো।

২৩.

অগ্রহায়ণ মাস শেষ হয়ে আসছে। শীত পড়ছে। তাজউদ্দীনের শরীরটা ভালো নয়। প্রচণ্ড কাশি। সারা দিন নিমতলীর মুসলমান ছাত্রদের মেসে নিজের বিছানায় শুয়ে রইলেন তাজউদ্দীন। দেয়ালে শেওলা পড়েছে। সেই শেওলার দিকে তাকিয়ে থাকলে নানা কিছুর আকার কল্পনা করে নেওয়া যায়। একটা ভেড়ার মুখ যেন দেখা গেল ওই ওখানটায়। সে দিকে তাকিয়ে থেকে সাত-পাঁচ ভাবছেন তাজউদ্দীন।

১৫০ মোগলটুলীর পার্টি অফিসে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে একটা শুকনো পটকা তরুণকে প্রথম দেখাতেই কেন যেন অপছন্দ হয় তাজউদ্দীনের। কোনো বিশেষ কারণ নাই। কুমিল্লা থেকে এসেছেন তিনি। '৪৬-এর নির্বাচনের সময় কুমিল্লা অঞ্চলের পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্যও

ছিলেন। মানে মুসলিম লীগ থেকে কারা নির্বাচনে অংশ নেবেন, সেটা ঠিক করবার দায়িত্ব কমিটির অন্যদের সঙ্গে তার ওপরও পড়েছিল। তরুণটির নাম খন্দকার মোশতাক আহমদ। তাঁকে অপছন্দ হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?

তাজউদ্দীন ভাবেন। প্রথম দেখাতে তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন?' মোশতাক জবাব দিয়েছিলেন, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম, আল্লাহ মুসলমানদের সব সময় ভালো রাখেন। আলহামদুলিল্লাহ।' তাজউদ্দীনের জবাবটা কেন যেন পছন্দ হলো না। তাজউদ্দীন নিজে কোরআনের হাফেজ, এখনো দরদরিয়া গ্রামে গেলে মসজিদে ইমামতি করেন, কিন্তু আল্লাহ শুধু মুসলমানদের ভালো রাখবেন, অন্যদের ভালো রাখবেন না, আর আল্লাহ মুসলমানদের সব সময় ভালোই রাখবেন, খারাপ রাখবেন না, এটা একটু বেশি সরলীকরণ হয়ে যায় না? আল্লাহ তো সবারই প্রভু। সর্বজনীন ও শাশ্বত। তবু তাজউদ্দীন ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবিত হতেন না, যদি না দেখতেন, পরক্ষণেই যখন কামরুদ্দীন আহমদ জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে খন্দকার, কেমন আছেন?' তখন তিনি জবাব দিলেন, 'আপনার দোয়া, কামরুদ্দীন সাহেব। আপনি আমার ওপরে সব সময় দোয়া রাখবেন। তাহলেই আমি ভালো থাকব।'

কামরুদ্দীন সাহেবও খেয়াল করেছিলেন কথা বলার ধরনটা। পরে তিনি বললেন, 'তাজউদ্দীন, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। এই ছেলে বহুদূর যাবে। মোসাহেবির একটা খুব বড় প্রতিভা নিয়া সে কুমিল্লা থেকে ঢাকা শহরে পা রেখেছে।'

সত্যি সে তরতরিয়েই এগোচ্ছে। কলকাতা থেকে মুসলিম লীগের আবুল হাশিমপন্থী তথা প্রগতিশীল যেসব ছাত্র আসছে, তাদের জন্য একটা ওয়ার্কার্স ক্যাম্প খোলা হয়েছে। টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাহেব আছেন তাতে, উনি আপাতত নেতৃত্বে বেশ এগিয়ে। আছেন শেখ মুজিব, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আছেন এই খন্দকার মোশতাকও। এই লোক এই গ্রুপে না থেকে যদি থাকত প্রতিক্রিয়াশীল, খাজার তল্পিবাহক শাহ আজিজের সঙ্গে, তাহলেই যেন তাকে মানাত। বয়সে তিনি মুজিব ভাইয়ের চেয়েও বড়।

শাহ আজিজ সম্পর্কে আবুল হাশিম সাহেব সেবার ভালো বলেছিলেন। আবুল হাশিমকে তাজউদ্দীনের সব সময় মনে হয় একজন অন্ধ হোমারের মতো, যাঁর নিজের চোখের জ্যোতি কমে আসছে, অথচ যে কিনা আলো দেখাচ্ছেন বেপথু মুসলিম বাঙালিকে।

বিভাগ-পূর্বকালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল

হাশিম কাছে থেকে দেখেছেন শাহ আজিজকে। কারণ, শাহ আজিজ কলকাতায় আশ্রয় গেড়েছিল। হাশিম বলেছিলেন, 'শাহ আজিজ আড়ালে আমাকে গালি দেয় কমিউনিস্ট বলে, আর সামনাসামনি দেখা হলে বলে, "হাশিম ভাই, আমি আপনার আদর্শের অনুসারী।" একই অবস্থা খুলনার আবদুস সবুর খানের। তিনি আসলে খাজা নাজিম উদ্দিনের তল্পিবাহক, আর আমাকে মনে করে সন্ত্রাসবাদীদের পৃষ্ঠপোষক ও ঘোরতর কমিউনিস্ট। খাজা নাজিম উদ্দিনেরও তা-ই ধারণা। শাহ আজিজকে প্রথম দেখি ঢাকায় ডা. ময়েজউদ্দীনের বাড়িতে। তখন তাঁর বাবরি চুল। তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। মনে হলো, এর ওপরে আস্থা রাখা যায় না।'

মুজিব ভাই দুই চোখে দেখতে পারেন না শাহ আজিজকে। কুষ্টিয়ার সম্মেলনে শাহ আজিজের মুখে ঘুষি মেরেছিলেন। সেদিন বললেন, কলকাতার দাঙ্গায় শাহ আজিজেরা খুবই খারাপ ভূমিকা পালন করেছে। খাজা ঘোষণা দিয়েছিল, এই অ্যাকশন হিন্দু আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, সেই কথাটা শাহ আজিজেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আর আবুল হাশিম সাহেব বলেছিলেন, এই আন্দোলন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, জিন্নাহ সাহেব পর্যন্ত বলেছেন, শান্তি রক্ষা করা হবে, সোহরাওয়ার্দী নিজের প্রাণ বিপন্ন করে দুর্গত হিন্দু এলাকায় গিয়েছিলেন।

তাজউদ্দীন শেখ মুজিবের এই কথার পিঠে বলেছিলেন, 'এমনিতে খাজা কিন্তু খুবই ভিতু। নবাবগাঁওয়ে দেখেছিলাম না, এমারত পার্টির পক্ষে যখন হাজার হাজার মানুষ রামদা আর বল্লম নিয়ে রেলস্টেশন ঘেরাও করল, খাজা থরথর করে কাঁপছিলেন। একমাত্র সোহরাওয়ার্দী সাহেব ওদের দিকে চোখ রেখে নির্ভীক চিত্তে সোজা হেঁটে গেছেন।'

একটা টিকটিকি দেয়ালে নড়াচড়া করছে। মাকড়সার জালে একটা পোকা আটকে আছে। তাজউদ্দীন সেই দিকে তাকান। টিকটিকি কি ওই পোকাটাকে খেয়ে নেবে? মাকড়সা কষ্ট করে জাল পাতল, আর শিকারটাকে ভোগ করবে টিকটিকি? ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাশে।

তাজউদ্দীন পাশ ফিরে শোন।

আবার তাঁর মনের মধ্যে নানা ভাবনা ঘুরপাক খায়।

মুসলিম লীগ প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনে পরিণত হয়ে আছে। সরকার হয়ে পড়েছে আমলানির্ভর। দুই অংশে দুই সাবেক আইসিএস অফিসার দেশ চালাচ্ছে। জিন্নাহ তাঁর পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথম বক্তৃতায়

বলেছিলেন, পাকিস্তান কোনো ইসলামিক দেশ হবে না, হবে ইসলামি সাম্যের আদর্শভিত্তিক দেশ, এখানে মুসলিম হিন্দু খ্রিষ্টান ইত্যাদি পরিচয় বড় নয়, বড় পরিচয় হবে পাকিস্তানি।

জিন্নাহর পক্ষেই এই রকম বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব। পোশাকে-আশাকে পুরোপুরি সাহেব। কংগ্রেসই করতেন। লোকে তাঁকে কোনো দিন নামাজ পড়তে দেখেনি। মদ্যপান করেন নিয়মিত। তাঁর মতো কেতাদুরস্ত মানুষ কমই আছে। তিনি হিন্দি বলতে পারেন না, উর্দু বলতে পারেন না। পাকিস্তান তাঁর বাড়ি নয়। জন্ম বোম্বেতে, কেউ বা বলে করাচিতে। তাঁর বাবা ছিলেন গুজরাটি ব্যবসায়ী আর দাদা ছিলেন হিন্দু রাজপুত। করাচি খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলে পড়ে বোম্বের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক করেন। লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়েন, এশিয়ার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে ১৯ বছরের মধ্যেই ইংল্যান্ডের বারে যোগ দেন। বোম্বেতে তাঁর প্র্যাকটিস ছিল খুবই ভালো, ব্যারিস্টারি করে তিনি খুবই নাম করেছিলেন। এই রকম একটা আধুনিক লোক যখন দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচার করেন এবং একটামাত্র টাইপরাইটার নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন বলে দাবি করেন, তখন বুঝতে হবে তাঁর মধ্যে গন্ডগোল আছে। সেটা আর কিছু না, তাঁর শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা, উপনিবেশিক শিক্ষার কুফল।

এই স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়। আজউদ্দীন আবার বলেন। বিছানা থেকে তিনি উঠে বসেন। উঠে গিয়ে রান্নাঘরে পিপে থেকে গেলাসে পানি ঢালেন। পানি খান।

কী করা উচিত তাঁদের এখন?

'৪৭-এর ১৫ আগস্টের আগেই তাঁরা গণ-আজাদি লীগের পক্ষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছেন। এই দাবি আজকের নয়। ১৭৭৮ সালে ব্রিটিশ লেখক নাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড *অ্যা গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ* লিখেছিলেন। তখন উপমহাদেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। হলহেড সাহেব তাঁর ব্যাকরণ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, ফারসির বদলে বাংলাকে রাজভাষা করা হলে কোম্পানি সরকারের সুবিধা হবে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে শান্তিনিকেতনে এক আলোচনা সভায় হিন্দুস্তানের লিংগুয়া ফ্রাংকা হিন্দিই হওয়া উচিত বলে মত উঠলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর বিপরীতে বাংলাকে লিংগুয়া ফ্রাংকা করার পক্ষে তাঁর মত তুলে ধরেছিলেন। তাঁর পরপরই সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ সরকারকে চিঠি লিখে জানান, ভারতের অন্য অংশে যা-ই করা হোক না

কেন, বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হওয়া উচিত। আর গত ১০ বছরে দৈনিক *আজাদ*সহ বিভিন্ন পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এটা বাঙালিদের আলোচনা ও বিবেচনার মধ্যে আছে যে বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলাকেই করতে হবে। এখন মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন লোকেরা কেন সেটা ভুলে যাওয়ার ভান করছেন, তাজউদ্দীনের বোধগম্য হচ্ছে না।

ঢাকায় বুদ্ধিজীবীরা তমদ্দুন মজলিস গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপক আবুল কাসেম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ আছেন এই দলে। তাঁরা বাংলার পক্ষে লিফলেট বের করেছেন। তাঁদের ঘোষণাপত্র সমাবেশের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। অধ্যাপক আবুল কাসেম, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদের মতো অধ্যাপক-সাংবাদিকেরা এতে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। কাজী মোতাহার হোসেন বলেই দিয়েছেন, 'বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের উপরে রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা করা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশি দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হওয়ার আশংকা রয়েছে।'

এই সব কাণ্ড যখন ঘটছে, তাজউদ্দীন তখন দরদরিয়ায়। তবে তিনি সব খবরই পান। সাইকেল নিয়ে একবার পার্টি অফিস, একবার কামরুদ্দীন সাহেবের বাসা, সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো আর সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা তাঁর স্বভাব।

এর মধ্যে এঁরা শতাধিক বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে এসেছেন। এঁরা এখন গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। এই স্বাক্ষর মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হবে। তারপর আজ থেকে দিন চারেক পর এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা আহ্বান করেছেন। এতে যোগ দিতে হবে।

মুজিব ভাই গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছেন সম্প্রতি। তাঁর সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়। তিনি বলেন, 'তাজউদ্দীন, আমি হলাম আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ফলোয়ার। উনি হলেন অ্যাকশনের মানুষ। আমিও অ্যাকশনে বিশ্বাস করি। থিয়োরি দিয়ে জগৎ চলে না। ধরো, মার্ক্সবাদীরা, তারা কিন্তু জানে বলশেভিক পার্টির সদস্যসংখ্যা কত, কিন্তু জানে না, পদ্মা নদী এপার-ওপার করতে কী লাগে! আবুল হাশিম সাহেব একটা পাঠচক্র খুলেছিলেন। তাতে তিনি নানা কিছু পড়াতেন। কলকাতায়

থাকতে আমিও যেতাম। রাতের বেলা ক্লাস হতো। সবাই লেকচার শুনত। আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম থেকে উঠে ফেরার সময় জিজ্ঞাসা করতাম, আগামীকাল সকালে কী করতে হবে, সেইটা বলেন। যা বলেছেন, তা-ই করেছি। কত বড় বড় গুন্ডাপান্ডা একা সামলেছি। আবুল হাশিম সাহেবকে তো একদিন মেরেই ফেলেছিল খাজাদের গুন্ডারা, আমি একলা গিয়া তাদের সামনে দাঁড়ায়েছি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাকে বললেন, "ফরিদপুর গোপালগঞ্জে খাজাপন্থীদের তিনজন বড় চামুণ্ডা আছে, ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া, সালাম খান আর ওয়াহিদুজ্জামান। তুমি ওইখানে আমাদের বামপন্থী লিডারশিপ প্রতিষ্ঠা করো। তোমার কাজটাই সবচেয়ে শক্ত। আমি একা। ওরা সব রামদা-সড়কি-বল্লম নিয়া প্রস্তুত। আমার এক হুংকারে সব সোজা। তোমার নীতি যদি ঠিক থাকে, আদর্শ যদি সৎ হয়, সাহস নিয়া দাঁড়াবা। কেউ তোমার সাথে পারবে না"।'

এইখানে এসেও তিনি শুধু অ্যাকশন খুঁজছেন। ভাষার প্রশ্নে অ্যাকশনের সূত্র তিনি বোধ হয় পেয়েই গেলেন। এবার তিনি নামবেন।

কিন্তু আমি কী করব? তাজউদ্দীন ভাবেন। তিনি ছাত্রলীগ করেন না। সরাসরি মুসলিম লীগ করেন। যদিও বয়স এখন কেবল ২২। সামনের বছর ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবেন। তবে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে নয়, প্রাইভেটে। এখনো তাঁর প্রিয় হবি সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। মাঝেমধ্যে বেরিয়ে পড়েন সাইকেল নিয়ে। নতুন ঢাকার দিকে যান। রমনার বিস্তৃত সবুজের মধ্যে সাইকেল চালাতে তাঁর কী যে আরাম লাগে। একেক দিন চলে যান মগবাজারের দিকে। পুরোটাই জঙ্গল। তারপর আবার তাঁদের পরিচিত ঢাকা শহর। এক লাখ লোকের এই শহর। ছয় বর্গকিলোমিটার জায়গা নিয়ে। আরেকটু বিস্তৃত করে যদি শহরটার আয়তন বাড়িয়ে নেওয়া যায়, বড়জোর তিন লাখ মানুষ হবে শহর আর শহরতলি মিলে। ইসলামপুর, মৌলভীবাজার, নাজির লাইব্রেরি থেকে ইডেন কলেজ কাম সচিবালয়, রেসকোর্স, নীলক্ষেত, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, হেয়ার রোড, মিন্টো রোড, ময়মনসিংহ রোড, তেজগাঁও—এই সব নতুন ঢাকায়।

একদিন রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় দেখলেন। সাত বছর হলো ঢাকায় এসেছেন। এই প্রথম ঘোড়দৌড় দেখলেন। তারুণ্যের উষ্ণতা তাঁর ভেতরে। আবার প্রৌঢ়ের চিন্তাশীলতা। তাঁদের গ্রুপে আছেন কামরুদ্দীন সাহেব, অলি আহাদ সাহেব, তোয়াহা সাহেব। তাঁরা মুসলিম লীগের

চেয়েও একটা অগ্রসর দল গড়ে তুলতে চান। সেটার কতদূর কী হবে? একদিন তাঁরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে পূর্ববঙ্গে আনতে হবে। নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব কিছুদিন আগে এসেছিলেন ঢাকায়, শান্তিমিশনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। খাজা নাজিম উদ্দিনও তাতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু খাজাদের মুখ ছিল বড় শুকনো। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, সোহরাওয়ার্দী এই দেশে এলে তাঁদের নেতৃত্ব চলে যাবে। গান্ধীজির সঙ্গে শান্তিমিশনে সারা ভারত ঘুরেছেন সোহরাওয়ার্দী। করাচিও গিয়েছিলেন। তাঁর হারানো মর্যাদা তিনি বহুলাংশেই পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন।

রাত নেমে এসেছে নিমতলীতে। মেসের ছেলে রঞ্জু হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। বাইরে থেকে রিকশার টুংটাং আওয়াজ, ঘোড়ার হ্রেষার শব্দ আসছে।

নাহ্। খিদে পাচ্ছে। রান্নাঘরে রঞ্জু ভাত তুলে দিয়েছে চুলায়। ভাত সেদ্ধ হচ্ছে, গরম ভাতের গন্ধ আসছে এই ঘরে। তারপর আসে তরকারির ঝাল গন্ধ।

এই সর্দিকাশি জ্বর জ্বর ভাব নিয়ে ভাত খাওয়া কি উচিত হবে? তবু ভাতই খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তিনি।

'রঞ্জু রঞ্জু।' তাজউদ্দীন হাঁক পাড়েন। সর্দিধরা গলাটা নিজের কাছেই অচেনা লাগছে। কাশি শুরু হয়। রঞ্জু কাছেই ছিল বোধ হয়। চলে আসে। তাজউদ্দীন বলেন, 'ভাত দাও।'

নিজের চকির ওপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে তিনি ভাত খেতে বসেন।

২৪.

রেনুর কাছ থেকে বিদায় নেন মুজিব। দুই মাস বয়সী কন্যা হাসিনার কপালে চুমু দেন। বলেন, 'আসি মা। ভালো থাকিয়ো। অনেক বড় হও।' বাচ্চা হাই তোলে।

রান্নাঘরের দরজায় মুজিব মাকে জড়িয়ে ধরেন।

হাসুকে কোলে নিয়ে রেনু বারান্দায় দাঁড়ান। বারান্দার ছাদে কবুতরগুলো বাকবাকুম রবে ডাকছে। সকালবেলাটায় আজ বড় কুয়াশা। রেনুর মনটা খারাপ বলেই কি? তবু তিনি মুখে হাসি আনার চেষ্টা করছেন। শেখ লুৎফর রহমান আঙিনায়। তিনি তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে হাত বের করে মুজিবের হাতে গুঁজে দেন কিছু টাকা। প্রত্যেকবার বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় বাবা তাঁর হাতে টাকা দেন।

মুজিব টাকাটা নিতে সংকোচ বোধ করেন। 'আবার টাকা দেন কেন?'

বাবা বলেন, 'কী, নিতেছ না ক্যান, ন্যাও।'

'বড় হয়েছি না, বাবা?'

শেখ লুৎফর রহমান বলেন, 'বাবা রে। বাবার কাছে ছেলে কি বড় হয়? তুমি একদিন অনেক বড় হবা। আমি দোয়া করি। কিন্তু সেই দিনও তুমি আমার ছেলেই থেকে যাবা, বাবা!'

বাবার সঙ্গে শেখ মুজিবের একটা গোপন আন্তরিক যোগাযোগ আছে। সেটা অদৃশ্য। কিন্তু আছে সেটা। বাবার সঙ্গে তিনি ছোটবেলায় গোপালগঞ্জ আর মাদারীপুরে এক বাসায় থেকেছেন। সেখানে আর কেউ থাকত না। শুধু বাবা আর তিনি। তাঁরা রোজ সকালে হাঁটতে বেরোতেন। বাবা সঙ্গে নিতেন একটা ছাতা বা একটা ছড়ি। বাবা বলতেন, 'এই যে ছাতা বা ছড়ি, এইটে তোমাকে সাহস দিবে। ধরো, পথে বৃষ্টি হলো, রোদ হলো, ছাতা কাজে লাগবে। কিংবা ধরো, একটা কুকুরে তাড়া করল, একটা গরু ছুটে আসল, এই ছাতা বা ছড়ি তখন তোমার অস্ত্র।'

বাপ-ছেলে মিলে চলে যেতেন নদীর ধারে। শীতকালে ভোরবেলাতে পুরো জগৎ ঘুমিয়ে থাকত কুয়াশার চাদরটা মুড়ি দিয়ে।

'বাবা।' মুজিব ডাকতেন।

'কী, খোকা?'

'এখনো সবকিছু ঘুমাচ্ছে। গাছ, রাস্তা, গ্রাম। তাই না, বাবা।'

'হ্যাঁ। কিন্তু একটা জিনিস ঘুমাচ্ছে না। দেখবা চলো।'

'কী, বাবা?'

'এই যে দেখো নদী। সবাই এখনো ঘুমে। কেবল নদী জেইগে আছে।'

বালক মুজিব অবাক হয়ে দেখেন। তাই তো। নদী ছলছল করে বেয়ে যাচ্ছে। কী আশ্চর্য! নদী ঘুমায় না?

'বাবা, আমাদের বাড়ির সামনের খালটা কিন্তু শীতকালে ঘুমায়। সকালবেলা। তাই না?'

'হ্যাঁ। খাল ঘুমাতে পারে। যদি খালে স্রোত না থাকে।'

কুয়াশার ভেতর দিয়ে নদীর পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে তাঁরা ফিরে আসেন। পথের মোড়ে সেরাজ গাছি খেজুরের রসের হাঁড়ি নিয়ে বসে আছে। একটু একটু করে রোদ উঠতে শুরু করেছে। গোপালগঞ্জ মহকুমা শহরের পথে দোকানপাট, গাছপালার ছায়া তখন দীর্ঘ হয়ে মাটিতে পড়তে শুরু করেছে। মিউনিসিপ্যালিটির দেহাতি মানুষেরা রাস্তা ঝাড়ু দিতে গেলে রোদের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে সোনালি ধূলিকণা। বাবা বলতেন, 'নাও, বাবা, খেজুরের রস খাও।'

বাবা এক গেলাস খেতেন। মুজিব খেতেন দুই গেলাস। ঘোলা কাচের গেলাসে রস খেয়ে বাম হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুজিব ঠোঁট মুছতেন। বাবা বলতেন, 'র‍্যাপারটা তো, বাবা, ধুলায় গড়াচ্ছে।' বাবা র‍্যাপারটা জড়িয়ে দিতেন ছেলের গায়ে।

তাদের মধ্যে কথা না হলেও চোখে চোখে ভাববিনিময় হয়ে যেত অনেক সময়। রস খাওয়া হয়ে গেলে মুজিব বলেন, 'বাবা!' তিনি ইঙ্গিতে একটু দূরে নির্দেশ করেন। বাবা তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন ছেলে কী বলতে চায়। একটা গরিব বাচ্চা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দেখছে। ছেলে চায় বাবা তাকেও রস কিনে দিক। লুৎফর রহমান সাহেব ডাকেন, 'এই, এদিকে আয়।'

বালক মুজিব বলতেন, 'বাবা, ওর নাম মিজান।'

'সেরাজ, অরেও রস দাও।' বাবা তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করতে করতে বলতেন।

হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেলে বাবা ছাতা মেলে ধরতেন। মুজিব ছাতার নিচে বাবার গা ঘেঁষে হাঁটতেন। এমন একটা নির্ভরতা পাওয়া যেত বাবার সংস্পর্শে। কিন্তু মুজিবের আরেকটা আশ্চর্য কথা মনে হয়। ছাতা হাতে না থাকলে রোদের মধ্যে মুজিব বাবার ছায়ায় হাঁটতেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, তিনি ছায়া পাবেন বাবার ছায়ার ওপরে ওপরে হাঁটলে। বাবা সেটা খেয়াল করে বললেন, 'ছায়ার ওপরে দাঁড়ালে তো তুমি ছায়া পাবা না নে, তোমাকে আমার আড়ালে দাঁড়াতে হবে, কাছে আসো।' মুজিব বাবার ছায়ার ভেতরে নিজের ছায়াটাকে হারিয়ে ফেলেন।

এই রকম একটা অদৃশ্য কিন্তু অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে পিতাপুত্রের।

মুজিব তাই বাবার কাছ থেকে টাকা নিতে শেষ পর্যন্ত আপত্তি করেন না। মেসে উঠেছেন, টাকাপয়সা তো লাগবেই। বাবার এই

সহযোগিতাটুকু তাঁর দরকার হবে। তাতে তাঁর মনের জোর থাকবে। টিউশনি ইত্যাদি করতে হবে না।

মুজিব ঘাটে এসে নৌকায় সওয়ার হন। বাবাও এসেছেন ঘাট পর্যন্ত। পাড়ার নানা বয়সী ছেলে-বুড়োরাও ভিড় করে দাঁড়ায় ঘাটের পাড়ে।

'নদী কখনো ঘুমায় না।' বাবা বলেছিলেন।

কুয়াশামোড়া সকালে গাছপালা এখনো নিদ্রিত। এমনকি এই খালটাও। খাল ঘুমাতে পারে, বাবার কথা।

নদীতে গিয়ে পড়তে পড়তে রোদটা একটু চাড়া দেবে। তখন চারপাশের সবকিছুকেই মনে হবে জাগ্রত।

মাঝি নৌকা ছেড়ে দেয়।

কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যায় চিরপরিচিত ঘাট, সুপুরিগাছ, বাঁশঝাড়, আর মানুষগুলো।

২৫.

টুঙ্গিপাড়া থেকে মুজিব এসে দেখেন ঢাকা মোটামুটি গরম হয়ে আছে। ১৫০ মোগলটুলীর লীগ অফিসে তিনি হাজিরা দিচ্ছেন নিয়মিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছেন এরই মধ্যে।

মুজিবের হিসাব বলছে, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নেই ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা এখন বিচলিত। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা বিক্ষোভে পরিণত হবে। না হওয়ার কোনো কারণ নাই। কেন্দ্রে লিয়াকত আর প্রদেশে খাজা নাজিম উদ্দিনরা যা শুরু করেছে। স্টাম্পে, দলিলে, টাকায় সবখানে উর্দু, বাংলার চিহ্নমাত্র নাই। এরা নিজেদের কী ভাবছে! ব্রিটিশ শাসক? আমরা কি লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান বলে জানবাজি রেখে শেষে আরেকটা প্রভু পেলাম! মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল এই বাংলায়। ভোটের সময় মুসলিম লীগ জয়লাভ করেছিল কেবল এই বাংলাতেই। এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এই বাংলারই। অথচ ওরা আমাদের শাসন করতে চায়!

বর্ধমান হাউসে খাজা নাজিম উদ্দিনের সরকারি বাসভবনে বসেছে

মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা। মুজিব আজ সেখানে যাবেন ছাত্রদের মিছিল নিয়ে। তমদ্দুন মজলিসের নেতারা গতকাল হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষরসংবলিত স্মারকলিপি এই ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দিয়ে এসেছেন।

কয়েক দিন ধরেই চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ। দাবি একটাই—পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাকে। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাক্ষর করছেন। করবেই বা না কেন? দিন পনেরো আগে পাকিস্তানের প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সার্কুলার এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩১টি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। এর মধ্যে নয়টা ভাষা। নয়টা ভাষার মধ্যে বাংলার জায়গা হলো না?

আজ শুধু স্বাক্ষর নয়, জ্যান্ত মানুষের মিছিল যাবে। মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যান। ছেলেদের জড়ো করেন। তারপর বক্তৃতা করা শুরু করেন: 'বাংলা ভাষাকে করতে হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ভাষা, অফিসের ভাষা। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটো, বাংলা আর উর্দু। তবে তৃতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি থাকতে পারে। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, আমরা বাঙালিরাই পাকিস্তান গড়েছি, আজকে আমাদেরকে দাবায়া রাখার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। ভাইয়েরা আমার, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে।'

খুব শীত পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছের পাতায় পাতায় আলোর নাচন। এই আলো ছাত্রদের শরীরের জড়তা কাটাতে পারছে না। পায়জামা আর হাওয়াই শার্ট পরা বেশির ভাগ ছাত্র। তাদের কয়েকজনকে নিয়ে মিছিল শুরু করলেন মুজিব: 'রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই বাংলা চাই'। মিছিল বড় হতে শুরু করেছে। এর মধ্যে তমদ্দুন মজলিসের নেতা অধ্যাপক আবুল কাসেমও এসে গেছেন। এসেছেন সাংবাদিক আবুল কাশেম। মুজিব স্লোগান ধরেছেন। ছাত্ররা স্লোগানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাচ্ছে। তাদের হাত উঁচু হচ্ছে, আওয়াজ উচ্চতর। তাদের শরীরের শৈত্য দূর হয়ে গেছে। বরং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মিছিল ক্যাম্পাস পরিক্রমণ করল। এবার তাঁরা যাচ্ছেন বর্ধমান হাউসের দিকে। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করবেন।

খাজা নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে চলছে ওয়ার্কিং কমিটি। তাঁরা বাড়ির গেটে মিছিল করছেন। মিছিল বড় হয়েছে। মওলানা আকরম খাঁ বেরিয়ে এলেন। ছাত্ররা তাঁকে দেখে আরও জোরে আওয়াজ তুলল,

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। দৈনিক *আজাদ*-এর সম্পাদক। বয়স্ক মুরব্বি মানুষ। তাঁর সঙ্গে আছেন আবু জাফর শামসুদ্দীন, সাংবাদিক আর লেখক। ৩৪ বছর বয়সী ছিপছিপে এক তরুণ। তিনি কাজ করেন দৈনিক *আজাদ*-এ। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছেন। এখন *আজাদ*-এর ঢাকা প্রতিনিধি। সাংবাদিক হিসেবে তিনি এসেছেন এই সভার খবর সংগ্রহ করতে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন মওলানার কোনো কোনো গোপন খবর জানেন। যেমন মওলানা পেশাব করার পর পানি ব্যবহার করেন না। মওলানার পাশের ঘরে থাকতেন আবু জাফর। এই নিয়ে জাফর সাহেবের স্ত্রী প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলেছিলেন, নামাজ-রোজা এই সব বিষয়েও তো মওলানা উদাসীন। জাফর সাহেব তাঁর সম্পাদককে বাঁচানোর জন্য বলেছিলেন, 'মওলানা সাহেব কোনো একটা তরিকাপন্থী মানুষ। তাঁর তরিকায় এই সব লাগে না। একজন দরবেশ আছেন, তিনি কাপড় পরেন না। তাঁকে বলা হয়েছিল, "দরবেশ সাহেব, এত মানুষের সামনে আপনি কাপড় ছাড়া।" তিনি বলেছিলেন, "আমি তো আমার চারপাশে কোনো মানুষ দেখি না"।' শুনে জাফর সাহেবের স্ত্রী খানিকটা প্রবোধ মেনেছিলেন।

এখন মওলানা আকরম খাঁ এসেছেন। এখন তিনি ছাত্রদের উত্তেজিত মিছিলের সামনে। তিনি ঘোষণা করলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষা চাপানোর চেষ্টা করা হলে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেব আমি।' এ কথা বলা মওলানার পক্ষে সম্ভবপর ছিল। আজ থেকে ৩০ বছর আগে সেই ১৯১৮-তেই তিনি লিখেছিলেন, 'দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। বাঙ্গালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দ্দু না বাঙ্গালা? এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। বঙ্গে মুছলমানের ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।'

কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকদের বিক্ষোভ এখানেই থেমে গেল না। বরং, রটে গেল যে করাচিতে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী (ওদের ভাষায় উজিরে তালিম) ফজলুর রহমান বলেছেন যে উর্দুকেই লিংগুয়া ফ্রাংকা করা হবে।

পরের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তেজনায় কাঁপছে। তমদ্দুন মজলিসের আবুল কাশেম ছুটে গেলেন মুনীর চৌধুরীর কাছে। কী করা যায়? শিক্ষক মুনীর চৌধুরী বললেন, আজকে প্রতিবাদ সভা করতে হবে। ঠিক হলো, বেলা দুটোয় বেলতলায় সমাবেশ।

শেখ মুজিব সমাবেশ সফল করার জন্য কাজ করতে লাগলেন। তিনি মিছিল বের করলেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, আজকের সমাবেশে যোগ দিন'। দুপুর হতে না হতেই বেলতলা ভরে গেল হাজার তিনেক বিক্ষুব্ধ ছাত্রের উপস্থিতিতে। সভায় সভাপতিত্ব করলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম, বক্তব্য রাখলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ফরিদ আহমদ প্রমুখ।

শেখ মুজিব তাঁদের এক পাশে দাঁড়িয়ে স্লোগান ধরছেন।

তাজউদ্দীনও যোগ দিলেন সেই সভায়। সভা শেষে তাজউদ্দীন গেলেন বলিয়াদি ছাপাখানায়। তিনি তাঁদের প্রস্তাবিত পার্টির ঘোষণাপত্র ছাপা নিয়ে ব্যস্ত।

শেখ মুজিব আর কোথাও গেলেন না। তিনি যোগ দিলেন মিছিলে। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরিয়ে রওনা দিল সচিবায়ের দিকে। শেখ মুজিব হাঁটছেন মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে। 'উর্দু জুলুম চলবে না, পাঞ্জাবিরাজ বরবাদ' ধ্বনি উঠতে লাগল। সেখান থেকে মিছিল গেল আরও দুই মন্ত্রীর বাসভবনে। শেষে গেল মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের বাসভবনে। 'উর্দুওয়ালা বরবাদ' স্লোগান দিয়ে এবার মিছিলের লক্ষ্য হলো *মর্নিং নিউজ* পত্রিকা। কারণ, *মর্নিং নিউজ*-এ সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে বাংলা ভাষার বিপক্ষে, উর্দুঅলাদের পক্ষে। *মর্নিং নিউজ* অফিসের সামনে ছাত্ররা স্লোগান ধরল, 'মর্নিং নিউজ ধ্বংস হোক, উর্দুঅলা বরবাদ'। সেক্রেটারিয়েটে মন্ত্রীরা, বর্ধমান হাউসে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি—সবাই ছাত্রদের আশ্বাস দিলেন, বাংলা অবশ্যই প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা হবে, তারাও বাংলারই পক্ষে।

কিন্তু আগুনে ঘি পড়ছিল নানাভাবে।

ঢাকার উর্দুভাষীরাও তৎপরতা শুরু করল খাজার উসকানিতে। এ কে এম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে সিরাজউদ্দৌলা পার্কে এক সভা হওয়ার কথা। জনা পঞ্চাশেক কুট্টি গেল সেখানে। তারা বলল, এই সভা হচ্ছে হিন্দুদের সহযোগিতায়। পাকিস্তান ধ্বংস করা এই সভার উদ্দেশ্য। তারা চেয়ারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সভা পণ্ড করে দিল, ক্ষোভ প্রকাশ করল

ছাত্রদের বিরুদ্ধে। ছাত্ররা পাকিস্তান ধ্বংস করতে চাচ্ছে—এই হলো তাদের অভিমত। ছাত্রদের ওপরে তাদের খুবই রাগ।

এই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটল দিন পাঁচেক পর। বাসে ও ট্রাকে করে জনা পঞ্চাশেক ভাড়া করা লোক বেরিয়ে পড়ল মিছিল নিয়ে। তারা চায়, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক। এই সন্ত্রাসীরা হামলা পরিচালনা করল মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। এখানে সংঘর্ষ বেধে গেল আক্রমণকারী আর ছাত্রদের মধ্যে। সরকারি কর্মচারীরাও উর্দুঅলাদের আক্রমণের শিকার হলো। পুলিশ লাঠিপেটা করল আক্রমণকারীদের, গুলিও হয়েছে বলে কেউ কেউ বললেন।

এই খবর পাওয়ামাত্রই দৌড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চলে এলেন শেখ মুজিব। সমস্ত ক্যাম্পাসে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আবুল কাশেমের নেতৃত্বে মিছিলে যোগ দিলেন তিনি। পলাশী ব্যারাকের কাছে প্রথম সমাবেশে মিলিত হলো ছাত্ররা। মিছিল গেল শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে। মিছিলকারীদের দাবির মুখে শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই মিছিলে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, বাংলা ভাষার দাবি ন্যায্য, তিনি এই দাবির সঙ্গে আছেন। মিছিল চলল সচিবালয়ের দিকে। আবদুল হামিদ লুঙ্গি পরে হেঁটে মিছিলের সঙ্গে সচিবালয়ে গেলেন। সেখানে কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আফজালকে পাকড়াও করে বিক্ষোভকারীরা। দুই মন্ত্রী লিখিতভাবে জনতার দাবির সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন।

উর্দুর পক্ষে মিছিলকারীরা ট্রাক থেকে একটা লিফলেট ছেড়েছে। তাতে বলা হয়েছে, উর্দু মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। এ ভাষার বিরুদ্ধে যে কথা বলবে, সে কাফের। এ ধরনের কাফের বা বিধর্মীদের শায়েস্তা করতে হবে। আর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

এই লিফলেট ছাত্রজনতার বিক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিল। পরের দিন সচিবালয়ে ছিল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধর্মঘট। ধর্মঘটের কারণ ছিল কর্মচারীদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া। তবে পলাশীতে তাদের ওপর উর্দুঅলাদের আক্রমণ ধর্মঘটে নতুন মাত্রা যোগ করল।

তাজউদ্দীন আহমদ সংঘর্ষে আহত ছাত্রনেতা নাঈমউদ্দিন সাহেবকে দেখতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলেন।

সরকার এরই মধ্যে ভাষা প্রশ্নে সূচিত এই আন্দোলনকে ভারতের চক্রান্ত, হিন্দুদের চক্রান্ত বলতে শুরু করে দিয়েছে। ১৪৪ ধারা জারি হলো। আর পূর্ববঙ্গে ভারতীয় পত্রিকা, যেমন—দৈনিক *ইত্তেহাদ*,

অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার পনেরো দিনের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করল সরকার। দৈনিক *আজাদ*ও সুর পাল্টে ফেলল। তারা এখন রাষ্ট্রভাষা উর্দু আর পূর্ববঙ্গে লেখাপড়ার ভাষা বাংলা—এই সুরে গান ধরেছে।

বর্ষাকালের শেষ দিকে, বলা যায় শরতের শুরুতে, পাকিস্তান কায়েম হলো। শরৎ যেতে না যেতেই শুরু হয়ে গেল বিক্ষোভ মিছিল। হেমন্তে জারি করতে হলো ১৪৪ ধারা, আর পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতিটা ক্ষোভ-বিক্ষোভ-দীর্ঘশ্বাসের পেছনে খোঁজা হতে লাগল হিন্দু আর হিন্দুস্তানের চক্রান্ত, একেবারে প্রথম দিন থেকেই।

২৬.

পৌষের শীতকাতর রাত। আজ সারা দিন আকাশ মেঘলা ছিল, তাই হয়তো কুয়াশাভাবটা কম। এখন উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চলন্ত রিকশার যাত্রীদের কানে-মুখে বিঁধছে শীত-হাওয়ার সুচ। কোথাও একটা কামিনী ফুলের ঝাড় থেকে আসছে মাদকতাপূর্ণ গন্ধ। কাচারি এলাকার সিনেমা হল মুকুলে সেকেন্ড শো ভাঙল। ছ্যাকরা গাড়িগুলো ছুটতে লাগল হলভাঙা দর্শকদের নিয়ে। রিকশাঅলারা ক্রিং ক্রিং শব্দে মুখর করে তুলল রাতের নীরব গলি-উপগলিগুলো। 'আমি বনফুল গো' বলে গান গেয়ে উঠল কোনো কোচোয়ান। একটা বাড়ির রেডিওতে বেজে উঠল খুরশিদ খানের কণ্ঠে *তানসেন* ছবির গান—'বরষো বরষো...'। কাচারির ঘড়িতে ১২টার ঘণ্টা বাজল। শেখ মুজিব নামলেন রিকশা থেকে। যাবেন তাঁর মেসে।

সারাটা দিন বড় ধকল গেছে।

কয়েক দিন থেকেই পরিকল্পনা চলছিল। তাজউদ্দীন, কামরুদ্দীন সাহেব, কাদের সরদার, আতাউর রহমান খান—অনেকেই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজ মুসলিম লীগের এমএলএদের মধ্যে যাঁরা সরকারবিরোধী, তাঁদের সঙ্গে একটা সভা ছিল শেখ মুজিবদের।

এমএলএদের মধ্যে প্রায় ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। বলিয়াদি ভবনে অনুষ্ঠিত হলো এই সভা। বেলা তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলল এই সভা। এমএলএদের কাছে শেখ মুজিবদের প্রশ্ন ছিল, ভবিষ্যতে নেতা কে হবেন? সোহরাওয়ার্দী সাহেব নাই, আবুল হাশিম সাহেব আসবেন না, বামপন্থী মুসলিম লীগ এমএলএদের মধ্যে কাকে নেতা হিসেবে গণ্য করবেন তাঁরা? তাঁরা বলেছেন, দুদিনের মধ্যেই সেটা জানাবেন।

সভা শেষ করে তাঁরা একটা গাড়ি জোগাড় করে বেরিয়ে গেলেন। শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন, মহিউদ্দিন, শওকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হল, নীলক্ষেত ব্যারাক, এফএইচএম হল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হোস্টেল, নিমতলী মেস—ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁরা কলকাতা থেকে আসা দৈনিক *ইত্তেহাদ* বিলি করলেন। দৈনিক *ইত্তেহাদ* এই দেশে নিষিদ্ধ। প্রধানত সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক এই পত্রিকা। পূর্ব বাংলার সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমপন্থীদের আন্দোলনের খবর, বাংলা ভাষার পক্ষে নানা ধরনের লেখা এই কাগজে ছাপা হয়। এই কারণেই সরকার এটা নিষিদ্ধ করেছে, আর এই কারণেই মুজিব-তাজউদ্দীন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন সেটা বিলি করার জন্য। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণও বটে। যে কাগজ এই দেশে নিষিদ্ধ, সেই কাগজ বিলিবণ্টন করা। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কে করবে, যুবক শেখ মুজিব ও তরুণ তাজউদ্দীনরা ছাড়া। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁরা কথা বললেন। ছাত্রদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বোঝা গেল, সরকারের ওপর এরই মধ্যে সবাই বিরক্ত ও হতাশ। এই হতাশা দিন দিন বাড়ছে।

মুজিব মেসে ফিরলেন। ঘরদোর সব অন্ধকার। তাঁর ঘরের দরজায় মৃদু আলো ছড়াচ্ছে একটা হারিকেন। হারিকেনটা হাতে তুলে নিয়ে চাবি ঘুরিয়ে আলো বাড়ালেন। এক হাতে হারিকেনের হাতল, আরেক হাত দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দরজার তালা খুললেন। ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখলেন, টেবিলে ভাত ঢেকে রাখা।

হাতমুখ ধুয়ে এসে গামলার ওপর থেকে থালা সরালেন। ঠান্ডা ভাত। ঠান্ডা তরকারি। বাটিতে ডাল। হারিকেনের আলোয় দেখা যাচ্ছে, ডালের পানির খুব নিচে কিছু তলানি জমে আছে।

তিনি ভাত খেতে শুরু করলেন।

অন্যমনস্কভাবে। খাওয়ার দিকে তাঁর মন নাই। আগামীকালের কাজ কী হবে, ভাবছেন। কাল বর্ধমান হাউসে এমএলএদের সভা। সেখানে একবার যেতে হবে। কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গেও দেখা করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের সংগঠিত করতে হবে। ছাত্রলীগ শাহ আজিজের দখলে। এটাকে এই ডানপন্থীদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। নতুন দেশ। পুরোনো নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে তো পুনর্গঠিত করা দরকার। একটা কাউন্সিল দিলেই শাহ আজিজরা অপসারিত হয়ে যাবেন। তাঁকে ধরতে হবে, যেন তিনি কাউন্সিল ডাকেন।

পরের দিন আকাশে ছিল মেঘ। শীত-সকালের আকাশ মেঘে ঢাকা। এমন দিনে কি বাইরে যেতে মন চায়?

শেখ মুজিবের মধ্যে আলস্য নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ফজলুল হক হলে গেলেন তিনি। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তাঁর ভক্ত হয়ে গেছে। তিনি যাওয়ামাত্রই তাঁকে ছেলেরা ঘিরে ধরে। তিনি বললেন, 'একটা সভা হবে। সবাইকে ১২টায় জড়ো করো।' তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলে ভিড় হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'আমরা পাকিস্তান পেয়েছি। একে উন্নত করতে হবে। এ জন্য দরকার একটা শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন। চলেন, আমরা শাহ আজিজের কাছে যাই। তাকে বলি, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে নতুন করে গড়ে তুলতে। যাতে একটা শক্তিশালী সংগঠন আমরা গড়ে তুলতে পারি।'

তখনই শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছাত্ররা চলল শাহ আজিজকে ধরতে। তাঁকে পাওয়া গেল।

শেখ মুজিব বললেন, 'ছাত্রলীগের কাউন্সিল ডাকেন। সেই যে ৪৪ সালে কাউন্সিল হয়েছে, এরপর আর কাউন্সিল হয় নাই। এর মধ্যে পাকিস্তান হয়ে গেছে। নিখিল বাংলা ছাত্রলীগের নাম বদলে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান রাখার মানে কী? এখন তো পশ্চিম বাংলা আমাদের সাথে নাই। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবশ্যই কাউন্সিল ডাকতে হবে।'

শাহ আজিজ ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক। তিনি বুঝে ফেললেন, এখন কাউন্সিল ডাকা হলে তাঁর সাধারণ সম্পাদকের পদ হারাতে হবে। তিনি বললেন, 'না, এখন কাউন্সিল ডাকা হবে না।'

মুজিব বললেন, 'আপনি নিখিল বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নন। এটা তো বৈধ হয় না।'

শাহ আজিজ বললেন, 'এখন মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলন ডাকা হবে না।'

মুজিব বললেন, 'গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গত চার বছরে আটবার সম্মেলন ডাকার কথা। আপনি সেটা ডাকেননি। আপনারা অনেকেই আর ছাত্রও না। কাজেই আপনাদের নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এরই মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।'

শাহ আজিজ বললেন, 'আপনারা চাইলে আলাদা ছাত্রলীগ গঠন করতে পারেন।'

'আচ্ছা, তা-ই হবে।' মুজিবের নেতৃত্বে ছাত্ররা ফিরে এল।

মুজিব এটাই চাইছিলেন। তিনি গেলেন মোগলটুলীতে। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের ছাত্রনেতাদের সবাইকে ডাকলেন। বললেন, '৪ জানুয়ারি সবাই ফজলুল হক হলে আসেন। শাহ আজিজ কাউন্সিল ডাকবে না। আমাদের পথ আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে।'

ফজলুল হক মিলনায়তনে নেতৃস্থানীয় ছাত্রকর্মীরা সবাই উপস্থিত। ঠিক হলো, নতুন সংগঠন হবে। নাম কী হবে?

প্রস্তাব এল, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ।

উপস্থিত ছাত্রনেতা অলি আহাদ বললেন, 'আমরা অসাম্প্রদায়িক সংগঠন করতে চাই। মুসলিম শব্দটা বাদ দিয়ে শুধু ছাত্রলীগ নাম রাখা হোক।'

মোহাম্মদ তোয়াহা এই মত সমর্থন করলেন।

মুজিব বললেন, 'নীতিগতভাবে আমি এই মত সমর্থন করি। কিন্তু বাস্তবে কৌশলগত কারণে আমরা এখনই এটা না করে কিছুদিন পরে করতে পারি। এখন যদি আমরা মুসলিম শব্দটা বাদ দিই, সরকার আমাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। আমাদেরকে ইন্ডিয়ার দালাল বা কমিউনিস্ট বলবে। স্থানীয় মানুষদেরও আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। আপাতত মুসলিম শব্দটা থাকুক। সময় ও বাস্তবতা বুঝে আমরা পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করব।'

তখন সবার মত চাওয়া হলো। শেখ মুজিবের মতকেই সমর্থন জানালেন বেশির ভাগ কর্মী। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামটাই গৃহীত হলো।

তোয়াহা মন খারাপ করলেন। ভবিষ্যতে তিনি আর এই সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন না বলে ঠিক করলেন।

রাজশাহীর নাইমুদ্দিন আহমেদকে আহ্বায়ক করে ১৫ সদস্যের একটা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হলো। শেখ মুজিবও সেই কমিটির একজন

হিসেবে থাকলেন।

ফজলুল হক হল থেকে বেরিয়ে মুজিব দেখলেন, সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। কীভাবে যে বিকেলটা দ্রুত ফুরিয়ে গেল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় এলেন। সঙ্গে রইল জনা কয়েক ছাত্রনেতা।

রাতের খাবার খেতে হবে। নিজের খাবার তো মেসে থাকবেই। ঠান্ডা হলেও খাওয়াটা নিশ্চিত। আসলে দরকার সঙ্গীদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া। তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে গুলিস্তানের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে পৌঁছালেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছে বসে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি মনের ভাব বিনিময় করছে ঠোঁটে ও কণ্ঠে, কথায় কথায়।

ব্যাঙ্গমি বলল, 'শেখ মুজিব কিন্তু তাঁর লক্ষ্যের দিকে একধাপ আগায়া গেল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন কইরা ফেলল।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু এ আর এমন কী?'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'তুমি সব জানো, তাও আমারে দিয়ে কথা কওয়াইতে চাও। এই মুসলিম ছাত্রলীগই একসময় ছাত্রলীগ হইব।'

ব্যাঙ্গমা যেন কিছুই বোঝে না এমন ভাব করে বলল, 'তা যখন হইব, তখন হইব। এখন কী?'

ব্যাঙ্গমি হেসে বলল, 'এই যে শুরু হইল মুসলিম লীগের ছাত্রলীগের পতন। এর পরে শাহ আজিজের দল আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা হারাইব। সলিমুল্লাহ হলে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে শাহ আজিজের নিখিল মুসলিম লীগের প্রার্থী হারব বিরোধী প্রার্থী সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছে। সৈয়দ নজরুলরে মনে রাইখো। ২৩ বছর পর তারে অনেক বড় দায়িত্ব পালন করতে হইব। ফজলুল হক হলেও প্রগতিশীল মো. তোয়াহা জয়লাভ করব।'

ব্যাঙ্গমা হেসে বলল, 'কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সভাপতি না হয় হইল বাবু অরবিন্দ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক কে হইল? গোলাম আযম। এইটা যে কও না?'

ব্যাঙ্গমি কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'ক্যান কই না, তুমিও জানো, আমিও জানি। এই বেটারেও দেইখা রাখো, ভবিষ্যতে এ-ও কম যন্ত্রণা দিব না।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'কলকাতায় দক্ষিণ এশীয় যুব সম্মেলনে কে যাইব? শাহ আজিজ, নাকি বিরোধীরা?'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'বিরোধী ছাত্রলীগ থাইকাই দলনেতা হইল। আবদুর রহমান চৌধুরী। যুবলীগ থাইকা শামসুল হক সাহেব, ছাত্র ফেডারেশন থাইকা শহীদুল্লা কায়সার আর লিলি খান, লুলু বিলকিস বানু ও গায়িকা লায়লা আর্জুমান্দ বানু। শাহ আজিজ খুব মন খারাপ করব।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'না, করব না। কলিকাতা যাত্রা তো! করাচি হইলে করত!'

২৭.

শেখ মুজিবের সঙ্গেই বিকেলটা কাটিয়েছেন তাজউদ্দীন। মুসলিম লীগ অফিসে। সন্ধ্যার পর কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য গেছেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান সাহেবের বাসায়। এই ভদ্রলোকেরও রাজনীতি নিয়ে অনেক উৎসাহ। তিনি প্রায়ই কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে আসেন। কামরুদ্দীন সাহেবও যান তাঁর কাছে। ক্যাপ্টেন সাহেবের দোতলা বাড়ি। নিচতলায় বসার ঘর। সেখানেই বসে আছেন তাজউদ্দীন। ওপরতলায় কামরুদ্দীন সাহেব আছেন। বোধ করি শাহজাহান সাহেবের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। ঢাকার বেশির ভাগ বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকলেও এই বাড়িতে আছে। মাথার ওপর জ্বলছে বিদ্যুৎ বাতি। তারই হলুদ আলোয় চমৎকার করে সাজানো ঘরটায় তাজউদ্দীন বসে আছেন আত্মমগ্ন।

হঠাৎই একজন এসে বলল, 'খবর শুনেছেন, গান্ধীজিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

তাজউদ্দীন একটা তীব্র-তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন। যেন রাতের কালো বুকের মধ্যে কে যেন বিদ্ধ করল একটা শব্দের বল্লম।

গৃহকর্তা ক্যাপ্টেন শাহজাহান দোতলা থেকে উঁকি দিলেন। কী হয়েছে?

তাজউদ্দীনের মুখ থেকে কথা সরছে না। তাঁর সমস্ত শরীর বিকল, হাত-পা বিবশ। প্রায় তিন মিনিট তিনি যেন স্তম্ভিত, চেতনারহিত হয়ে রইলেন। তারপর কোনো রকমে বললেন, 'যা সত্যি, তা কি ঠিক? গান্ধীজি...'

'হ্যাঁ। গান্ধীজিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

তাজউদ্দীনের শরীরে বল ফিরে আসছে না। তাঁর মাথায় কোনো কিছু কাজ করছে না। কোনো দুখের অতলে তাঁকে কেউ নিক্ষেপ করল যেন! তিনি ডুবে যাচ্ছেন আর ডুবে যাচ্ছেন।

কামরুদ্দীন আহমদ নেমে এলেন দোতলা থেকে। নুরজাহান বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা।

বেচারাম দেউরিতে এসে রেডিওতে নিজের কানে সেই দুঃসংবাদটা শুনলেন তাজউদ্দীন। বুকের ভেতর ক্ষরণ হচ্ছে তাঁর। সেই ক্ষরণ কিছুতেই বাঁধ মানছে না।

ফজলুল হক হলে গেলেন সাইকেল চালিয়ে। শীতরাতের কুয়াশামাখা অন্ধকার পথ পেরিয়ে। সেখান থেকে গেলেন ঢাকা হলে। রেডিও বাজছে। ছেলেরা সব রেডিও ঘিরে ধরে আছে। পণ্ডিত নেহরু আর সর্দার প্যাটেল ভাষণ দিলেন।

তাজউদ্দীন মন দিয়ে ভাষণ শুনলেন। তাঁর বুকের ক্ষত সারল না। সব জানা গেল। বিকেলবেলা গান্ধীজি অন্য দিনের মতোই দিল্লির প্রার্থনামঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। একটা লোক উঠে দাঁড়াল। সে পিস্তল বের করে তিনটা গুলি করল। একটা গুলি ভেদ করে গেল মহাত্মার বুক। দুটো বিদ্ধ হলো তাঁর তলপেটে। রক্তে ভেসে গেল চারপাশ।

বিরলা ভবনে নেওয়া হলো তাঁকে। ৩০ মিনিটের মধ্যেই এক মহান আত্মা দেহখাঁচা ছেড়ে চলে গেল।

হত্যাকারীকে জনতা সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলেছে। তার নাম নাথুরাম গডসে। বোম্বের অধিবাসী এই লোক একজন মারাঠি। সে *হিন্দু রাষ্ট্র* পত্রিকার সম্পাদক।

ঘরে ফিরে এলেন তাজউদ্দীন। নিমতলী মেসের ঘর।

কিন্তু মনের মধ্যে তাঁর অস্থিরতা। যেন একটা গলা কাটা মোরগ তাঁর বুকের মধ্যে তড়পাচ্ছে।

এত কষ্ট কেন হচ্ছে তাঁর? এই জীবনে প্রথম কোনো মৃত্যুশোক অনুভব করছেন তাজউদ্দীন। অথচ মৃত্যু সব সময়ই তাঁর কাছে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এর আগে কোনো দিন কারও মৃত্যুতে তিনি শোক প্রকাশ করেছেন বলে তাঁর মনে পড়ে না। বড় ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল তিন বছর আগে। অল্প বয়সে। সেই মৃত্যুতে তাঁর মনে কোনো দুঃখবোধই জাগেনি।

গত বছর বাবা মারা গেছেন। তাজউদ্দীন তখন কলকাতায়। বাবা চেয়েছেন, তাজউদ্দীন যেন কলকাতা না যায়। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাজউদ্দীন কলকাতা গিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর খবর যখন পেলেন, তার ১৫ মিনিট পর তিনি চারটা পরোটা আর এক বাটি মাংস খেয়েছিলেন, তা এখন দিব্যি মনে পড়ছে। তার পরের রাতে বাবা যে বিছানায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সে বিছানায় শুয়ে তিনি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ হয়নি।

শুধু একটাই বোধ তাঁর মধ্যে এসেছিল, পারিবারিক বোঝাটা তিনি নিজের কাঁধের ওপর টের পাচ্ছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজির মৃত্যুটা কেন তিনি সহজভাবে নিতে পারছেন না? কেন এই দুর্বলতা? দুর্বলতাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তিনি মন শক্ত করতে চাইছেন। কিন্তু পারছেন না। তিনি অনুভব করলেন, এটা দুর্বলতা নয়। এ হচ্ছে বিষাদ। জগৎপ্লাবী বিষাদের নিচে তিনি ডুবে আছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাত ১২টায় তিনি খাবার খেলেন। তারপর ঘুমানোর জন্য শরীর সমর্পণ করলেন বিছানায়। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। সমস্ত চেতনা আপ্লুত করে রেখেছেন গান্ধীজি। স্নায়ু বিবশ হয়ে এল। তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। কিন্তু তবু ওই তন্দ্রার ভেতরেই গান্ধীজি তাঁকে আপ্লুত করে রাখলেন।

তাঁর মনে হতে লাগল, বিগত দিনগুলোয় এই গান্ধীজির বিরুদ্ধেই তিনি কত কথা উচ্চারণ করেছেন। অন্তরের বিশ্বাস থেকে সেসব করেননি, করেছেন রাজনীতির খাতিরে। কারণ, মুসলিম লীগের শক্তি ছিল কংগ্রেসের দুর্বলতায়। তাই তিনি ভাবতেন, কংগ্রেসকে দুর্বল করার উপায় হলো মহাত্মা গান্ধীকে ছোট করা। কংগ্রেসের আত্মাই তো ছিলেন গান্ধীজি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকসভায় যোগ দিলেন তাজউদ্দীন। সূর্য একটু হেলে পড়লে গেলেন ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে খবরের কাগজের সন্ধানে। লোকে খবরের কাগজ কেনার জন্য দৌড়াচ্ছে, পত্রিকার হকারকে ঘিরে ধরছে চাক ঘিরে থাকা মৌমাছির মতো, মানুষের ওপর মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সিনেমা হলে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেনার জন্যও এত ভিড় হয় না। একের পায়ের নিচে চাপা পড়ছে অন্যজন। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবু চেষ্টা করছে খবরের কাগজের একটা টুকরা কেউ পেতে পারে কি না। সেখানে যদি পাওয়া যায় মানুষটার একটুখানি খবর? তাজউদ্দীন বিস্মিত,

ঢাকার লোক সত্যি মহাত্মাকে এত গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য মানুষের এত প্রতীক্ষা, এত আকুলতা তিনি আর কখনো দেখেননি। কাগজের দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বহুগুণ। তবু মানুষ কাগজ কিনতে চাচ্ছে। একজন মানুষের কপালে একটা কাগজ জুটছে না বলে ভাগ করে অনেকে মিলে একটা কাগজ কিনছে। দ্রুত সব কাগজ বিক্রি হয়ে গেল। তবু লোকেরা সরছে না। তারা কি আশা করে আছে পরের ট্রেনে কাগজ আসবে?

তাজউদ্দীনের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিনটির কথা। সেদিনও সংবাদপত্রের চাহিদা আর দাম এমনিভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তবু তাজউদ্দীন যাহোক একটা কাগজ জোগাড় করতে পেরেছিলেন গোটা। কিন্তু আজ পুরো কাগজ নয়।

তিনি বেরোলেন স্টেশন থেকে।

আজ পুরো শহরে হরতাল। কেউ ডাকেনি এই হরতাল, তবু পালিত হলো। এ এক অভাবিতপূর্ব দৃশ্য।

তাজউদ্দীন গেলেন নাজির লাইব্রেরিতে। অল ইন্ডিয়া রেডিও শুনলেন। মহাত্মার শেষকৃত্যের ধারাবিবরণী হচ্ছে।

ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে শোক মিছিল বেরিয়েছে। করোনেশন পার্কে হলো শোকসভা আর মৌন প্রার্থনা।

তাজউদ্দীনের মনে হচ্ছে, সূর্য অস্তমিত হলো। অস্ত গেল মানবতার পথের দিশারি আলোকবর্তিকা। তাহলে এর পরে কী? অন্ধকার। আলো এবং অন্ধকার। অন্ধকার এবং আলো। দিনের পরই তো আসে রাত। আর দিন আসে রাত্রির অন্ধকার তাড়াতেই।

এত অন্ধকার কেন চারদিকে? এই অন্ধকারের অবসান হবে না। অমাবস্যার পর আসে ক্ষীণ তনু চাঁদ। তারপর একসময় তো পূর্ণিমাও হয়। হতাশার শেষে আশা কি আসবে না? সংকটময় এই মুহূর্ত কি একদিন পরিণত হবে না বিস্মৃত অতীতে?

তিনি নিজেকে প্রবোধ দেন, জগৎ থেমে থাকে না। আশা-নিরাশার এই চক্র অনিঃশেষ ও অনিবার্য।

যে মানুষটির শোকে আজ তিনি মুহ্যমান, সে লোকটিও দীর্ঘ অমানিশা পেরিয়ে তবে পৌঁছেছিলেন আলোর দুয়ারে। তাঁকেও অন্ধকারে উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে আলোর অন্বেষণে! অথচ কী বিস্ময়, তিনি তো নিজেই ছিলেন আলোকবর্তিকা! আলোককে কি তুমি ধ্বংস করতে পারো! আলোক

কণিকা আমাদের থেকে বহুদূরে অবস্থান করতে পারে, কিন্তু তাতে কী! ধ্রুবতারা পৃথিবী থেকে কতদূরে, কিন্তু মরুভূমির পথহারা পথিককে সে ঠিকই পথ চিনিয়ে দেয়!

গান্ধীজির চোখের জ্যোতিকণাও এই পৃথিবীকে বহু শতাব্দীজুড়ে পথ চেনাবে। তাহলে আর বেদনা কেন? আমরা তাঁর ফেলে যাওয়া পায়ের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হব। তিনি শান্তি লাভ করুন। আমিন। তাজউদ্দীন নিজের মনে বলেন।

রেডিওতে শুনেছেন মহাত্মার শেষকৃত্যের ধারাবিবরণী। সেই সব কথা মনে হয়।

হঠাৎ মনে হলো, আজ দুদিন তিনি মাথার চুলে চিরুনি দেননি। তাঁর এই একটাই বিলাস। চুল আঁচড়ানো। হোক সামান্য, তবু এই তাঁর বিলাস। আজ তিনি গোসল করেননি। একবার, তাঁর মনে আছে, ১০ মহররমে মুখে স্নো মেখেছিলেন বলে মুসলিম লীগ অফিসে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন তাঁর এক সহকর্মী। সেদিন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, দুখের এমন প্রকাশে আমি বিশ্বাসী নই। কিন্তু এখন যে তিনি তার চেয়েও ঢের বেশি করছেন। দুদিন চুলও আঁচড়াচ্ছেন না!

২৮.

৬২ বছর বয়সী কুমিল্লা নিবাসী পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত করাচি শহরে নামলেন উড়োজাহাজ থেকে। করাচিতে এখন নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। পূর্ব বাংলার তুলনায় একটু ঠান্ডা। পূর্ব বাংলায় এখন ফাল্গুন এসে গেছে, চলছে বিখ্যাত বসন্তকাল। দীর্ঘদিন স্বদেশি আন্দোলন করেছিলেন, গান্ধীর ভক্ত ছিলেন, স্বদেশি করতে গিয়ে এই আইনজ্ঞ বারবার জেলে গেছেন। ১৯৩৭ সালে বাংলার সাধারণ আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে কুমিল্লা থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটার পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক কংগ্রেস নেতাই ভারতে চলে যান। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত করাচিতে প্রথম পাকিস্তানের

গণপরিষদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেদিন একটা অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যা-ই হোক না কেন, পাকিস্তান কখনোই এমন একটা ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত হবে না, যা কিনা ধর্মযাজকেরা পারলৌকিক মিশন নিয়ে শাসন করে থাকে। আমাদের আছে অনেক অমুসলিম—হিন্দু, খ্রিষ্টান, পারসি; কিন্তু তারা সবাই পাকিস্তানি। তারা অন্যদের মতো সমান অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে এবং পাকিস্তান বিষয়ে তাদের অধিকারপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পৃথিবীতে এখনো এমন রাষ্ট্র আছে, যেখানে কোনো একটা শ্রেণীর ওপর বৈষম্য ও বাধা আরোপ করা হয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, আমরা সেই যুগে আর নাই। আমরা শুরু করছি এমন একটা কালে, যখন কোনো বৈষম্য নাই, কোনো একটা সম্প্রদায়ের তুলনায় আরেকটা সম্প্রদায়কে আলাদা করা হয় না, বর্ণের কারণে, গোত্রের কারণে কারও প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় না। আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই মৌল নীতি অবলম্বন করে যে আমরা সবাই একটা রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সম-অধিকারসম্পন্ন নাগরিক।'

এই বক্তৃতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে আশ্বস্ত করেছে। তিনি আর পূর্ব বাংলা ত্যাগ করেননি।

তিনি আজ করাচি বিমানবন্দরে নেমেছেন গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যেই। কিন্তু কী বলবেন, এই বিষয়ে তাঁর বিশেষ একটা প্রস্তুতি আছে। তিনি এবার পার্লামেন্টে কথা বলবেন বাংলা ভাষার পক্ষে।

পূর্ব বাংলায় এরই মধ্যে বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, তিনি জানেন। জানেন যে এই দাবিতে ছাত্ররা মিছিল-মিটিং করছে, বুদ্ধিজীবীরা সভা করছেন, বহু বছর থেকেই পত্রপত্রিকায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে।

তিনি বাঙালিদের এই দাবির কথাই তুলে ধরবেন পার্লামেন্টে।

তিনি গণপরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলেন।

পার্লামেন্টে একটা বিধি প্রস্তাব করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, গণপরিষদে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির সঙ্গে উর্দুও বিবেচিত হবে।

এই প্রস্তাবে একটা ছোট্ট সংশোধনী দেওয়ার নোটিশ দিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দুদিন পর তাঁকে ফ্লোর দেওয়া হলো সংশোধনী উপস্থাপনের জন্য।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার, আমার সংশোধনী : ২৯ নম্বর বিধির ১ নম্বর উপবিধির ২ নম্বর লাইনে "ইংরেজি"

শব্দের পর "অথবা বাংলা" শব্দটি যুক্ত করা হোক।'

তিনি ব্যাপারটা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, 'আমি এই সংশোধনীটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার মানসিকতা থেকে উত্থাপন করিনি। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছয় কোটি নব্বই লাখ। এর মধ্যে চার কোটি ৪০ লাখ কথা বলে বাংলায়। তাহলে, স্যার, দেশের রাষ্ট্রভাষা কোনটি হওয়া বাঞ্ছনীয়!'

যে ভাষায় দেশের বেশির ভাগ লোক কথা বলে, নিশ্চয়ই সে ভাষাই হওয়া উচিত রাষ্ট্রভাষা বা লিংগুয়া ফ্রাংকা।

'আমি জানি, স্যার, ইংরেজি ভাষার একটা আন্তর্জাতিক সম্মানজনক স্থান আছে। কিন্তু, স্যার, ২৯ নম্বর বিধিতে যেখানে বলা হয়েছে, পরিষদের বিবরণী শুধু ইংরেজি অথবা উর্দুতে বিধিসম্মত হবে, সেখানে দেশের চার কোটি ৪০ লাখ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা কেন ২৯ নম্বর বিধির আওতায় একই ধরনের সম্মানজনক স্থান পাবে না?

'স্যার, এই জন্য আমি সারা দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মনোভাবের পক্ষে সোচ্চার হয়েছি। বাংলাকে একটা প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গণ্য করা যাবে না। এই বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য করতে হবে।'

পূর্ববঙ্গের সাধারণ সদস্য প্রেমহরি বর্মণ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন।

এরপর উঠলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। তিনি বললেন, 'পাকিস্তান একটা মুসলিম রাষ্ট্র এবং এ জন্য মুসলিম জাতির ভাষাকেই (উর্দু) এই রাষ্ট্রের লিংগুয়া ফ্রাংকা করতে হবে। ...কাজেই আমি এই সংশোধনী মেনে নিতে পারলাম না। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্যই হলো পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অন্তর্নিহিত শক্তি মুসলমানদের মধ্যে ইস্পাতকঠিন একতার সৃষ্টি করেছে, সেই শক্তিকে অপসারণ করা।'

পূর্ববঙ্গের আরেক সদস্য ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত দাঁড়িয়ে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেছে বেছে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা তিনি না করলেও পারতেন।'

খাজা নাজিম উদ্দিন, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বললেন, 'আমি নিশ্চিত, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী।'

পূর্ববঙ্গের শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র—এই কথাটা পরিষদের নেতার মুখে শোনার পর খুবই দুঃখ পেয়েছি। এত দিন

পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র, আর এই রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিমদের সমান অধিকার রয়েছে।'

পরিষদে সভাপতিত্ব করছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি প্রস্তাবটা কণ্ঠভোটে দিলে তা বাতিল হয়ে যায়। অথচ এই পরিষদে ৭৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪৪ জনই ছিলেন পূর্ব বাংলার।

বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এই খবর পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুতের বেগে।

ফাল্গুনের এই সকালটায় আকাশ ছিল উজ্জ্বল, রোদ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মাঠের ঘাসে, বাড়ির ছাদে, গাছের পাতায়। বাতাস ছিল মৃদুমন্দ। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে অন্য দিনের মতোই।

হঠাৎই দক্ষিণা সমীরণ বয়ে নিয়ে এল পশ্চিমের সংবাদ। করাচিতে গণপরিষদে বাংলাকে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি আরেকটা সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আর খাজা নাজিম উদ্দিন বলেছেন, পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষ বাংলা চায় না, চায় উর্দু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল আর কলেজ থেকে ছাত্ররা মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে আসতে লাগল।

মিছিল বড় হতে লাগল। তারা স্লোগান দিতে লাগল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। উর্দুঅলা বরবাদ'। মিছিল পুরো রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে এসে ঢুকল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। তমদ্দুন মজলিস ও তাঁদের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, যেটা এরই মধ্যে তাঁরা গঠন করেছেন, তার এক নম্বর ব্যক্তি অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে বসল প্রতিবাদ সভা। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নাইমুদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা গণপরিষদের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ উর্দুর পক্ষে, খাজা নাজিম উদ্দিনের এই বক্তব্যের জবাবে তাঁরা বললেন, শতকরা ৯৯ জন মানুষই বাংলার পক্ষে।

তাজউদ্দীন ব্যস্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে এক পৃষ্ঠার একটা প্রচারপত্র রচনায়। তাঁকে এটা করতে বলেছেন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নাইমুদ্দিন।

ছাত্রলীগ ব্যস্ত তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে এক হয়ে ১১ মার্চ ১৯৪৮ হরতাল কর্মসূচি প্রণয়নের কাজে। বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অফিশিয়াল ভাষার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মুদ্রা আর ডাকটিকিট বেরিয়েছে। তাতে বাংলা ভাষার জায়গা হয়নি। নৌবাহিনীর

ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় অংশগ্রহণের সুযোগ নাই। এসবের প্রতিবাদে এই হরতাল। সর্বত্র ছাত্রলীগ কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হলো, তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার জন্য।

শেখ মুজিব ব্যস্ত ছাত্রলীগের এই সব সাংগঠনিক কাজে।

এখন তাঁর হাতে একটা বিবৃতি।

মুজিব সেটা পড়ছেন। তাঁর পাশে আছেন তমদ্দুন মজলিসের নেতৃবৃন্দ আর ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

'তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির এক যুক্ত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট/ হরতাল ঘোষণা করা হয়েছে—...আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত দেশপ্রেমিক গণনেতা, ছাত্র ও যুবকর্মীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, ধর্মঘট/ হরতালকে সম্পূর্ণভাবে সফল করার জন্য যেন তাঁরা এখন থেকে প্রস্তুত হতে থাকেন।...আমরা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে আবেদন জানিয়ে বলি, ওঠো, জাগো, এই ষড়যন্ত্রকে তোমাদের নিজ শক্তিবলে চুরমার করে দাও। দেশব্যাপী এমন আন্দোলন গড়ে তোলো, যার ফলে বাংলাকে অবিলম্বে আমাদের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়।'

মুজিব চশমাটা খুলে পাঞ্জাবির কোনা দিয়ে মুছলেন। তারপর আবার পড়তে লাগলেন। পড়া শেষে তিনি স্বাক্ষর করলেন দ্বিতীয় স্থানে। ওপরের জায়গাটা তিনি ছেড়ে দিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেমের জন্য। তারপর স্বাক্ষর করলেন নাইমুদ্দিন আর আবদুর রহমান চৌধুরী।

পরের দিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটাকে সর্বদলীয় চেহারা দেওয়ার জন্য একটা সভা ডাকা হলো। কামরুদ্দীন আহমদ সভাপতি। তাজউদ্দীন তাতে যোগ দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছাত্ররাও এবার এতে যুক্ত হলেন। শুধু তমদ্দুন মজলিস আর ছাত্রলীগ নয়, এবার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটা সব দলের, সব মতের আন্দোলন হয়ে উঠল।

তাজউদ্দীন এইভাবে প্রতিটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিচ্ছেন। আবার রোজ সকালে, দুপুরে—যখনই সময় পাচ্ছেন, নিজের পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। এবার তিনি সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে প্রাইভেটে আইএ পরীক্ষা দেবেন। মাস দুয়েক আগে কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে ফরম ফিলআপ করে এসেছেন। সামনে তাঁর পরীক্ষা। তিনি পরীক্ষার পড়া করছেন, একই সঙ্গে ভাষা আন্দোলন, খাজা নাজিম উদ্দিন-

সরকারবিরোধী আন্দোলনও করছেন। সঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গণ-আজাদি লীগ বা পিপলস ফ্রিডম লীগটাকে গড়ে তোলার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন।

আগামীকাল হরতাল। মুজিবের রক্তের ভেতর অস্থিরতা। তিনি আন্দোলন-সংগ্রাম করা মানুষ। প্লেটোর মতো তাঁর চোখ আকাশের দিকে স্থির নয়, অ্যারিস্টটলের মতো তাঁর মুখ মাটির দিকে বাঁকানো—প্রায়ই বলেন কামরুদ্দীন আহমদ। ১০ মার্চ ফজলুল হক হলের প্রস্তুতি সভায় যোগ দিয়েছেন নেতারা। মুজিবও আছেন। সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়কসহ কয়েকজন নেতার মনে দ্বিধা। সরকার এরই মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা উচিত হবে কি হবে না।

হঠাৎ একটি জলদগম্ভীর কণ্ঠ বজ্রপাতের মতো আওয়াজ করে উঠল, 'আমরা অবশ্যই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করব। সরকার আমাদের দাবি মেনে নেয়নি। বরং একটা ন্যক্কারজনক বিবৃতি দিয়েছেন নাজিম উদ্দিন। স্পষ্ট করে বলেছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটা ভাষা হবে। এবং সেটা হবে উর্দু। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে উর্দু আর প্রদেশের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের ভাষাও হবে উর্দু। এই কথা আরও একবার বিবৃতি দিয়ে বলার পরেও কেন আমাদের মনে দ্বিধা? আগামীকাল ধর্মঘট হবে। পিকেটিং হবে। সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং করব আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ছাত্রনেতা অলি আহাদ। বললেন, 'আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি। সরকারের বিধিনিষেধ মেনে আন্দোলন হয় না। শেখ মুজিবের সঙ্গে আমিও থাকব সেক্রেটারিয়েটের গেটে পিকেটিং করতে।'

তোয়াহা, শওকত, শামসুল হক সমর্থন করলেন এই বক্তব্য।

এরপর দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। কে কোন জায়গায় পিকেটিংয়ের নেতৃত্ব দেবে, কাগজে লিখে তা টাঙিয়ে দেওয়া হয় দেয়ালে।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। বাড়ির ছাদের ওপর তখন কাকগুলো ডাকতে শুরু করেছে। বসন্তের ভোরে হাওয়া বইছে শরীর ও মনজুড়ানো। শত শত পুলিশ এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকার আমতলায় অবস্থান নেয়। তাদের পরনে হাফ প্যান্ট, হাতে বন্দুক, সচিবালয় ঘিরেও তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো।

নটার মধ্যেই ইডেন সেক্রেটারি ভবনের ১ নম্বর গেটে হাজির হলেন শেখ মুজিব, অলি আহাদসহ কয়েকজন। একটু পর সেখানে এলেন তরুণ

জননেতা শামসুল হকসহ বেশ কয়েকজন কর্মী। সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তখনো দপ্তরে আসতে শুরু করে নাই।

সিদ্ধান্ত হয়ে আছে, চার-পাঁচজনের একটা করে দল কর্মচারীদের সচিবালয়ে ঢুকতে নিষেধ করবে। তাদের যদি গ্রেপ্তার করা হয়, পরের দলটা এসে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়বে।

সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে কর্মচারীরা আসতে শুরু করল। শেখ মুজিব স্লোগান ধরলেন, 'রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই বাংলা চাই। আজকের হরতাল, সফল করুন, সফল করুন'।

সবাই মিলে মুজিবের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাল।

পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল।

লাঠি চালানোর নির্দেশ এল ওপর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে চলল নেতাদের গ্রেপ্তার করা। প্রথমে গ্রেপ্তার হলেন শামসুল হক। আর তাঁর গ্রুপের কর্মী কয়েকজন।

সচিবালয়ের গেটে এগিয়ে গেলেন শেখ মুজিব। আর সঙ্গের কর্মীরা এগোলেন। তাঁরা বাধা দিলেন কর্মকর্তাদের সচিবালয়ে ঢুকতে।

পুলিশ তাঁদেরও গ্রেপ্তার করল।

এবার এগিয়ে গেলেন অলি আহাদ ও তাঁর দল। পুলিশ মহা খাপ্পা। লাঠি চালাল হরতালকারীদের ওপর। অলি আহাদ লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন পথে। তাঁকে ওই অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে সকাল থেকেই বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সমবেত হচ্ছিল। ছাত্রীরাও এসেছিল দল বেঁধে। স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছিল তারা।

মেডিকেল কলেজ আর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেয় দলে দলে।

খণ্ড খণ্ড মিছিল মিলিত তৈরি করে এক বিশাল মিছিল। সেই মিছিলের নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক আবুল কাশেম।

মিছিল এগোতে থাকে সচিবালয়ের দিকে।

তাজউদ্দীন আহমদ ঘুম থেকে ওঠেন সকাল সকাল। সকাল সাতটার মধ্যে তিনি হাজির হন ফজলুল হক হলে। তোয়াহা আর তিনি যান রমনা ডাকঘরের সামনে পিকেটিং করতে। পুলিশের প্রহারে তোয়াহা মারাত্মক আহত হন। তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। তাজউদ্দীন গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম

হলেন। তিনটার পর বিক্ষোভকারীরা সবাই একে একে চলে গেলে তাজউদ্দীন গেলেন কেন্দ্রীয় কারাগার, কোতোয়ালি ও সূত্রাপুর থানা ও হাসপাতালে। আটককৃত ও আহতদের দেখতে।

সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম দলটা প্রবেশ করল। তারা সবাই লাঠ্যাহত। ফজলুল হক হলের কাওয়ালি পার্টি। মানে গান গায় দল বেঁধে, ভাষার জন্য মিছিলে যায়, কিন্তু খুব রাজনীতি করিয়ে কেউ নয়। জীবনে প্রথম কারাগারের অভ্যন্তর দর্শন। এই নিরীহ বিদ্যান্বেষীদের একটু কাতর করেছিল, যদিও তারা আগে থেকেই কাতরাচ্ছিল পুলিশের মৃদু লাঠিবর্ষণের বিপুল অভিঘাতে। পুলিশের তাড়া খেয়ে তারা ফজলুল হক হলের বিখ্যাত পুকুরে আশ্রয় খুঁজেছিল, কিন্তু মাতা পুকুর তাদের আগলে রাখতে পারেনি, পুলিশের ভ্যানে উঠতেই হলো অনেককে। সেখান থেকে যখন তাদের কেন্দ্রীয় খোঁয়াড়ে ঠেলা হলো, তারা মানল যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাগার প্রবেশের অমোচনীয় রেকর্ড তারা অর্জন করে ফেলেছে। তবু এই তরুণদের আর্তনাদ কমছিল না। দুপুরে তাদের জন্য বরাদ্দ হলো টিনের থালায় কিছু কাঁকর ও ফাঁকে ফাঁকে মোটা চালের ভাত, আর টিনের বালতি থেকে আহৃত এক হাতল করে অড়হড়ের ডাল। এর নামই বুঝি জেলের ভাত খাওয়া। ছেলেদের পিঠের মার পেটের ভাত বুঝি সইয়ে দেবে।

এমন সময় একটা বিরাট দল এসে ঢুকল স্লোগান দিতে দিতে। সেই স্লোগানের মূল কণ্ঠস্বর যাঁর, তাঁর নাম শেখ মুজিব। যেমন তাঁর গলা, তেমন তাঁর উচ্চতা। ছেলেরা এরই মধ্যে তাঁকে চিনে ফেলেছে। অনেকেই এরই মধ্যে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছে বসে দুই পাখি—ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি সারা দিনের ঘটনা নিয়ে কথা বলছিল।

নিচে পুরো চত্বরে তখন শত শত ইটপাটকেলের টুকরা। ছেলেদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে দফায় দফায়। তারই চিহ্ন বহন করে আছে এলাকাটা।

ব্যাঙ্গমা বলল, 'মুজিব তাঁর কাজ আর দিশা খুঁইজা পাইছে। আপসহীনতার এই পথই তাঁরে একদিন লইয়া যাইব তাঁর মঞ্জিলে।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'তাজউদ্দীনও গ্রেপ্তার এড়াইতে পারছে। এইটাই ইঙ্গিত দিতাছে ভবিষ্যতের।'

কেন্দ্রীয় কারাগারে ভাষা আন্দোলনবন্দীদের তৃতীয় রাত। শেখ মুজিব একটা সেলের মধ্যে একটা বিছানায় বসে কয়েকজন সহবন্দীর সঙ্গে কথা বলছেন। অপেশাদার ছাত্রবন্দীরা বসে আছে সারে সারে, ছোবড়ার তোশকে। এখন তাদের গোনা হবে। গুনতির পর বাতি নিভিয়ে দেওয়া হবে। গোনার দায়িত্ব পালন করছে কারাগারের এক নতুন কর্মচারী। তার পাশে দুই তিনজন সশস্ত্র প্রহরী।

ছেলেরা ভাবল, একটু মজা করা যাক।

এক কাতার গোনা শেষ হওয়ার পর সেই কাতার থেকে দু-চারজন চুপিসারে উঠে অন্য কাতারে গিয়ে-বসে। গোনা হয়, কিন্তু হিসাব মেলে না। আবার প্রথম থেকে গুনতে শুরু করে কর্মচারীটি। আবার একই দুষ্টুমি। অধৈর্য হয়ে একজন অবাঙালি সেপাই একটা অশ্লীল গালি দিয়ে বসল।

আর যায় কোথায়! অমনি ছাত্ররা উঠে ঘিরে ধরল তাকে।

তাদের হট্টগোলে বেশ সরগরম হয়ে উঠল ওয়ার্ডটা।

হকচকিত প্রহরীরা বাঁশি বাজিয়ে দিল। উঁচু প্রাচীরের ওপর থেকে বেজে উঠল পাগলাঘণ্টি।

পাগলাঘণ্টির বাজা মানে ভয়ংকর কিছু ঘটা।

দলে দলে পুলিশ রাইফেল বাগিয়ে আসতে লাগল, তারা সিঁড়ি দাপিয়ে উঠতে লাগল দোতলায়, যেখানে এই ভাষাবন্দীদের ওয়ার্ড। পুলিশদের বুটের আওয়াজে প্রকম্পিত জেলখানা।

শেখ মুজিব মুহূর্তেই তাঁর কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। তিনি চলে গেলেন ওয়ার্ডের গেটে। সঙ্গে দু-চারজন সঙ্গী। তিনি দুই হাত প্রসারিত করে গেট আগলে ধরে বললেন, ‘খবরদার, কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবা না। সব ঠিক আছে, যাও তোমাদের জেলারকে ডেকে আনো।’

রাইফেল বাগানো পুলিশ এসে রাইফেলের নল ধরল মুজিবের বুক বরাবর। তবু অকম্পিত মুজিব। অনড় তাঁর অবস্থান।

ছেলেরা এরই মধ্যে ভীতি-বিহ্বল জেল কর্মকর্তা আর সেপাইগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছে গেটের ওই পারে।

জেলার এলেন।

মুজিব বললেন, ‘সব ঠিক আছে, ওদের নিয়ে যান।’

এতগুলো ছেলে সেদিন বেঁচে গেল নিশ্চিত প্রলয়ের হাত থেকে।

১১ মার্চ ধরা হয়েছিল মুজিবকে। ১৫ তারিখেই ছেড়ে দেওয়া হলো। কারণ, এর পর প্রতিদিন ধর্মঘট চলছিল সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে। প্রতিদিন ছেলেরা মিছিল বের করছিল, স্লোগানে স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সারা দেশের আকাশ-বাতাস। প্রতিদিনই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছিল ছাত্রদের। আহতদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। রাস্তাঘাট হয়ে পড়ছিল অচল, জীবনযাত্রা ব্যাহত। শাহ আজিজপন্থী ও উর্দুঅলা গুন্ডারা আক্রমণ করছিল বিক্ষোভকারীদের, কিন্তু রাজপথে প্রতিদিন যুক্ত হচ্ছিল নতুন নতুন মুখ, জলের কাতারে যুক্ত হচ্ছিল যেন জল, বন্যার বিপদাশঙ্কায় কাঁপছিল শাসকেরা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্র গ্রেপ্তার অব্যাহত ছিল। এর প্রতিবাদে এসএম হল সংসদের সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে একটা সভাও অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সামনেই, কয়েক দিন পর, কায়েদে আজম আসবেন ঢাকায়। তাঁর আগমনের প্রাক্কালে ঢাকা শহর অশান্ত হয়ে থাকুক, তা চাচ্ছিলেন না খাজা নাজিম উদ্দিন। তিনি তাই বারবার বার্তা পাঠাচ্ছিলেন কামরুদ্দীন সাহেবকে, আবুল কাশেমকে, একটা আপস-মীমাংসায় পৌঁছাতে। তিনি আশ্বাসও দিয়েছিলেন, বিক্ষোভকারীদের সব দাবি মেনে নেওয়া হবে।

নেতারা গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে। ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ভাষা আন্দোলনের সব বন্দীকে মুক্তি দেওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার, পুলিশি অত্যাচারের তদন্ত, প্রদেশে সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলার ব্যবহার শুরু করা, আর কেন্দ্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপন, ভাষাকর্মীরা দেশশত্রু নয় বলে নাজিম উদ্দিনের স্বীকারোক্তি—এই সব ছিল সেই চুক্তিতে। চুক্তির এই সব দফা নিয়ে কারাগারে গেলে আবুল কাশেম ও কামরুদ্দীন, শেখ মুজিব আর অলি আহাদকে দেখানো হলো সেসব। তাঁরা অনুমতি দিলেন। সে রাতেই ভাষাবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

রাতের বেলায় মুজিব যোগাযোগ করলেন মুসলিম লীগের বিরোধী এমএলএদের সঙ্গে। তাঁরা বললেন, 'তোমরা কাল আসো, কাল আমরা খাজার গদি উল্টে দেব।'

পরের দিনই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গেলেন মুজিব। বেলতলায় অনুষ্ঠিত হলো এক ছাত্রসভা, তাতে তিনি সভাপতিত্ব করলেন এবং বললেন, 'চুক্তিতে অসামঞ্জস্য আছে, যেমন পুলিশি নির্যাতনের তদন্ত

সরকার বা পুলিশ করলে চলবে না, করাতে হবে নিরপেক্ষ কাউকে দিয়ে,' বললেন, 'বাংলার গণপরিষদ সদস্যদের অঙ্গীকার করতে হবে যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব যদি গণপরিষদে পাস করাতে তাঁরা না পারেন, তাহলে তাঁরা পদত্যাগ করবেন। এই প্রতিশ্রুতি এখনই আদায় করতে হবে, চলুন, এখন আমরা পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ঘেরাও করি।' মিছিল তাঁর বক্তৃতায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। জঙ্গি মিছিল ছুটল এসএম হলের কাছেই যে আইন পরিষদ ভবন, সেই দিকে। বিক্ষোভকারীরা ভবনের গেটে তালা দিল, এমএলএদের 'ধর ধর' বলে তাড়া করল।

'তবে আরেকটা ঘটনা ঘটছে,' ব্যাঙ্গমা বলল, 'ক্যান্টনমেন্ট থাইকা জিওসি আইছিল আইন পরিষদ ভবনে, এই আর্মি অফিসারের নাম আইয়ুব খান। তারেও তুমি মনে রাইখো।'

'তুমি রাখো, আমার আরও কাম আছে।' ব্যাঙ্গমি মুখ ফেরায়।

'কাজ না কাম?' ব্যাঙ্গমা দুষ্টু হাসি দেয়।

ব্যাঙ্গমি বলে, 'খালি বদমাইশি, আইয়ুব খান আইছেন, কারণ, খাজা তারে ডাইকা আনছেন, বলছেন, ফজলুল হক ছাত্র লেলায়া দিছে, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যদি সরকারের ওপর থাইকা সমর্থন প্রত্যাহার করে, তাইলেই খাজা সরকারের পতন আর ওই দিকে ছাত্ররাও তার আইন পরিষদ ভবন ঘেরাও কইরা রাখছে, আইয়ুব খান আর্মির একটা কোম্পানি রেডি কইরা রাখলেন মেজর পীরজাদার আন্ডারে, তারপর খাজারে কইলেন আপনি বাড়ি যান, খাজা কয় আমি জরুরি ভাষণ দিতেছি। আইয়ুব খান কয়, আরে রাখেন মিয়া মিটিং, আগে বাঁচেন, খাজারে পাকঘরের ভিতর দিয়া গাড়িতে তুইলা তিনি পার করেন। পুলিশরে তিনি কন, তোমরা অ্যাকশন লও না কেন। ছাত্রগুলানরে পিটায়া তুইলা দেও। পুলিশ কয়, লিখিত অর্ডার দেওন লাগব, মুখের অর্ডারে পিটন দিব, কাইলকা তদন্ত কমিটি করা হইব পুলিশের বাড়াবাড়ি নিয়া। তখন আইয়ুব খান মোহাম্মদ আলী বগুড়া নামের এমএলএরে কয়, ওই মিয়া, গুলি খাইতে চান? বুলেট লাগব, যান, বাড়ি যান। বগুড়া বাড়ি না গিয়া গেছে খাজার কাছে, আমারে আর্মি দিয়া ভয় দেখাও, আমি সাপোর্ট উইথড্র করলাম।'

'খাজা আইয়ুব খানরে কইব, ওই মিয়া দিলা আমারে উল্টায়া। আইয়ুব খান মোহাম্মদ আলীরে জড়ায়া ধইরা কইব, বগুড়া সাব, আপনি ইয়ারকিও বুঝেন না।'

পুলিশ অ্যাকশনে চলে গেল। লাঠিচার্জ হলো। গুলিও হলো। আহত হলো অনেক ছাত্র। কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পুরো এলাকা। একসময় ছাত্ররা রণে ভঙ্গ দিল।

একদিন পরে 'কায়েদে আজম' আসছেন এই শহরে। শামসুল হকের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করে জিন্নাহকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর কাছেই দাবি-দাওয়া পেশ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

২৯.

সে দিন বিকেলে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। ঘণ্টা আধেকের বৃষ্টি তছনছ করে দিল কায়েদে আজমের জন্য ঢাকার রাস্তায় ঝুলানো তোরণগুলো। ভিজিয়ে দিল খাজার জড়ো করা পথের দুপাশে দাঁড়ানো নিরীহ জনতাকে। বৃষ্টি থামলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে করাচি থেকে বহন করে নিয়ে আসা বিশেষ উড়োজাহাজটা অবতরণ করল। তিনি নামলেন তেজগাঁও বিমানবন্দরে। আকাশ পরিষ্কার, তিনি বাতাসে জলকণার গন্ধ পেলেন। জলজংলার দেশ, জিন্নাহ ভাবিলেন।

এরই মধ্যে বিমানবন্দরকে তটস্থ করে মারছে গভর্নর জেনারেলের নিরাপত্তারক্ষীরা। তারা কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না মুসলিম লীগ আর মুসলিম ছাত্রলীগ নেতাদের। এমনকি এমএলএরাও ধাওয়া খাচ্ছে নিরাপত্তারক্ষীদের। কিন্তু নেতারা হতাশ হয়ে দেখলেন, মুখ্য সচিব আজিজ আহমদের নেতৃত্বে আমলারা সবাই ঠিকই স্যুট-প্যান্ট-টাই পরে আর দুই পাটি দাঁত কেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাত বাড়িয়ে। তারাই অভ্যর্থনা জানাবে এই মহান নেতাকে। মুসলিম লীগ করলাম আমরা, পাকিস্তান বানালাম আমরা, আর জাতির জনকের কাছেও ঘেঁষতে পারছি না, তাকে ভালোবাসার জন্য বুক পেতে দেব বলে এসে ঘাড়ে ধাক্কা খাচ্ছি রক্ষীদের। হায় আল্লাহ, তুমি মোমেনদের আর কত ইমানের পরীক্ষা নেবে!

জিন্নাহ বেরোলেন আজিজ সমভিব্যাহারে, উঠলেন গাড়িবহরে। দেখতে পেলেন দুধারের জনতার মাথাগুলো ভিজে আছে কাকের মতো,

কাপড়চোপড়ও ভেজা। জিন্নাহ জিজ্ঞেস করলেন আজিজকে, 'লোকগুলো সব ভেজা কেন?'

আজিজ বললেন, 'বৃষ্টি এই দেশে রহমতের লক্ষণ। আপনি এসেছেন, আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে।'

গাড়িবহর চলল সচিবের বাসার দিকে, মিন্টো রোড হেয়ার রোড এলাকায়।

তাজউদ্দীন, শেখ মুজিবসহ কয়েকজন ছাত্রকর্মী সেই বিকেলে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে।

তাজউদ্দীন আর নাইমুদ্দিন গেলেন হেয়ার রোডে, পাশ দিয়ে আনুষ্ঠানিক মোটর শোভাবহরে গেলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তাজউদ্দীন খেয়াল করলেন, সরকার বিপুল মানুষের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করলেও মানুষের মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস নাই। কেউ নেতার নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না। মাত্র দুদিন আগেই ভাষার প্রশ্নে এত বড় আন্দোলন হয়ে গেল। এরপর উচ্ছ্বাস অবশ্য না থাকাই স্বাভাবিক।

আজিজ আহমদ ঠিক বলেন নাই। জিন্নাহ বাংলার জন্য রহমত নিয়ে আসেন নাই। তিনি এনেছেন পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজ।

রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিতে উঠেছেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। সাদা কোট, সাদা প্যান্ট। গলায় টাই। মাথায় সাদাকালো ছোপ ছোট মোটা কাপড়ের কিস্তি টুপি। জনসভায় বিপুল লোকসমাগম হয়েছে।

জিন্নাহ বক্তব্য দিচ্ছেন খুবই দৃঢ়কণ্ঠে। জানিয়ে দিলেন, 'প্রদেশের ভাষা কী হবে, তা প্রদেশ ঠিক করবে, কিন্তু কেন্দ্রের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং একমাত্র উর্দু। পাকিস্তানের শত্রুদের পাল্লায় পড়বেন না। আপনাদের মধ্যে পঞ্চম বাহিনী ঢুকে পড়েছে। আমরা পাকিস্তানের শত্রুদের সহ্য করব না। আমরা ঘরের শত্রুদের সহ্য করব না।' স্পষ্ট ইংরেজিতে জানিয়ে দিলেন জিন্নাহ।

তমদ্দুন মজলিস আর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ছেলেরা মঞ্চের পেছনের এক কোনা থেকে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবাদ ঠিক জমে উঠল না।

সবাই খুবই মন খারাপ করে ফিরলেন জনসভা থেকে। তাজউদ্দীন আহমদ ভাবছেন, 'লোকটা তো আমাদের দেশের শত্রু বলে আখ্যায়িত করল সরাসরি। আশ্চর্য তো! এই লোকটাও তাঁর দলের ওপরে উঠতে পারল না! 'উর্দুর বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে, তারা পাকিস্তানের শত্রু,

তাদের ক্ষমা নাই।' তাজউদ্দীন এই কথা শুনছেন আর রেসকোর্স ময়দানের কাদায় তাঁর এক পায়ের স্যান্ডেল ডুবে গেছে টের পেয়ে তিনি সেটা বের করার জন্য পা চালালেন, প্রথম দফায় ব্যর্থ হয়ে তাঁর মুখ দিয়ে অলক্ষে বেরিয়ে গেল, 'দূর ছাই, জুতা।' পাশের লোক উৎসাহিত বোধ করে বলল, জুতা জুতা...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন হচ্ছে কার্জন হলে। স্নাতকরা সেখানে উপস্থিত। জিন্নাহ তাঁর ভাষণে বললেন, 'উর্দু অ্যান্ড উর্দু শ্যাল বি দি অনলি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান।' ছাত্ররা 'নো' 'নো' বলে চিৎকার করে উঠল।

জিন্নাহ এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর আবার তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন।

তাজউদ্দীন গেছেন জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করতে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জিন্নাহ বসতে চেয়েছেন। অধ্যাপক আবুল কাশেম, শামসুল হক, নাইমুদ্দিন আহমেদ, কামরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহাও আছেন দলে। এটা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিব আজিজ আহমদ সাহেবের সরকারি বাসভবন। বাড়িটা মিন্টো রোডে। ঢোকার আগে শরীর তল্লাশি করল নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁরা করিডর পেরিয়ে বৈঠকখানার দিকে যাচ্ছেন। দেশ গরিব হলেও বাড়িটায় দারিদ্র্য নয় বরং সৌকর্যের চিহ্ন। আশ্চর্য এই রকম প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকেন মুখ্য সচিব! আর তাঁরই হাত দিয়ে চলে দেশ। এ নিশ্চয়ই সরল সোজা লোক খাজা নাজিম উদ্দিনকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।

জিন্নাহ পরে আছেন সাদা কাবুলি আর সালোয়ার। একটা কাঠের গোল চেয়ারে তিনি বসে। তাঁর পাশে আজিজ আহমদ। আর মিলিটারি সেক্রেটারি। সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিরা বসেছেন তাঁর মুখোমুখি, একটা টানা চেয়ারে। তাঁদের সামনে একটা ছোট টেবিল। টেবিলে টেবিল ক্লথ। কায়েদে আজম কথা বলছেন আঙুল উঁচিয়ে।

জিন্নাহ বললেন, 'একাধিক রাষ্ট্রভাষা দেশের সংহতি বিনষ্ট করবে।'

কামরুদ্দীন আহমদ বললেন, 'সুইজারল্যান্ড, কানাডায় একাধিক রাষ্ট্রভাষা আছে। তা তাদের সংহতি বাড়িয়েছে।'

কায়েদে আজম অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'আমি ইতিহাস জানি,

আমাকে ইতিহাস শেখাতে এসো না। পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে দরকার হলে তোমাদের মাতৃভাষা বদল করতে হবে।'

তাজউদ্দীন আহমদ বিস্মিত। প্রতিনিধিরা হতবাক। এই লোক বলে কী?

অলি আহাদ বললেন, 'এক ভাষা হলেই এক জাতি হয় না। ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার ভাষাও এক, ধর্মও এক, ওরা এক জাতি নয়। আরবরা সবাই একই ভাষায় কথা বলে, সবার ধর্মও এক, কিন্তু তাহলে জাতি কেন এতগুলো?'

নামাজের আজান দিয়েছে। শামসুল হক সাহেব বললেন, 'স্যার, নামাজের সময় হয়ে গেছে।'

আলোচনা তবু চলছে।

কায়েদে আজম আলোচনা করেই যাচ্ছেন।

শামসুল হক আবার বললেন, 'স্যার, নামাজের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

কায়েদে আজম বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'তোমার নামাজের সময় হয়ে গেলে তুমি বাইরে যাও, আর নামাজ পড়ে আসো। আমাদের বিরক্ত করছ কেন।'

আলাপ আর তেমন জমল না। শামসুল হকের দিকে আঙুল তুলে তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে চিনি।'

চেনারই কথা। দিল্লিতে মুসলিম লীগের যে কাউন্সিলে লাহোর প্রস্তাবের একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কথাটা সংশোধন করে একটা মুসলিম রাষ্ট্র বানানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, আবুল হাশিম সাহেবের সঙ্গে মিলে শামসুল হক তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

বিদায়ের আগে প্রতিনিধিরা তাঁদের স্মারকলিপিটা দিয়ে এলেন কায়েদে আজমের হাতে। তাতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অখণ্ডনীয় সব যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে।

কায়েদে আজম সেটা পড়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করলেন না।

জিন্নাহর জাদুকরি ব্যক্তিত্ব পূর্ব বাংলার ওপরও ক্রিয়াশীল বলেই মনে হলো। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলার আইনসভায় বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা, আদালতের ভাষা আর শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব গৃহীত হলো।

কিন্তু কেন্দ্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিটা ওই মুহূর্তে চাপা পড়ে

গেল। খাজা নাজিম উদ্দিন বললেন, কায়েদে আজম, যাঁকে জাতির পিতা বলা যায়, তিনি বলে গেছেন উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। এরপর আর কথা বলা মানে তাঁকে অসম্মান করা।

খাজা দায়িত্ব চাপালেন জিন্নাহর ওপর। জিন্নাহ মৃত্যুর আগে যক্ষ্মারোগে ভুগতে ভুগতে তাঁর চিকিৎসকের কাছে বলেছিলেন, 'পূর্ব বাংলার নেতারা তো আমাকে বলেছিলেন ওই প্রদেশের সবাই উর্দু জানে। ফজলুর রহমান আর খাজা নাজিম উদ্দিন আমাকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল।'

সেই বিভ্রান্তি আর দূর হয়নি। যক্ষ্মার চিকিৎসা হয়নি ঠিকমতো।

ওই সময় জিন্নাহর নির্দেশে বলিয়াদি ভবনে বিরোধী দলের যে এমএলএরা একত্র হয়েছিলেন মুজিব-তাজউদ্দীন-কামরুদ্দীন সাহেবদের সঙ্গে, খাজা তাঁদের টোপ গেলাতে পারলেন। মোহাম্মদ আলী বগুড়া হলেন বার্মার রাষ্ট্রদূত। আরও দুজনকে লোভনীয় পদ দেওয়া হলো।

আন্দোলন মিইয়ে গেল তখনকার মতো।

জিন্নাহ মারাই গেলেন।

জিন্নাহ মারা গেলেন। আহা! কী ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। নিজের মেয়েকে পর্যন্ত কাছে ভিড়তে দিতেন না। একবার জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে ধরে মেয়েটি বাবার কাছে আসে। জিন্নাহ নির্দিষ্ট সময়ে বৈঠকখানায় আসেন, নিজের আসনে বসেন। মেয়েটি তাঁর বিপরীতে বসে কাঁদতে লাগল। জিন্নাহ একটা কথাও বললেন না।

এক মিনিট পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে গেলেন।

জিন্নাহর যক্ষ্মা হয়েছিল। সেটা তিনি গোপন করে রেখেছিলেন। এবং তাঁর চিকিৎসাও ঠিকমতো হয়নি।

সবাই জানত, লোকটা মরে যাচ্ছে। বেলুচিস্তানের কোয়েটা শহরের এক নির্জন গৃহে তিনি একাকী জীবন যাপন করতেন। যে লোকটা মরেই যাবে, তা-ও তখনকার দিনে শিয়োর স্যাকসেস রোগ যক্ষ্মায়, কে তার কাছে ভিড়বে। তাঁর সঙ্গীরা তখন ব্যস্ত তাঁর অবর্তমানে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠার দৌড়ে। পাকিস্তানের জাতির জনক মরে পড়ে রইলেন, তাঁর কফিন পড়ে রইল করাচির দ্রিঘ রোড সামরিক বিমানবন্দরে। তাঁর লাশটা পাহারা দেওয়ার মতোও তখন কেউ ছিল না। সেপ্টেম্বর '৪৮-এর প্রচণ্ড গরমে আত্মাহীন দেহটা সেদ্ধ হতে লাগল।

ঢাকায় শাহ আজিজ গ্রুপের মুসলিম ছাত্রলীগারদের শোক পরিণত হলো শক্তিতে। শক্তি গিয়ে আছড়ে পড়ল কমিউনিস্টদের ওপর। এসএম হলে মুনীর চৌধুরীকে আক্রমণ করল তারা, তেমনি রুমে রুমে খুঁজতে লাগল—কোথায় কমিউনিস্ট।

যেন মহান কায়েদে আজমের মৃত্যুর জন্য যক্ষ্মার জীবাণু নয়, নয় তাঁর চিকিৎসায় সরকারের অবহেলা, দায়ী মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলসের ভূত।

এক মাঘে শীত যায় না।

চার বছর পর আরেকটা মাঘ এল, মাঘের শেষে এল ফাল্গুন, আটই ফাল্গুন। সেটা আরেকটু পরের কথা।

৩০.

আইএ পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে। একটা ছেলে সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে স্ট্যান্ড করেছে। ফোর্থ স্ট্যান্ড। তবে ছেলেটা পরীক্ষা দিয়েছে প্রাইভেটে। হোক প্রাইভেটে। তবু তো আমার কলেজ। কলেজের অধ্যক্ষ খুশিতে আটখানা। তিনি হাঁক পাড়লেন, 'এই, কে আছো, এই ছেলেকে খুঁজে বের করো। তাজউদ্দীন আহমদ।'

কলেজের ক্লার্ক তাঁকে চিনতেন। যেদিন সে ফরম ফিলআপ করতে আসে, সেদিনও তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। তারা দুজনে হেঁটে হেঁটে জেলগেট পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

ক্লার্ক সাহেব পিয়নকে বোঝালেন। 'যাও, একে খুঁজে বের করা কোনো কঠিন কাজ না। ১৫০ মোগলটুলীতে মুসলিম লীগ অফিসে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে। বিখ্যাত ছেলে। কায়েদে আজমের সঙ্গে মিটিং করে। খাজার সঙ্গে তো করেই। তবে আসলে ছেলে সরকারবিরোধী। ওই লীগ অফিসে গেলেই তার ঠিকানা পাওয়া যাবে।'

লীগ অফিসে গেল পিয়ন ওয়াহিদ। সাইকেল চালিয়ে। তাজউদ্দীন তখন সেখানে ছিলেন না। মেসের ঠিকানাও পাওয়া গেল।

পিয়ন তাঁর মেসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তাজউদ্দীন এলেন বেশ রাতে। তখন ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে। সাইকেলে এলেন তিনি, বৃষ্টিতে ভিজে সমস্ত শরীর থেকে পানি ঝরছে। বাড়ির বারান্দায় একজন লোক দাঁড়িয়ে। বিদ্যুৎ চমকালে তাঁকে দেখা গেল।

তাজউদ্দীন বললেন, 'আপনি কী করছেন এখানে?'

লোকটা বলল, 'আমি, আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি।'

'কাকে?'

'তাজউদ্দীন।'

'কেন খুঁজতে এসেছেন?' তাজউদ্দীন আগে জানতে চান পরিস্থিতি। ইদানীং তাঁদের নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। পুলিশের লোক, নাকি গুপ্তচর?

লোকটি বলল, 'আমি কলেজ থাইকা আসছি। আপনাগো আইএ পরীক্ষার রেজাল্ট হইছে।'

তাজউদ্দীনের মাথা থেকে পানি ঝরছে চুল বেয়ে। সাইকেলটা তিনি বারান্দায় তুলেছেন। সাইকেল থেকেও পানি গড়াচ্ছে।
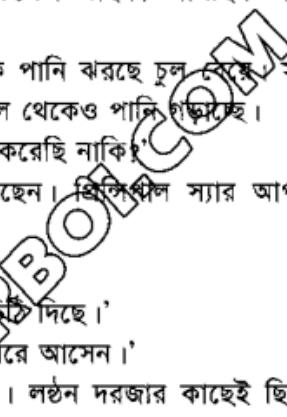
'তাই নাকি? খুব খারাপ করেছি নাকি?'

'আপনে খুব ভালো করছেন। প্রিন্সিপাল স্যার আপনাকে কাইলকা যাইতে কইছে।'

'খুব ভালো মানে কী?'

'ক্লার্ক স্যারে আপনারে চিঠি দিছে।'

'আচ্ছা, আপনি আমার ঘরে আসেন।'
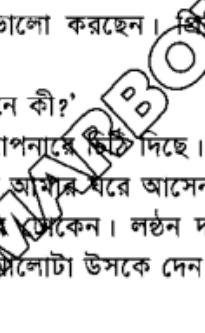
তাজউদ্দীন ঘরে ঢোকেন। লণ্ঠন দরজার কাছেই ছিল। সেটা ভেজা হাতে তুলে নিয়ে আলোটা উসকে দেন।

'বসেন।'

'না, বসুম না।'

'আরে, যাবেন কীভাবে। বৃষ্টি কমুক। আসেন এক সাথে ভাত খাই। তারপর যান।'

তাজউদ্দীন গামছা টেনে নিয়ে মাথা মোছেন। হাত মোছেন। তারপর চিঠিটা লণ্ঠনের কাছে নিয়ে গিয়ে মেলে ধরেন।

'কংগ্রাচুলেশন্স। ইউ হ্যাভ স্টুড ফোর্থ ইন দ্য কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট।'

তাজউদ্দীন আহমদ নির্লিপ্ত। তাঁর হাত কপালের চুল থেকে পানি ঝরে হাতের কাগজ ভিজে যায়।

৩১.

রিকশা চলছে। রাস্তা অসমান। টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে। একটু একটু ঝাঁকি লাগছে। শেখ মুজিবের সেই দিকে খেয়াল নাই। তিনি দেখছেন, পুরো ঢাকা শহর—মোগলটুলী থেকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল—চাঁদের আলোয় ডুবে আছে। রেসকোর্স ময়দান, রমনার গাছগাছালি, গভর্নর হাউস, ঢাকা ক্লাব, আর অ্যাসেম্বলি ভবন—সবকিছুকেই নিমগ্ন করল এই চাঁদের আলো।

শেখ মুজিবের উদাস উদাস লাগে। রিকশা হলের সামনে আসে। তিনি রিকশাঅলার হাতে একটা আধুলি দিয়ে ফিরে না তাকিয়ে হাঁটতে থাকেন। রিকশাঅলা ভাংতি পয়সা বের করে দেখে সাহেব অনেক দূরে চলে গেছেন।

এটা কি একটা হল, নাকি কোনো স্বপ্নমহল!

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলটি খুবই সুন্দর। স্যার আর এন মুখার্জি ব্যক্তিগতভাবে তদারক করতেন, মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি এই হলটির স্থাপত্য নকশা ও নির্মাণকাজ সমাধা করেছে। মাথার ওপর মায়াবী রঙের বড় বড় মিনার, লম্বা বারান্দায় সুদৃশ্য খিলান, সামনে টেনিস খেলার তিনটা লন। এর চেয়ে সুন্দর ভবন ঢাকায় আর আছে কি না সন্দেহ। কার্জন হল কিংবা হাইকোর্ট ভবনও এত দৃষ্টিনন্দন নয়।

চাঁদের আলোয় বিভ্রান্ত শেখ মুজিবের প্রত্যয় হয়!

১৬ নম্বর রুমটির দিকে হাঁটেন শেখ মুজিব।

বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজের স্যান্ডেলের আওয়াজ লম্বা করিডর বেয়ে দূরে দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে শেখ মুজিবের কানে।

আস্তে করে রুমের দরজা ঠেললেন মুজিব।

গাজীউল হক শুয়ে আছেন তাঁর বিছানায়।

পাশের বিছানাটা আলী আশরাফের। তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন। এই সুযোগে সেই বিছানায় রাত্রি যাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিবের হাতে একটা ওষুধের শিশি। ড. করিম এই ওষুধ তাঁকে দিয়েছেন। মুজিবের শোয়া-খাওয়া কোনো কিছুর স্থিরতা নাই। এর ফলটা দাঁড়িয়েছে, ইদানীং কনুইয়ের উল্টো দিকে, হাঁটুর নিচে ভীষণ চুলকায়। এই ওষুধটা লাগাতে বলেছেন ডাক্তার সাহেব।

রুমে ঢুকে ওষুধের শিশিটা নিয়ে তিনি বিছানার দিকে তাকিয়ে আবার বিভ্রান্ত বোধ করেন।

খোলা জানালা দিয়ে একটা চারকোনা আলো এসে পড়েছে আলী আশরাফের বিছানায়। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন, মোগলটুলী থেকে যে চাঁদটা তাঁকে অনুসরণ করে আসছে, সেটি ঠিকই বিড়ালের মতো চুপি চুপি এসে তাঁর বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে।

'মুজিব ভাই, আসলেন?' গাজীউল বললেন।

'কী গাজী, তুমি ঘুমাও নাই?'

'না, মুজিব ভাই। আপনি বাতি জ্বালান।'

মুজিব এতক্ষণ বাতি জ্বালাচ্ছিলেন না, গাজী সেটা লক্ষ করেছেন।

মুজিব বললেন, 'সারা দিন পরিশ্রম করো, ক্লাস করো, আবার মিটিং-মিছিলও করো, তোমার তো ঘুমানো দরকার।'

গাজী বললেন, 'আপনার তুলনায় আমার পরিশ্রম কোনো পরিশ্রমই না, মুজিব ভাই। সকালে শুরু করেন মিছিল-মিটিং। কোথায় শোন, কোথায় ঘুমান, কী খান না খান, কোনো কিছুর ঠিক নাই। এখন একটু ভালো বিছানা পাইছেন। আপনি একটু শান্তিমতো ঘুমান। আপনার শরীরের অবস্থা যে ভালো না।'

'আরে মিয়া, ঘুম হয় নাকি। দেখো না কী রকম চুলকানি হয়েছে!'

'চুলকানির ওষুধ দিছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। ডাক্তারের কাছে গেছলাম। সেখান থেকে আনলাম। এখন একটু ওষুধ লাগাই।'

মুজিব ওষুধের শিশির মুখটা মোচড় দিয়ে খুললেন। আধা তরল সাদা ওষুধটা হাতে নিয়ে যথাস্থানে লাগালেন।

শিশির মুখ খুললেন, যেন ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আলাউদ্দিনের ভয়ংকর এক দৈত্য, যে দৈত্যের নাম দুর্গন্ধ।

'বাপ রে, কী গন্ধ! কুইনিন জ্বর সারাবে, তবে কুইনিন সারাবে কে?' মুজিব বললেন।

গাজী নাকের কাছে একটা কাঁথা ধরলেন। সত্যি ভীষণ বদ গন্ধ।

মুজিব বাইরের কাপড় ছাড়ার জন্য লুঙ্গি হাতে নেন।

তারপর আবার বাতির সুইচটা টিপে ঘরটা অন্ধকার করেন।

আবারও একটা চারকোনা জ্যোৎস্নাখণ্ড অধিকার করে নেয় জানালার ধারের শূন্য বিছানাটি।

মুজিব ডাকেন, 'গাজী, এই দিকে আসো।'

গাজীউল বুঝতে পারেন না ঠিক কোথায় যেতে বলা হচ্ছে।

'আসো না। আমার কাছে আসো। একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।'

'কী জিনিস?'

'আমার বিছানায় এসে বসো। তাইলেই কেবল দেখা যাবে। আসো।'

গাজীউল কাছে গেলেন মুজিবের। রাসায়নিকের গন্ধটা আবার একটা ধাক্কা মারল গাজীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে।

এক হাত বিছানায়, আরেক হাত উঁচিয়ে শেখ মুজিব দেখাতে লাগলেন জানালার বাইরে, 'ওই দেখো।'

'কী?'

'চাঁদ। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। পৃথিবীতে চাঁদের আলোর চেয়ে সুন্দর আর কী আছে, বলো তো?'

চাঁদের আলোয় মুজিব ভাইয়ের মুখখানা অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে। গাজীউলের মনে হচ্ছে, এই দৃশ্য কি সত্যি হতে পারে? এই কথামালা?

এই লোকটা সারাটা দিন খাজা নাজিম উদ্দিন সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। একটার পর একটা ইস্যু খুঁজে বের করছেন। প্রতিদিনই মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়া চাই তাঁর। এর মধ্যে জেলখানার অভিজ্ঞতাও তাঁর কম হয়নি। সর্বক্ষণ তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছে মুসলিম লীগ সরকার। তিনি কিনা এইখানে, সলিমুল্লাহ হলের ১৬ নম্বর কক্ষে শুয়ে আকাশের চাঁদ দেখছেন!

ঘরে তো কোনো ফুলের ঘ্রাণও নাই, যা আছে তা চর্মরোগের ওষুধের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ।

'মুজিব ভাই, আমি ঠিক ধরতে পারছি না কোনটা সত্য—চাঁদের আলো, নাকি এই চুলকানির ওষুধের ঝাঁঝ!' গাজী হেসে বললেন।

'খাজার শাসনে দুইটাই সত্য, গাজী। তোমাকে চুলকানির ওষুধও দিতে হবে, আবার চাঁদের আলোও উপভোগ করতে হবে।'

হেথায় ওঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।

আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।'

শেখ মুজিব, ২২ বছরের শুকনো পটকা গাজীউলের চেয়ে বছর সাতেকের বড়। অত্যন্ত সুদর্শন। তাঁর গলাটাও ভারি চমৎকার। বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে সেটাকে খোলসা করে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলীলায় মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন।

গাজী বিস্মিত হলেন না। মুজিব ভাইয়ের স্মরণশক্তি অসাধারণ। যেখানেই যান তিনি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই হাতে করে নিয়ে যান। একবার পড়লেই তিনি সেটা মনে রাখতে পারেন।

মুজিব বললেন, এর আগের লাইনগুলো শোনো—

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা ॥

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নবশশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো?

হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, আঁখিজলে রজনী জাগ'—
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগ' ॥

মুজিব বলে চলেন, 'আমার মেয়েটা, হাসু, ওর বয়স এক পেরিয়ে গেল। ওর মা ওকে চাঁদ দেখায়। আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা। এবার যে গেলাম টুঙ্গিপাড়ায়, মেয়েটাকে ফেলে আসতে আমার কষ্ট হয়েছিল, জানো, গাজীউল। ওর মায়ের প্রতিও আমি সুবিচার করতে পারলাম না। ওদের যে ঢাকায় নিয়ে আসব, সেই অবস্থাও তো এখানে নাই। আন্দোলন আর আন্দোলন। যেকোনো সময় গ্রেপ্তার করে ফেলতে পারে ওরা। কোনো কিছুর ঠিকঠিকানা নাই।'

গাজীউল বুঝতে পারেন, মুজিব ভাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেজা।

আসলেই সামনে অনেক কাজ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী আসবেন। তাঁকে একটা স্মারকলিপি দেওয়া হবে। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের মিটিংয়ে গিয়েছিলেন মুজিব। ১৭ নভেম্বর ১৯৪৮-এর সেই সভায় কামরুদ্দীন আহমদকে ভার দেওয়া হয়েছে মেমোরেন্ডামটা রচনা করার। লিয়াকত আলী ঢাকায় এলে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সরকারের লোকজনের মাথাও খারাপ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। ফজলুর রহমান, কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী, এখন ঘোষণা করছেন, বাংলা লিখতে হবে আরবি হরফে। এর আগে একবার প্রস্তাব করা হয়েছে রোমান হরফে বাংলা লেখার। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই উর্দু ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথাও বলা হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে মিছিল হচ্ছে। সভা হচ্ছে। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। জিনিসপত্রের দামও বাড়ছে হু হু করে। শেখ মুজিব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদেও মিছিল সংগঠিত করছেন। কর্ডন-প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করছেন। কর্ডন-প্রথা হলো, খাদ্য-উদ্বৃত্ত জেলা থেকে কোনো খাদ্য বাইরের জেলায় বেসরকারিভাবে যেতে পারবে না, সরকার সেটা কিনে নিয়ে তারপর নিজেদের মতো করে ব্যবস্থা নেবে। এটা করতে গিয়ে খাদ্যসংকট আরও বাড়ানো হচ্ছে।

গাজী শেখ মুজিবের চোখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের নিচে দুটো চাঁদ টলমল করছে।

কথা ঘোরানোর জন্য গাজী বললেন, 'মুজিব ভাই, আপনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভক্ত হলেন কেমন করে? আপনার লিডার সোহরাওয়ার্দী তো বাংলাই ভালো করে বলতে পারেন না। আর আপনি তাঁর অনুসারী হয়ে সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথ আওড়ান।'

মুজিব হেসে উঠলেন শব্দ করে।

'কী ব্যাপার, হাসলেন যে!'

'আছে ব্যাপার।' বলে তিনি লুঙ্গি পরে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হাতমুখ ধোয়ার জন্য।

এসে দেখেন গাজী ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মুজিব বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

এই বিছানা থেকে সরাসরি চোখ যাচ্ছে চাঁদের দিকে।

তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চাঁদের ওপর দিয়ে মেঘ দৌড়াচ্ছে হালকা শরীর নিয়ে। মনে হচ্ছে চাঁদটাই দৌড়াচ্ছে। আসলে তো চাঁদ

দৌড়ায় না। মেঘেরা দৌড়ায়।

কত কথা মনে পড়ে মুজিবের!

সাতচল্লিশের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বারবার এসেছেন পাকিস্তানে। ঢাকায় এসে খাজা নাজিম উদ্দিনের অতিথি হয়েছেন। করাচিতে গণপরিষদের সভায় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসেই ভাষণ দিয়েছেন। প্রতিবারই তিনি কথা বলেছেন অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষে, ভারত-পাকিস্তান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে। লিডারের এই অসাম্প্রদায়িকতার গুণটিকে মুজিব বড় ভালোবাসেন। কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে সরাসরি এসেছেন যশোরে। শান্তির সপক্ষে সভা করে ফিরে গেছেন দিনে দিনে। খুলনায় এসেছিলেন। সেখান থেকে ফরিদপুর-গোপালগঞ্জ। ফরিদপুর-গোপালগঞ্জে সভা সফল করার জন্য মুজিব খেটেছেন প্রচুর। সভা সুন্দরভাবে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এপ্রিল মাসেও তিনি এসেছিলেন ঢাকায়। সদরঘাট করোনেশন পার্কে সভা করেছেন। তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন শাহ আজিজের মুসলিম ছাত্রলীগের পাঠানো একটা ছেলে দড়ি বেয়ে মঞ্চের পেছনে উঠে পড়ে। তার হাতে ছিল ছুরি। সে এসেছিল সোহরাওয়ার্দীকে খুন করতে। জনতা অবশ্য ছেলেটিকে ধরে ফেলে।

সোহরাওয়ার্দী বারবার এই দেশে আসুক, খাজা নাজিম উদ্দিনরা তা চান না। না চাইবারই কথা। তিনি এলে এই দেশে আর সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের রাজনীতি চলবে না। খাজা আর লিয়াকত আলীরা তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। গত জুন মাসে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় মানিকগঞ্জের একটা শান্তিসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য।

কলকাতা থেকে সোহরাওয়ার্দী আসবেন বিমানে।

সকাল সকাল মুজিব হাজির হয়েছিলেন তেজগাঁও বিমানবন্দরে। কামরুদ্দীন আহমদসহ ১৫০ মোগলটুলীর ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

কিন্তু দুই মাস আগে লিডার এসে যে বাড়িতে উঠেছিলেন, 'দিলকুশা' নামের সেই বাড়ির মালিক খাজা নসরুল্লাহই উপস্থিত নেই। কামরুদ্দীন সাহেব বললেন, 'মানিকগঞ্জের লঞ্চ তো ছাড়বে সেই সন্ধ্যায়। এতক্ষণ লিডার কোথায় থাকবেন, আর যাবেনই বা কী করে? খাজা নসরুল্লাহ সাহেব যে এখনো এলেন না!'

বিমান অবতরণ করল রানওয়েতে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ৫৬ বছর বয়সী সোহরাওয়ার্দী সাহেব। পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা লিডারকে বেশ ফুরফুরেই দেখাচ্ছিল। পূর্ব আকাশে সূর্য ছিল, আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে, তিনি ভ্রু কুঁচকে আছেন। তবু তাঁর মুখ হাসি হাসি।

মুজিব হাত বাড়িয়ে দিলেন। লিডার তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

কুশল বিনিময়ের পর লিডার বললেন, 'চলো, যাওয়া যাক। খাজা কই?'

'তিনি আসেননি।' কামরুদ্দীন সাহেব জানালেন।

'তাকে আমি তার করে এসেছি। সে তো জানে, আমি তার বাসায় উঠব। দেখো তো কী ব্যাপার?'

কামরুদ্দীন সাহেব ছুটলেন বিমানবন্দর অফিসে, একটা ফোন করার জন্য। ফিরে এসে বললেন, 'খাজা সাহেব বললেন, তাঁর বাড়িতে অনেক মেহমান। সুতরাং ওখানে তিনি লিডারকে নিতে পারছেন না।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'তা কী করে হয়! আমি ফোনে কথা বলি। কোথাও কিছু একটা ভুল-বোঝাবুঝি হচ্ছে।'

ভুল-বোঝাবুঝিটা কী, মুজিব সেটা আঁচ করতে পারছেন। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয়, সরকার চায় না আপনি বারবার পূর্ব বাংলায় আসেন। কাজেই তারা সবাইকে বলে দিয়েছে, কেউ যেন আপনাকে বাড়িতে না ওঠায়।'

কামরুদ্দীন সাহেব বললেন, 'আপনার ফোন করাটা উচিত হবে না।'

বিমানবন্দর থেকে ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করে তাঁরা চললেন আমজাদ খান সাহেবের জয়নাগ রোডের বাসায়। ততক্ষণে আকাশে মেঘ জমে গেছে। কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। ভাপসা গরম।

আমজাদ সাহেবও অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে একটা প্রহরের জন্য ঠাঁই দিতে রাজি হলেন না। এ তো ভারি মুশকিল হলো!

মুজিবের বড় রাগ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, লিডারকে নিয়ে সোজা চলে যান পার্টি অফিসে। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে। কিন্তু লিডারের মুখ হাসি হাসি। তিনি রাজনৈতিক নেতা। জানেন, রাজনীতি মানেই চড়াই-উতরাই। নাগরদোলার মতো একজন রাজনীতিকের জীবন। কাল যিনি পরম বন্ধু, আজ তিনি দুচোখের বিষ।

এদিকে কামরুদ্দীন সাহেব ছুটলেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান সাহেবের বাসায়। কামরুদ্দীন সাহেব পরে জানিয়েছেন মুজিবকে, শাহজাহান

সাহেবের স্ত্রী নূরজাহান বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো বড় মানুষ আসছেন শুনে তিনি রান্নাঘরে চলে গেছেন সোজা।

কামরুদ্দীন সাহেব এসে বললেন, 'লিডার, চলুন। খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'কোথায়?'

'প্রশ্ন নয়,' কামরুদ্দীন সাহেব বললেন, 'চিরকাল আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, আমরা আপনার কথামতো চলেছি। আজ না হয় আপনি আমার নেতৃত্ব মেনে নিন। আমার সাথে চলুন।'

কথা না বাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন। মুজিব আর কামরুদ্দীন সাহেবও তাঁর সঙ্গে চললেন। কর্মীরা পেছনে পেছনে তাঁদের গাড়ি অনুসরণ করলেন।

নূরজাহান খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন বিশাল। অনেক পদের রান্না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তো খেলেনই, কর্মীবহরের খাওয়াও সম্পন্ন হলো আয়েশের সঙ্গে।

শাহজাহান সাহেব ও নূরজাহান তাঁদের শয়নকক্ষটাই ছেড়ে দিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জন্য।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় স্টিমার ছাড়বে বাদামতলী ঘাট থেকে। কর্মীবহর নিয়ে নেতা চললেন ঘাটে। সন্ধ্যা নামার আগেই।

তখন বাদামতলীতে ভিড় জমে উঠেছে। কুপিবাতি জ্বলছে ফেরিঅলাদের পসরার সামনে। কুলিরা হাঁকাহাঁকি করছে। ভিখিরিরা ভিক্ষা করছে গান গেয়ে। স্টিমার ঘাটে ভেড়ানোই ছিল। নেতা সেটায় উঠলেন। দোতলায় কেবিনের সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। সেখানে চেয়ার পাতা। সবাই গিয়ে সেখানে বসে পড়া গেল। আড্ডাও উঠল জমে। আটটা বাজল, সাড়ে আটটা। কিন্তু স্টিমার ছাড়ার কোনো নামই নাই। সারেংকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানাল, পুলিশ সাহেব এসে বলে গেছেন, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত জাহাজ ছাড়া যাবে না।

মুজিব উঠলেন। কামরুদ্দীন সাহেব ছুটলেন। তাঁরা ফোন করতে লাগলেন নানা কর্তাব্যক্তির কাছে। জানা গেল, মুখ্যমন্ত্রী কল বুক করেছেন করাচিতে। কেবিনেট মিটিং চলছে। করাচি থেকে ফোন এলে তারপর তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন জাহাজ ছাড়বে কি ছাড়বে না।

সাড়ে নটায় পুলিশের গাড়ি এল দুটো। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের আইজি,

ডিআইজি। তাঁরা হাতে করে এনেছেন একটা সরকারি আদেশপত্র। সোহরাওয়ার্দী মানিকগঞ্জে বক্তৃতা করতে যেতে পারবেন না। তাঁকে অনতিবিলম্বে দেশ ছাড়তে হবে।

পুলিশের আইজি জাকির হুসেন। এই জাকির হুসেনকে ঢাকার পুলিশ সুপার পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। তারপর একজন ইংরেজ সাহেব যখন এই প্রদেশের আইজি পদে নিয়োগ পেল, তখন বাঙালি পুলিশ কর্তাদের সবাইকে এক ধাপ করে পদাবনমনের সামনে পড়তে হলো। তখন এঁরা সবাই মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে বলে-কয়ে ওই ইংরেজের নিয়োগ বাতিল করিয়েছিলেন। আজ তাঁরাই বয়ে এনেছেন সোহরাওয়ার্দীর বহিষ্কারাদেশ।

জাকির হুসেন বললেন, 'আপনি আজ রাতে আমার বাসায় থাকতে পারেন।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'থ্যাংকস। ইফ আই অ্যাম নট আন্ডার অ্যারেস্ট আই উড প্রেফার টু রিমেইন উইথ মাই হোস্ট।'

জাকির হুসেন বললেন, 'আপনি যেখানে খুশি আজকের রাতটা কাটাতে পারেন।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'টেল ইয়োর নাজিম উদ্দিন দ্যাট সোহরাওয়ার্দী ইজ নট ইয়েট ডেড।'

বুড়িগঙ্গায় তখন ঘন অন্ধকার। ঘাটের আলোয় নদীর পানিতে কালো ঢেউয়ের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। দূরে নৌকার গায়ে গায়ে আলো। সোহরাওয়ার্দী, কামরুদ্দীন, শেখ মুজিব—সবাই নেমে এলেন জাহাজের ডেক থেকে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব পুলিশদের বললেন, 'একটা ছোট্ট সিদ্ধান্ত নিতে এত দেরি করলে চলবে? অযথা এতজন সাধারণ যাত্রীকে আপনারা এতক্ষণ ধরে কষ্ট দিলেন।'

শাহজাহান সাহেবের বাসাতেই ফিরে এলেন তাঁরা। এসে দেখেন, বাসার চারদিকে পুলিশ। ভেতরেও পুলিশের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বসা।

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'শাহজাহান সাহেবের না কোনো ক্ষতি করে বসে এরা?'

শাহজাহান সাহেব অবশ্য ভয় পেলেন না। সবাই মিলে ধরে শোবার ঘরের খাটটা ফ্যানের নিচে আনলেন। কর্মীরা একে একে চলে গেল। শুধু রয়ে গেলেন কামরুদ্দীন।

মুজিবও বিদায় নিলেন। পরের দিন ভোর থাকতে থাকতেই মুজিব এসে হাজির শাহজাহান সাহেবের বাসায়।

নূরজাহান, কামরুদ্দীন, মুজিব প্রবেশ করলেন শোবার ঘরে। দেখতে পেলেন, লিডার একমনে চোখ বুজে কবিতা বলে চলেছেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,/ শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,/ যাবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই,/ দানবের সাথে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছ যারা ঘরে ঘরে।'

নূরজাহান ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার এমএ ক্লাসের ছাত্রী, বললেন, 'শহীদ সাহেব, আপনি বাংলা পড়েন? বাংলা কবিতা পড়েন? রবীন্দ্রনাথ পড়েন?'

সোহরাওয়ার্দীর সামনে নূরজাহানের নোটখাতা, সেটা বন্ধ করে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তো বাংলার ছাত্রী। আমাকে বোঝাও তো, মধুমাখা আঁখিজল মানে কী? লবণাক্ত আঁখিজল কি মধুমাখা হতে পারে?'

তারপর তিনি উঠলেন। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আমি দুঃখিত। আমার জন্য তোমাদের কষ্ট করতে হলো।'

চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে আছেন মুজিব। তাঁর চোখে আবারও অশ্রু। আজ তাঁর কী হয়েছে? এখনই যদি গাজী চোখ মেলে, সে দেখে ফেলবে তাদের মুজিব ভাইয়ের চোখ ভেজা। এ-ও কি হয়?

তিনি চোখ মুছলেন। এই অশ্রু কি মধুমাখা?

গাজীউল হক ঘুমুচ্ছে। ঘুমাক। ও জেগে উঠলে ওকে বলতে হবে, 'শোনো গাজী, আমার লিডার শুধু রবীন্দ্রনাথ পড়েনই না, তিনি বোঝারও চেষ্টা করেন। মধুমাখা অশ্রুজল মানে কী! তুমি কী ভাবো, বলো তো?'

মুজিবের মনে রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি দোলা দিয়ে যাচ্ছে:

সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তারপর ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল

আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে
শিশিরের মতো রবে।

মুজিবের মনে পড়ে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কীভাবে পুলিশ পরের দিন বিকেলে গাড়িতে তুলে নেয়। মুজিবও সেই গাড়িতে উঠে পড়েন। লিডারকে পুলিশ গোয়ালন্দগামী জাহাজে তুলে দেয়।

মুজিব তাঁকে কেবিনে বসিয়ে দিয়ে তারপর নেমে আসেন।

জাহাজ ছেড়ে দেয় ভেঁপু বাজিয়ে। পানিতে ঢেউ তোলে। ঢেউ আছড়ে পড়ে ঘাটে। বাঁধা নৌকাগুলো দুলে ওঠে। জাহাজটা আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে যায়।

জেটি শূন্য হয়ে গেলে মুজিবের চারপাশটা যেন শূন্য হলে মনে হয়।

তবু তিনি নিজেকে শক্ত করেন। নেতা বলে গেছেন অসাম্প্রদায়িকতার পথে সংগঠন আর আন্দোলন চালিয়ে যেতে। তিনি আবার আসবেন।

সলিমুল্লাহ হলের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। এই চাঁদ উঠেছে কলকাতায়। একই চাঁদ উঠেছে টুঙ্গিপাড়ায়।

লিডারের সঙ্গে তাঁর কত দিনের পথচলা। কত মধুর স্মৃতিই না আছে তাঁর সোহরাওয়ার্দীকে ঘিরে। কর্মীদের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ মনে করেন, প্রত্যেকের খোঁজখবর নেন, মানুষের উপকার করার জন্য সদা প্রস্তুত।

মুজিব নেতার এই গুণের কথা জানেন। ধনীর ঘরের ছেলে, অভিজাত পরিবার। কলকাতা ক্লাবের সদস্য। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ। তিনি যখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, সে সময় এক ইংরেজ আইসিএস কর্মকর্তা ফাইলের নোটে যা লিখেছিলেন, সোহরাওয়ার্দীর তা মনঃপূত হয়নি। তিনি ওই অফিসারকে তিরস্কার করলেন। গভর্নরকেও জানালেন, 'এই অফিসার তো নোটই লিখতে জানে না।' গভর্নর বললেন, 'সে কি, ও তো অক্সফোর্ডের এমএ!' সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'অক্সফোর্ডের এমএ তো আমিও। আমি খুব জানি, সব ইংরেজ ভালোমতো ইংরেজি জানে না।' এ রকম প্রবল যাঁর ব্যক্তিত্ব, তিনি কিনা তাঁদের সঙ্গে একটা দেশি নৌকায় বসে সারা রাত জেগে গ্রামবাংলা সফর করছেন!

মুজিবের আজ ঘুম আসছে না। এই রকম সাধারণত হয় না। যেকোনো স্থানে চোখ বোজামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর আছে। তা না হলে কারাগারে, কিংবা স্টিমারে, কিংবা পার্টি অফিসে কিংবা পাতলা খান লেনের মেসে—যেখানে রাত, সেখানেই কাত, আর সেখানেই নিদ্রাপাত করতে পারতেন না তিনি।

সোহরাওয়ার্দী তখন অবিভক্ত বাংলার সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। থিয়েটার রোডের বাসভবনে নিজের ডেস্কে বসে সেদিনের ডাক দেখছেন তিনি। মুজিব বসে আছেন তাঁর ডেস্কের অপর দিকে। একটা পোস্টকার্ড হাতে তুলে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যেন। উঠে পড়লেন।

'কী খবর, লিডার? কোনো জরুরি খবর?'

'আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে খিদিরপুরের দিকে।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি বসে পড়লেন গাড়িতে। মুজিবও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন শকটে। নেতা নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন। মুজিব বসে আছেন সারথির পাশের আসনে। গাড়ি গিয়ে থামল খিদিরপুর ওয়ার্ডগঞ্জ শ্রমিক বস্তিতে। তাঁরা গাড়ি থেকে নামলেন। মন্ত্রীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে পুরো বস্তি যেন ভেঙে পড়ল। জনারণ্যের ভেতর দিয়ে লিডার হাঁটছেন, সঙ্গে মুজিব। একে-ওকে জিজ্ঞেস করলেন লিডার, অমুকের ঘর কোনটা? বস্তির জনস্রোত তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। একটা জীর্ণ ঘরের সামনে এসে তাঁরা থামলেন। জনতাকে বাইরে থাকতে বলে সোহরাওয়ার্দী মাথা নিচু করে ঢুকে পড়লেন ওই পর্ণকুটিরে, পেছনে মুজিব। মাটিতে পাতা মাদুরের ওপর শুয়ে আছে একটা কঙ্কালসার দেহ। অতিবৃদ্ধ লোকটি কাশছে ঘন ঘন। তিনি বললেন, 'এই মুরুব্বিকে আমার গাড়িতে তুলে দাও।'

জনতার সঙ্গে হাত লাগালেন মুজিবও। গাড়িতে উঠে তিনি বস্তিবাসীকে বললেন, 'আমাকে আগে খবর দাওনি কেন তোমরা?'

তারপর গাড়ি সোজা চলে এল যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে।

হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো বৃদ্ধকে। মন্ত্রী নির্দেশ দিলেন, 'এর চিকিৎসার যেন কোনো ত্রুটি না হয়। যা খরচ লাগে, সব আমি দেব।'

তিনি নিয়মিত টাকা পাঠাতেন এই বৃদ্ধকে।

১৯৪৩ সালের দিককার কথা। মুজিব একবার বসে আছেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের থিয়েটার রোডের বাসায়, শোবার ঘরে। বিছানার ওপর একটা কালো খাতা। লিডার ঘরে ছিলেন না। মুজিব আনমনেই

কালো খাতাটা খুলে পাতা মেলে ধরলেন। কতগুলো লোকের নাম আর ঠিকানা লেখা। তার পাশে একটা করে টাকার অঙ্ক। সব মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো।

নেতা এই বিপন্ন মানুষগুলোকে প্রতি মাসে পেনশন দেন। এর পেছনে তাঁর মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হয়। জিজ্ঞেস করেছিলেন মুজিব, 'মাসে মাসে এত টাকা পেনশন কেন দিচ্ছেন?'

নেতা করুণ একটা হাসি দিয়ে বলেছিলেন, 'দেশের অবস্থা তো জানো না! ও তালিকা আমার দিন দিন বড় হচ্ছে। কবে যে আমরা এদের একটা হিল্লা করতে পারব!'

মুজিবের তন্দ্রামতো আসে। তিনি দেখতে পান, তাঁরা ঘাসি নৌকায় চড়ে চলেছেন পার্টির কাজে। একজন মাত্র মাঝি সেই নৌকার। মুজিব তাঁকে বললেন, 'লিডার, আপনি এইভাবে হালটা সোজা ধরে থাকেন। আমি আর মাঝি দাঁড় টানি। সময়টা বাঁচবে।' সোহরাওয়ার্দী সাহেব হাল ধরলেন। তারপর লিডার বললেন, 'তুমি এবার হাল ধরো, মুজিব। আমি দেখি দাঁড় টানতে পারি কি না।'

'ও আপনি পারবেন না, লিডার। আপনি বড় ঘরের ছেলে। কলকাতা শহরে ননি-মাখন খেয়ে বড় হয়েছেন। গাড়ি চালাতে পারবেন, কিন্তু নৌকার দাঁড় বাওয়া আপনার নরম হাতের কাজ নয়। আমরা নদীপারের ছেলে। বলা যায় নদীতেই বড় হয়েছি।'

'আরে দাও তো। কথা শোনো।'

লিডার দাঁড় ধরলেন প্রায় জোর করেই, হাল ধরলেন মুজিব।

মাঝি গান ধরল, 'মাঝি বায়া যাও রে,/ অকূল দরিয়ায় আমার ভাঙা নাও রে/ মাঝি বায়া যাও রে।'

তন্দ্রা ভেঙে যায় মুজিবের। গাজীউল ঘুমিয়ে পড়েছেন। চাঁদটা আকাশের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়েছে অনেকটা ওপরে।

নাহ্। এভাবে কবিতা আর আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। কাল ভোরে উঠতে হবে। আবার নামতে হবে মিছিলে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমনের বিরুদ্ধে মিছিলে নেতৃত্ব দিতে হবে।

৩২.

হেমন্তকাল। আমগাছের পাতা শুকিয়ে আসছে। শীতে ঝরবে পাতা, বসন্তে পাতা গজাবে, আসবে মুকুল। কিন্তু হেমন্তের সকালের রোদটা বড় ভালো লাগে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমির।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের আমগাছের একেবারে মগডালে গিয়ে বসে তারা; রোদটা যত বেশি গায়ে মেখে নেওয়া যায়।

ব্যাঙ্গমা বলে, 'বলো তো, শেখ মুজিবের প্রিয় কাজ কোনটা?'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'মিছিল করা। মিছিল করতে না পারলে তার হাত-পায়ে বিষ-বেদনা ওঠে। এইবার তুমি কও তো, শেখ মুজিব কোন প্রতিভাটা নিয়া জন্মাইছে?'

ব্যাঙ্গমা বলে, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের হেমন্তের বাতাসে দোল খেতে খেতে, 'আহ্, ভাষণটা বড় ভালো দেয় এই নওজোয়ান!'

ব্যাঙ্গমি আমগাছের ডালে মুখ ঘষে নিয়ে বলে, 'আইজ থাইকা ঠিক চার বছর আগে কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সভা হইতেছিল। আগের দিন সোহরাওয়ার্দীর বাড়িতে অনেকে মিলা ঠিক করল, আবুল হাশিম সাহেব কমিউনিস্টঘেঁষা, তারে আর সাধারণ সম্পাদক রাখা চলব না। হাশিম সাহেবও সেইটা মাইনা নিছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যায় যখন শেখ মুজিব ভাষণ দেওয়া শুরু করল, সেই প্রথম তার লিডার সোহরাওয়ার্দীর সাথে পরামর্শ না কইরাই মুজিব হাশিম সাহেবের পক্ষে ভাষণ দিতে লাগল, আর পুরা কাউন্সিল মুজিবের কথায় একেবারে মন্তরের মুখে সাপের মতো মোহিত হইয়া আবুল হাশিমকেই আবার সাধারণ সম্পাদক করল, মনে আছে?'

'থাকব না কেন? মুজিব যখনই ভাষণ দেয়, তখনই শ্রোতারা তার কথার জাদুতে ভাইসা যায়। এইটা তো কতই দেখলাম। তবে আরও দেখবা। মুজিব আরও অনেক ভাষণ দিব। একটা ভাষণ দিব একেবারে দুনিয়া ওল্টাইনা, সেইটা আর ২২/২৩ বছর পর। আর মুজিব তার লিডার শহীদ সোরওয়ার্দীর কথার অবাধ্য হইব আরও একবার। সেইটাও আরও

দেড় যুগ পরে। যখন আইয়ুব খানের মার্শাল লর পর প্রথম পলিটিকস ওপেন করব, উনি তখন নেতার নির্দেশ অমান্য কইরা আওয়ামী লীগ খুইলা বসব। সেই অবাধ্য হওয়াটাই বড় কাজের কাজ হইব।'

'কিন্তু এই সব বড় কাজের প্রস্তুতি তার চলতাছে রোজকার মিছিল মিটিং জনসভা প্রতিবাদ আর গ্রেপ্তার হওয়ার মধ্য দিয়া। খাজা নাজিম উদ্দিন গোপালগঞ্জ যাইতাছে। তার গোপালগঞ্জ। সেইখানকার এমএলএ শামসুদ্দিন আহম্মেদ এলাকা গরম কইরা ফেলছে। মহকুমায় পোনে ছয় লক্ষ মানুষ। প্রত্যেকের চান্দা এক টাকা। পোনে ছয় লাখ টাকা চান্দা উঠানো হইছে। কোর্ট মসজিদ আর পাকিস্তান মিনারের লাইগা ৪০ হাজার টাকা, পাশের রাস্তার লাইগা ৩০ হাজার। বাকি টাকা তারা দিতে চায় জিন্নাহ ফান্ডে। মুজিব কী করব?'

৩৩.

তখন ১১টা বাজে, গোপালগঞ্জের আদালতপাড়া এলাকায় তখন গভীর রাত। শীত আর কুয়াশা, কামিনী ফুলের ঘ্রাণ সেই কুয়াশার ওপরে ভর করে ভাসছে। কুকুর ডাকছে, শিয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে নদীর ধারে শটিবন হেলেঞ্চাবন থেকে, ঝিঁঝি রব তো প্রকৃতিরই অংশ, শেখ মুজিব তাঁদের গোপালগঞ্জের বাসায় এসে হাজির হন। দরজায় শব্দ করেন।

'কে?' লুৎফর রহমান সাহেবের কাশি হয়েছে, কে বলতে গিয়েই কাশির গমক ওঠে। 'আব্বা, আমি খোকা।'

লুৎফর রহমান লুঙ্গিতে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বিছানা ছাড়েন। টেবিলের ওপরে রাখা লণ্ঠনটার নব ঘুরিয়ে আলো বাড়ান। চিমনিতে কালো দাগ পড়েছে। কয়েকটা পোকা চিমনির পাশে উড়ছে। একটা মরা পোকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে পিঁপড়ার দল।

তিনি কবাটের খিল খোলেন। হাতে হারিকেন। হারিকেনের আলোয় ছেলের মুখটা দেখে তাঁর বুকে একধরনের প্রশান্তি অনুভূত হয়। পরক্ষণে একটা দুশ্চিন্তাও তাঁর মনে ঝিলিক দিয়ে যায়। করাচি থেকে খাজা নাজিম

উদ্দিন আসছেন, ছেলে না আবার কোনো ঝামেলা করে বসে। তিনি আদালতের কর্মচারী; সরকার বাহাদুরের সর্বোচ্চ কর্তার সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোর সাহস তো তাঁর বুকে আসে না।

'এত রাতে? কোত্থেকে?'

'শামসুদ্দিন এমএলএর বাড়ি থেকে।'

'হঠাৎ আসলা? খবর দিয়া আসলা না?' লুৎফর রহমান খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন।

'খবর তো পাইতেছেনই। ছয় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলছে। গোপালগঞ্জের গরিব মানুষের টাকা। এই টাকা নাকি অরা জিন্নাহ রিলিফ ফান্ডে দিবে। তারই প্রতিবাদ করতে আসছি।'

'হাতমুখ ধোও। ভাত খাও। জয়নালরে বলি ভাত রান্ধ্‌তে।'

'না, এত রাতে আর জয়নালরে কষ্ট দেওয়ার দরকার নাই। আমি খাইয়া আসছি। আপনি ঘুমায়া পড়েন। বড় কাশি হইছে দেখছি। ডাক্তার দেখাইছেন?'

'না, কাশির আবার ডাক্তার কী! তুলসীপাতার রস খাচ্ছি। সেরে যাবে নে।'

মুজিব আলনা থেকে নিজের লুঙ্গি-গেঞ্জি নিয়ে কাপড় পাল্টালেন। পুকুরপাড়ে গিয়ে পানি তুলে হাতমুখ ধুলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু তাঁর ঘুম আসছে না। ছটফট লাগছে। আজকে শামসুদ্দিন আহম্মেদের বাসায় অভ্যর্থনা কমিটির মিটিং ছিল। সেখানে তিনি হাজির হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'এই যে পোনে ছয় লাখ টাকা চাঁদা উঠল, এটা বাংলার গরিব মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা। এই টাকা কেন আমরা করাচিতে পাঠাব! ওরা আমাদেরকে নতুন কলোনি বানিয়েছে। কথায় কথায় শোষণ করছে। আজ বাংলাজুড়ে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। মানুষ না খেয়ে আছে। আর আমরা টাকা খরচ করছি খাজা নাজিম উদ্দিনের সংবর্ধনায়! টাকা পাঠাচ্ছি জিন্নাহ ফান্ডে! আজ গোপালগঞ্জে কোনো কলেজ নাই। এই টাকায় আমরা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই অনেকেই, 'আরে থামো মজিবর। তুমি খালি লেকচার দেও', 'স্যার খাজা সাহেব আসতেছেন আমাদের গোপালগঞ্জে, এ তো আমাদের সৌভাগ্য' ইত্যাদি বলে তাঁকে বসিয়ে দেন।

বসিয়ে দিলেই বসে যাওয়ার পাত্র তো মুজিব নন। তিনি জানেন এর

বিহিত কী করে করতে হবে। তাঁর পক্ষে আছে মানুষ। গোপালগঞ্জের মানুষ। কাল সকালেই কাজ শুরু করতে হবে। মানুষকে সংগঠিত করতে হবে।

আটাশের যুবক মুজিব এরই মধ্যে গোপালগঞ্জে তুমুল জনপ্রিয়। এখানে তিনি বহুদিন পড়েছেন মিশনারি স্কুলে, যুক্ত থেকেছেন এলাকাবাসীর ভালো-মন্দের নানা চড়াই-উতরাইয়ের সঙ্গে। স্কুল ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি। শুধু যে গোপালগঞ্জে খেলেছেন তা নয়, হায়ারে খেলতে এদিক-ওদিকও গেছেন।

একবার তাঁরা ফুটবল খেলতে গেলেন পাইককান্দি ইউনিয়নের ঘোরদাইড়ে। গোপালগঞ্জ থেকে খেয়া নৌকায় করে যেতে হয়। খেলায় জিতল মুজিবদের দল। খেলা শেষে যখন খেয়া নৌকায় উঠলেন, ততক্ষণে চরাচরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মাগরিবের নামাজ শেষ হয়েছে মসজিদে। আকাশে আলোর আভা আছে একটুখানি। হঠাৎ শুরু হলো ধূলিঝড়। মুজিব তখন নৌকার হাল ধরে আছেন। তাঁর সঙ্গে আমিন মামাসহ আরও কয়েকজন। প্রচণ্ড বাতাসে নৌকা বাঁক নিতে চাইছে। তিনি দুই হাতে শক্ত করে ধরে আছেন হাল। এই অবসরে তাঁর চোখ থেকে উড়ে গেল চশমা। তিনি চশমা ছাড়া প্রায় কিছুই দেখেন না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ও মামা, হাল ধরো, আমার চশমা পড়ে গেছে। আমি কিছুই দেখি না।' আমিন মামা হাল ধরলেন। সবাই মিলে চশমা খুঁজতে লাগল নৌকার পাটাতনে। নাহ, পাওয়া গেল না। ওটা নদীর জলেই তলিয়ে গেছে কোথাও। নৌকা অপর পাড়ের ঘাটে ভিড়ল। কিন্তু তিনি হাঁটবেন কী করে। অন্ধকারে চোখে তো কিছুই দেখছেন না। শেষে হরিদাসপুর ডাকবাংলোয় রাত কাটাল কিশোর ফুটবলারের দল।

এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগলে 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' বলে স্লোগান দিয়ে এগিয়ে গেছেন স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে। গরিব ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য স্টুডেন্ট ইউনিয়ন গড়ে তুলে মুষ্টিভিক্ষা করে তহবিল জোগাড় করেছেন। আবার মুসলিম লীগের সম্মেলনে যখন নিজের শক্তি প্রয়োগের দরকার হয়েছে, তখন বিপুল কর্মীর সমাবেশ ঘটিয়ে সেটা করেও দেখিয়েছেন।

গত রাতেই মিছিল বের করেছেন, 'নাজিম উদ্দিন ফিরে যাও'। এলাকার কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন পাড়ায় পাড়ায় খবর দেওয়ার জন্য। আগামীকাল কয়েক হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল বের

করতে হবে। মুজিবুর ডাক দিয়েছেন, এলাকার টাকা এলাকার উন্নয়নে খরচ করতে হবে। সবাই যেন মিছিলে আসে।

খাজা নাজিম উদ্দিন আসছেন নদীপথে। আর পি সাহার গ্রিনবোটে আসবেন তিনি। এদিকে শহরের পরিস্থিতি খারাপ। হাজার হাজার লোকের মিছিল প্রদক্ষিণ করছে শহর। সবার মুখে এক স্লোগান : 'নাজিম উদ্দিন ফিরে যাও'। চারদিক থেকে আরও মিছিল আসছে।

গ্রিনবোট যে ঘাটে ভিড়বে, সেই এলাকাটা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। মিছিল সেই কর্ডন ভাঙার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। পুলিশও বাঁশি বাজিয়ে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। হাজার হাজার মানুষ। পুলিশের সাধ্য কী এই জনস্রোত রুখে দেয়! গ্রিনবোটে খাজা নাজিম উদ্দিন। নদীর ঘাটে মানুষের মিছিল আর স্লোগান। আর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া।

খাজা নাজিম উদ্দিন বোটে বসেই টের পেলেন একটা কিছু অঘটন ঘটছে। তিনি জানতে চাইলেন পুলিশের কাছে, 'হোয়াটস হ্যাপেনিং দেয়ার।'

'দে আর হেয়ার টু ওয়েলকাম ইউ, স্যার।'

'দেন হোয়াই আর দে থ্রোয়িং স্টোনস অ্যাট দ্য পুলিশ ফোর্স?'

'দেয়ার আর সাম মিসক্রিয়ান্টস, স্যার।'

খন্দকার শামসুদ্দিন বললেন, 'শেখ মুজিবর ইজ ক্রিয়েটিং ডিস্টারবেন্স, স্যার। দ্য ফলোয়ার অব সোহরাওয়ার্দী, দি এজেন্ট অব ইন্ডিয়া।'

৫৬ বছর বয়সী শেরওয়ানি পরা খাজা নাজিম উদ্দিন বোটের ডেকে বসেছিলেন হাওয়া খেতে। তিনি তাঁর বাটারফ্লাই গোঁফটা নাড়তে লাগলেন। শেখ মুজিবকে তিনি চেনেন। হ্যাঁ, খুবই একরোখা ভয়ংকর ধরনের ছাত্রনেতা। তবে মুসলিম লীগেরই কর্মী। সেদিনও তো 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে স্লোগান দিয়েছেন। কিছুদিন আগেই তাঁকে কারাগার থেকে ছাড়া হয়েছে, যখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

খাজার জন্ম আহসান মঞ্জিলে। তিনি বিলেতে লেখাপড়া করেছেন, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছেন। 'নাইটহুড' পেয়েছেন ইংরেজরাজের কাছ থেকে। অবিভক্ত বাংলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী মায় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁকে সরল-সোজা মানুষ বলেই জানত। আবুল হাশিম তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি এতই সরল যে সেটাকে বলা যায় একেবারেই বোকা। মুসলিম লীগ সরকার যখন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা বলছিল, তখন তিনি দিনাজপুরের ভূস্বামীদের এক সভায় বলেছিলেন,

'আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই। ক্ষুধার্ত কুকুরকে হাড়গোড় কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে হয়, নাহলে তারা পুরো মাংসটাই নিয়ে যাবে; ফ্লাউড কমিশনের কাজও তেমনি।' খাজা জীবনে কোনো নির্বাচনে জয়ী হননি। চলতেন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের বুদ্ধিতে।

খাজা বললেন, 'শেখ মুজিবকে ডাকো, ওকে আমার কাছে আসতে বলো। ও কেন বিক্ষোভ করছে, আমাকে বলুক। আলোচনার মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

শেখ মুজিব কয়েকজন কর্মী নিয়ে উঠলেন বোটে। বৈঠকে মুখোমুখি হলেন খাজার।

খাজা বললেন, 'কেন তোমরা বিক্ষোভ করছ? কারণ কী?'

মুজিব বললেন, 'আপনি জানেন না এই এলাকার মানুষ কত গরিব। এই গরিব মানুষদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা তোলা হয়েছে। সেই টাকা দেওয়া হবে জিন্নাহ ফান্ডে। অথচ এলাকায় একটা কলেজ নাই। এই গরিবের রক্তচোষা টাকা জিন্নাহ ফান্ডে জমা পড়লে কি কায়েদে আজমের সম্মান বাড়বে? নাকি একটা এলাকায় একটা কলেজ হলে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পাবে?'

খাজা বললেন, 'আচ্ছা, আমি এই এলাকায় একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেব কালকের সভায়। কায়েদে আজম মেমোরিয়াল কলেজ। আর সেই কলেজের ফান্ডে বাকি টাকা রেখে দেওয়া হবে।'

'থ্যাংক ইউ' বলে মুজিব বেরিয়ে এলেন তাঁর কর্মীদের নিয়ে।

লুৎফর রহমান বললেন, 'গোপালগঞ্জ এসেছ। টুঙ্গিপাড়া যাবা না?'

'এইবার আর যাই না। গোপালগঞ্জ থেকে যেতে বেশি সময় লাগে। এর চেয়ে ঢাকা থেকে যেতেই সময় লাগে কম। আর ঢাকায় অনেক কাজ, আব্বা।'

'কী কাজ করতেছ? ওকালতিটা পড়তে বইলেছিলাম। পড়তেছ?'

'ভর্তি তো হয়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি। এলএলবি পড়তেছি। সেকেন্ড ইয়ার। দেখি।'

'সাবধানে থাইকো, খোকা। তোমারে নিয়া সব সময় দুশ্চিন্তা করি। পুলিশ তো তোমার পিছনে লেইগে আছে। আবার কবে জানি অ্যারেস্ট হও।'

'দেশের মানুষের ভালো থাকার জন্য কাউরে কাউরে কষ্ট করতে হয়,

আব্বা। অন্যায় হইলে প্রতিবাদ না করলে সেইটাও অন্যায়। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/ তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।' রাতের বেলা ভাত খেতে খেতে পিতা-পুত্র কথা বলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজন কর্মী খেতে বসেছেন। তাঁরা মুজিবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন খাওয়া ভুলে। হারিকেনের আলোয় তাঁরা দেখতে পান, গোপালগঞ্জের চরের লেঠেলদের কাঠিন্য আর পলিমাটির নরম পেলবতা একই সঙ্গে এই যুবকের মুখে খেলা করছে।

লুৎফর রহমান বলেন, 'খোকা। চিরটাকাল আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি করতেছি। স্বপ্ন দেখি, তুমি জজ-ব্যারিস্টার হবা। ম্যাজিস্ট্রেট-এসডিও হবা। অন্তত ভালো উকিল হলিও তো খোকা তোমার আব্বার মুখটা উঁচু হয়।'

রহমত সরদার, গোপালগঞ্জের সরদারপাড়ার ২৩ বছরের যুবক, বহুদিন থেকেই মুজিবের সংগঠনের কর্মী, এক লোকমা ভাত মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলেন, 'চাচা, আপনে চিন্তা কইরেন না। খোকা ভাইরে দেখে আসতিছি সেই ছোটবেলা থন। খোকা ভাইয়ের নিজের সাধ-স্বপ্ন সব আল্লাহ পুরা করে, আপনেরটেও করবা নে। কী কও, খোকা ভাই? আপনের মনে আছে না, রফিক সিনেমা হলের সামনের দোতলায় বইসে আপনেরে আমি কী বলছিলাম? বুঝলেন নাকি চাচা, খোকা ভাই তখন কলকাতা থেইকে মাঝেমইধ্যে আসেন, এই প্রত্যেক মাসের কুড়ি বাইশ তারিখে গোপালগঞ্জ আসিতেন। আমাদের অ্যান্টি গ্রুপ মুকসুদপুরের সালাম খানের গ্রুপের মিটিং বড় হতো। একবার গিমাডাঙ্গা স্কুল মাঠে খোকা ভাই মিটিং দিয়েছেন। সব মিলে লোক হলো ১৭ জন। পথে আসার সময় আমি কলাম, মিয়া ভাই, এত কম লোকের মিটিং কইরে কী লাভ? দিনটাই মাটি! খোকা ভাই, সেদিন কী কছিলেন মনে আছে?'

মুজিব রহমত সরদারের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে আছে।

রহমত সরদার বলেন, 'খোকা ভাই সেই দিন বলেছিলেন, বুঝলেন চাচা, হতাশ হয়ো না। দেখবা আমার মিটিংয়ে একদিন লক্ষ লক্ষ লোক হবি নে! তো আইজকে দেখেন। হাজার হাজার মানুষ খোকা ভাইয়ের পিছনে মিছিল করতিছে। '৪৫ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব যেদিন এলেন, সেই মিটিংয়েও তো লক্ষ লোক হয়েছিল। নাকি হয়নি? তো, আপনার খোকা জজ-ব্যারিস্টার কেন, তার চেয়ে বড় বৈ ছোট কিছু হবে না নে। ব্যারিস্টার তো জিন্নাহ, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী সাহেব সবাই। তাঁরা

তো আবার মন্ত্রী-মিনিস্টারও হয়েছেন। আমাদের খোকা ভাইও হবিনে।'

মুজিব একটু যেন লজ্জিত হন। মন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন করছেন না। তিনি আন্দোলন করেন জুলুমের হাত থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাবেন বলে। জন্মের পর থেকেই দেখে আসছেন, দেশ পরাধীন। পরাধীন দেশকে মুক্ত করতে হবে, তাঁর গৃহশিক্ষক স্বদেশি আন্দোলন করতে গিয়ে জেল খেটে আসা হামিদ মাস্টার তাঁকে শুনিয়েছেন তিতুমীর, সূর্যসেন, ক্ষুদিরামের কাহিনি; মানুষের মুক্তির জন্য, দেশকে মুক্ত করার জন্য এসব বীর কীভাবে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় কলকাতায় নেতাজি সুভাষ বসু হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবি জানান। তিনি সময়সীমা বেঁধে দেন—১৯৪০ সালের ৩ জুলাইয়ের মধ্যেই ওই মনুমেন্ট সরাতে হবে।

শেখ মুজিব জানার চেষ্টা করেন, হলওয়েল মনুমেন্টটা কী! কলকাতা থেকে খবরের কাগজ আসে এক দিন পর, কখনো কখনো দুই দিনও লাগে। তা-ই পড়ে পড়ে তিনি কিছুটা বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে নাকি কিছুসংখ্যক ইংরেজ বন্দীকে একটা ক্ষুদ্র কক্ষে আটকে রেখেছিলেন, যাতে তারা মারা যায় শ্বাসরোধের ফলে। ওই সৈনিকদের সম্মানে হলওয়েল মনুমেন্ট স্থাপন করা হয়েছিল কলকাতার ডালহৌসি স্কয়ারে। ওই মনুমেন্ট হলো পরাধীনতার চিহ্ন, ওটা সরাতে হবে—সুভাষ বসু ১৯৪০-এ ঢাকায় এলে ঢাকাবাসী নেতাজিকে বলল সেই কথা। নেতাজি বললেন, 'ঠিক আছে, ওই মনুমেন্ট সরানোর ডাক দেব আমি।'

ডাক দিয়েছিলেন নেতাজি। বলেছিলেন, 'সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি দিবস ৩ জুলাইয়ের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্ট নামের কলঙ্কচিহ্ন সরাতে হবে। না হলে ৩ জুলাই আমার বাহিনীর অভিযানে নেতৃত্ব দেব আমি।'

২ জুলাই নেতাজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা বাংলায় সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গোপালগঞ্জেও এসে লাগে তার ঢেউ। স্কুলছাত্র মুজিবও যোগ দেন মিছিলে। 'হলওয়েল মনুমেন্ট, সরাতে হবে, সরাতে হবে', 'ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, হলওয়েল মনুমেন্ট', 'সুভাষ বসুর মুক্তি চাই'। মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক বললেন, 'আমি সুভাষকে ভালোবাসি। শ্রদ্ধা করি। আমরা সবাই তাঁর অনুরক্ত। এ দেশের রাজনীতিতে তিনিই সবচেয়ে জনপ্রিয়।' শুধু কংগ্রেস কিছু বলল না। অথচ সুভাষ বসু পরপর দুই বছর সভাপতি ছিলেন কংগ্রেসের। কিন্তু হিন্দু, মুসলিম, বাঙালি এক

হয়ে গেল সুভাষের মুক্তির প্রশ্নে। ওই গোপালগঞ্জেও রব উঠল : হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, জিন্দাবাদ। সুভাষ বসু, জিন্দাবাদ।

সুভাষ বসু তখনই টানতে থাকেন মুজিবকে। এই নেতার সঙ্গে তাঁর দেখা করতে হবে। তাঁকে জানাতে হবে, তিনি চান ইংরেজদের তাড়াতে। সুভাষ বসু কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়। এই সুযোগ। মুজিব চলে যাবেন কলকাতায়, সোজা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। দেখা করবেন নেতাজির সঙ্গে। নেতাজির খবর রোজ বেরোচ্ছে পত্রিকায়। ক্লাস নাইনের ছাত্র মুজিব সেসব পড়েন আর চূড়ান্ত করে ফেলেন তাঁর পরিকল্পনা। উঠে পড়েন গোয়ালন্দের স্টিমারে। গোয়ালন্দ দিয়ে ট্রেনে উঠে সোজা কলকাতা। সারা রাত ট্রেন চলল, সকালবেলা গিয়ে পৌঁছাল শিয়ালদা স্টেশনে। মুজিব ট্রেন থেকে নেমে খুঁজে পেতে হাজির হলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ততক্ষণে ১০টা বেজে গেছে।

পুলিশ কর্মকর্তা অজয়কুমার বসু তখন সুভাষ বসুকে প্রহরাধীন ও নিরাপদ রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কাছে একটা আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। মুজিব কাগজপত্র জোগাড় করে দরখাস্ত লিখলেন : 'আই হ্যাভ কাম ফ্রম গোপালগঞ্জ টু মিট নেতাজি। প্লিজ, অ্যালাউ মি টু মিট হিম।'

হাসপাতালের বড় সিঁড়ির দক্ষিণ পাশে অজয়কুমার দে ছাত্রটির সঙ্গে দেখা করেন। ছেলেটির চোখে চশমা। পরিধানে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট। অজয়কুমার দের মনে হলো ছেলেটির বয়স ১৬-১৭ হবে। আসলে মুজিবের বয়স তখন ২০ বছর।

'তোমার নাম কী?' পুলিশ কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

'শেখ মুজিবুর রহমান।'

'তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?'

'ক্লাস ওও-এ।' (তখন নাইনকে ক্লাস ওও বলা হতো)

'তুমি কেন শ্রীবসুর সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'আমি নেতাজির ভক্ত। তিনি মহান ভারতীয় নেতা। তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদাভেদ করেন না।'

'আচ্ছা। খুব ভালো কথা। তিনি তো ভারতবর্ষে স্বরাজ চান। তুমিও কি চাও?'

'হ্যাঁ। আমিও চাই ভারতবর্ষ শাসন করবে ভারতীয়রাই।'

'তা করতে হলে তো সংগঠন করতে হবে। তুমিও নিশ্চয়ই সংগঠন করো।'

'আমি মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ করি।'

'কিন্তু তুমি তো নেতাজির ভক্ত। নেতাজির সংগঠন করো না?'

'না, আমি নেতাজির সংগঠন করি না।'

'করো নিশ্চয়ই। আমি জানি, নেতাজির সংগঠন করলে সেটা কাউকে বলতে হয় না। আমাকে বলতে পারো। কারণ, আমিও নেতাজিরই লোক। আমাকে বলতে কোনো অসুবিধা নাই।'

'না, আমি মুসলিম স্টুডেন্ট লীগই করি। নেতাজির সংগঠন করি না। কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করি।'

'তুমি কেন সত্য গোপন করছ। নেতাজির গোপন সংগঠনগুলোর খবর আমিই রাখি। তুমি আমাকে বলো। তুমি ফরোয়ার্ড ব্লক করো।'

মুজিব বুঝতে পারলেন, এই ভদ্রলোক আসলে পুলিশের লোক। এই অল্প বয়সেই কারাগার থেকে ঘুরে আসা মুজিব এদের সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। তা ছাড়া সত্যি তো মুজিব নেতাজির সংগঠন করতেন না। কিন্তু মুসলিম-হিন্দুনির্বিশেষে সবাই তখন ভক্ত ছিল নেতাজির। ঢাকা থেকেই তো প্রথম হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের ডাক আসে। ইসলামিয়া কলেজের ছেলেরাই নেতাজিকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ও সক্রিয় ছিল। তারা ধর্মঘট আর বিক্ষোভ করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপরে চড়াও হয়। লাঠিচার্জ করে। তখন তারা মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে। বেকার, কারমাইকেল আর ইলিয়ট হোস্টেলের ছেলেরা অশান্ত হয়ে উঠলে সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন হোস্টেলে চলে যান। খাজা ছিলেন ভিতু ধরনের মানুষ। গাড়ি থেকে নামেননি। ফজলুল হক গাড়ি থেকে নেমে হোস্টেলের দিকে যাত্রা শুরু করলে ছেলেরা তাঁর গায়ে এক বালতি পানি ঢেলে দেয় ওপর থেকে। বাতি নিভিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও ফজলুল হক ভেজা কাপড়ে ছেলেদের কাছে যান। এবং ছেলেদের কথা দেন, হলওয়েল মনুমেন্ট তিনি অপসারণ করবেন। 'ছাত্রদের ওপর লাঠি চালানো মানে আমার নিজের বুকেই লাঠির ঘা বসানো। তোমরা আমার নিজের ছেলেরই মতো।' তিনি বলেছিলেন।

ফজলুল হক কথা রেখেছিলেন। সেই রাতের অন্ধকারেই মনুমেন্টটা অপসারণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

'না, আমি ফরোয়ার্ড ব্লক করি না। আমি মুসলিম স্টুডেন্ট লীগই করি।'

পুলিশকর্তা বুঝলেন, ছেলেটা আসলেই কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে সব খবর রাখে। তরুণ হৃদয়ের মধ্যে খুব বড় আদর্শ ধারণ করে আছে এই ছেলেটা।

'তোমার আদর্শবাদিতা আমার পছন্দ হয়েছে। তোমার মতো ছেলে আজকের দিনে সত্যি বিরল। তুমি দেশে ফিরে যাও। লেখাপড়া শেষ করো। নেতাজির সঙ্গে কারও দেখা করার নিয়ম নেই। থাকলে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে তাঁকে দেখা করিয়ে দিতাম।'

মুজিব সেদিন চলে এসেছিলেন। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তো তিনি নন। জীবনে যা করবেন বলে মনস্থ করেছেন, তা তিনি করেই ছেড়েছেন।

তিনি প্রায়ই কলকাতা যাতায়াত করতে লাগলেন। একদিন গেলেন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের কাছে। তাঁর বন্ধু প্রাণতোষের বাবা অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিধবা মা আর প্রাণতোষ ছাড়া তাঁদের সংসারে কেউ নেই। প্রাণতোষের মা তাঁকে ধরলেন, 'বাবা, তুমি তো মুসলিম লীগ করো, ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। তুমি না ওনার সাথে ডাকবাংলোয় দেখা করেছ, তুমি না ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সহসভাপতি। প্রাণের একটা চাকরির ব্যবস্থা তুমিই কইরে দিতে পারো, বাবা।'

প্রাণতোষ আর তাঁর বিধবা মাকে নিয়ে মুজিবকে যেতে হয়েছিল কলকাতায়। দেখা করতে হয়েছিল ফজলুল হকের সঙ্গে, তাঁর ঝাউতলার বাসায়। পুলিশ কর্মকর্তা অজয়কুমার দের সঙ্গে আবার দেখা তাঁর। তিনি বললেন, 'তোমাকে পরিচিত মনে হচ্ছে? কী যেন নাম তোমার?'

'শেখ মুজিবুর রহমান।'

'কোথায় যেন বাড়ি তোমার, পদ্মার ওই পারে?'

'গোপালগঞ্জ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন এসেছিলে?'

'এই যে আমার বন্ধু প্রাণতোষের বাবা মারা গেছেন। বিধবা মাকে নিয়ে ও বড় কষ্টে আছে। ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে...'

'কী বললেন চিফ মিনিস্টার।'

'সাথে সাথে ফোন করলেন ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে। হয়ে যাবে একটা হিল্লে। এখন যাচ্ছি ওখানে।'

তো, সেবার প্রাণতোষকে নিয়েই ব্যস্ততা গেল। পরের বার, হ্যাঁ পরের

বার, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়ির সামনে মুজিব ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। নেতাজি তখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ওই বাড়িতে গৃহবন্দী। ফাঁক খুঁজতে লাগলেন, নজরদারিতে একটু শিথিলতা নিশ্চয়ই হবে। ধোপা, ফেরিওয়ালারা তো বাড়িতে যাচ্ছে আসছে। এক ফাঁকে মুজিব ঢুকে গেলেন বাড়ির ভেতরে। আরও দর্শনার্থী ছিল তখন ওই ঘরে। কথা তেমন হয়নি।

'আমি আপনার আদর্শের একজন ভক্ত, আপনার সঙ্গে দেখা করতে গোপালগঞ্জ থেকে এসেছি। গোপালগঞ্জ স্কুলে পড়ি। আপনার আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা জানাতে এসেছি।' মুজিব বললেন।

নেতাজি বলেছিলেন, 'তোমার মতো তরুণেরাই তো দেশের আশা। তুমি চলে যাও। পুলিশ দেখে ফেললে তোমাকে অযথা অ্যারেস্ট করবে। হয়রানি করবে।'

'আশীর্বাদ করবেন। নমস্কার।' মুজিব বেরিয়ে এলেন।

তখনই আবার নজরে পড়ে গেলেন অজয়কুমার দের। পুলিশের কাজই সন্দেহ করা। শেখ মুজিবকে অনুসরণ করে অজয় দে পোস্ট অফিস পর্যন্ত গেলেন। তাঁকে বললেন, 'শেখ মুজিবর রহমান না?'

'জি।'

'নেতাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এটা আমার একটা স্বপ্ন ছিল, আমি একবার নেতাজিকে কাছ থেকে দেখব। সাক্ষাৎ হয়েছে।'

'কেন সাক্ষাৎ করলে, বলো তো?'

'আমি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সলিডারিটি প্রকাশ করলাম।' সহজভাবে বললেন মুজিব। পুলিশকর্তা অজয়কুমার দেও সহজভাবেই নিলেন বলে মনে হলো। তিনি আর কিছু বললেন না। মুজিবও বিদায় নিলেন।

সত্যি, বড় আদর্শই মুজিবকে টেনে এনেছে রাজনীতিতে। জজ-ব্যারিস্টার, মন্ত্রী-মিনিস্টার হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রাজনীতি করছেন না।

রাতের খাওয়া সারা হয়ে গেলে কর্মীদের বিদায় দিলেন মুজিব। সবাই যার যার বাড়িতে, হোস্টেলে চলে গেল। মুজিব আর লুৎফর রহমান বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরের দিন গোপালগঞ্জ টাউন মাঠে খাজা নাজিম উদ্দিনের জনসভা।

পাকিস্তান মিনার উদ্বোধন শেষে এই জনসভায় তিনি বক্তৃতা করতে ওঠেন। তিনি ঘোষণা দেন, 'এই মহকুমা শহরে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। কলেজের নাম হবে "কায়েদে আজম মেমোরিয়াল কলেজ"। এই কলেজের ফান্ডে আমি আপনাদের চাঁদার দুই লাখ টাকা তহবিল এখন থেকেই জমা করে গেলাম। বাকি খরচ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হবে।'

'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'খাজা নাজিম জিন্দাবাদ' স্লোগান আসতে থাকে মঞ্চ থেকে।

জনতাও সেই জিন্দাবাদ ধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়।

অচিরেই সেই স্লোগান 'শেখ মজিবর জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

৩৪.

ব্যাঙ্গমা বলে, 'দুইজন আলাদা আলাদাভাবে কাজ কইরা চলছে।

ব্যাঙ্গমি বলে, 'আমি জানি দুইজন কে?'

ব্যাঙ্গমা বলে, 'কও তো কে?'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'তুমি কও।'

ব্যাঙ্গমা বলে, 'শেখ মুজিব আর তাজউদ্দীন। শেখ মুজিব পাকিস্তান হওয়ার প্রথম দিন থাইকাই জানেন, এই স্বাধীনতা স্বাধীনতা না। আরেকটা স্বাধীনতার জন্য তাঁর লড়াই শুরু হইল মাত্র। বেকার হোস্টেলে ছাত্রকর্মীদের ডাইকা তিনি এই কথা বলছিলেন। আর অনেক পরে, একই কথা কইবেন অন্নদাশঙ্কর রায় নামের এক বিখ্যাত লেখককে। তত দিনে বাংলা স্বাধীন হইয়া গেছে। শেখ সাহেব তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। অন্নদাশঙ্কর রায় জিগাইলেন তাঁরে, "বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এল?"

'"শুনবেন?" মুচকি হাসি দিয়া শেখ মুজিব কইলেন, "সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি আর শরৎচন্দ্র বসু

চান যুক্তবঙ্গ। দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন তাঁরা। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় এই প্রস্তাবে। আমিও দেখি যে উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে শুরু করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে, এই আমার চিন্তা। তখন স্বপ্ন পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। লোকগুলো যা কমিউনাল। বাংলাদেশ চাই বললে সন্দেহ করত। হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে পাক-বাংলা, কেউ বলে পূর্ব বাংলা। আমি বলি, না, বাংলাদেশ।"'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'হ্যাঁ, এই তো সেই দিন, নারায়ণগঞ্জ ছাত্রলীগের সম্মেলনে তিনি পূর্ব বাংলাকে বাংলাদেশ বইলা ডাকেন।'

ব্যাঙ্গমা বলে, 'আর তাজউদ্দীন, গত বছরেই, ২৯ মার্চ ৪৮, বিকেলবেলা কার্জন হলে ছাত্রনেতা অলি আহাদ, নাঈমউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আলোচনা-তর্কবিতর্কে মাইতা উঠলেন। তাজউদ্দীনের কথা হইল, আদৌ স্বাধীনতা পাওয়া যায়নি। অলি আহাদ সেইটা মানতে চাইলেন না।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'শেখ মুজিব কইরা চলল মিছিল-মিটিং আন্দোলন-সংগ্রাম। জেল-জুলুম, পুলিশের লাঠির বাড়ি কিছুই তাঁরে দমাইতে পারে না। তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে সরকারের একের পর এক চক্রান্তের কারণে তাঁর রাগ আরও বাড়ছে।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'আর তাজউদ্দীন কইরা চলল পেপার ওয়ার্কস। নানা রকমের মেনিফেস্টো তৈরি করা, পুস্তিকা ছাপানো, মুসলিম লীগ না নতুন দল—এই সব তর্কবিতর্কে রইল মাইতা। শেখ মুজিব যেইখানেই যায়, লোকে তাকে ঘিরা ধরে। তাজউদ্দীন কাজ করে টেবিলে টেবিলে, ঘরের মধ্যের আলোচনায়। তবে তার এলাকায়ও যায়। সভা করে। ঢাকাতেও সভাসমিতি আলোচনা দেনদরবারে অংশ নেয়।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'ইতিহাস দুইজনরে এক করব। আরও পরে।'

বাতাস ওঠে। আমগাছের পাতা নড়ে, শাখা দোলে। আমের গাছে মুকুল এসেছে। মুকুলের গন্ধে একটা মাদকতা আছে। ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি সেই গন্ধভরা বাতাস বুক ভরে টেনে নেয়। তাদের ভালো লাগে।

৩৫.

শেখ মুজিবের মন খারাপ। বস্তুত ১৫০ মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সবারই মন খারাপ। হাশিমপন্থী বা সোহরাওয়ার্দীপন্থী বা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের অনেকেই আজ বিষণ্ন। সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে।

কেবল সোহরাওয়ার্দীর পরিষদ সদস্যপদ বাতিল করার জন্য গণপরিষদের সদস্যপদে থাকার যোগ্যতার বিধি সংশোধন করা হয়। এ আইন যেদিন করাচিতে পাস হয়, সেদিন মাঘের সেই শীতার্ত দিনটিতে সোহরাওয়ার্দী নিজে উপস্থিত ছিলেন অধিবেশনে। বিতর্কে তিনি অংশও নিয়েছিলেন।

গণপরিষদে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'মাননীয় স্পিকার, জীবন থাকতে কোনো ব্যক্তির নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার অথবা নিজের শোকসভায় ভাষণ দেওয়ার সুযোগ হয় না।...সম্ভবত এই আমার শেষ ভাষণ। বলা হচ্ছে যে আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তাই আইনের এই সংশোধনীগুলো করা হচ্ছে। এই আইন মানুষের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কাছে অস্পষ্ট। আমার মতে একজন নিরীহ ব্যক্তিকে গণপরিষদ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য উপস্থাপিত এইরূপ বিবরণ বিশ্বাস করতে আমি অস্বীকার করছি। যে রাষ্ট্র পৃথিবীর ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর প্রধান হতে চায়, যেখানে ন্যায়বিচার ও সহিষ্ণুতা থাকবে, সে রাষ্ট্র তার আইনবিষয়ক ক্ষমতা, তার দলীয় শক্তি, তার সরকার, তার দলীয় শৃঙ্খলা পরিচালিত করবে কেবল একজন মাত্র ব্যক্তিকে দূর করার জন্য, যার একমাত্র অপরাধ হলো এ গণপরিষদে সংখ্যালঘুর পক্ষে কথা বলা।'

স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দিলেন। কী প্রস্তাব? যে ব্যক্তি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা নন, গত ছয় মাসেও যিনি পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারেননি এবং যিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন না, তিনি সদস্য থাকতে বা নির্বাচিত হতে পারবেন না।

একে একে সদস্যরা উঠে ভোট দিতে গেলেন। কেউ সোহরাওয়ার্দীর মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। কারণ, সোহরাওয়ার্দী কিছুদিন আগেও

ছিলেন এঁদেরই মুখ্যমন্ত্রী, এঁদেরই নেতা। তিনি ২৭টা বছর আইনসভায় সদস্য ছিলেন। এই সদস্যদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে তাঁর কাছে ঋণী। তিনি একাকী একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

স্পিকার ভোটের ফল ঘোষণা করলেন।

আইনটি পাস হলো।

পরের দিন গণপরিষদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করা হলো, সরকার এইচ এস সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদের আসন শূন্য ঘোষণা করছে। সেটা করা হলো আইন প্রণয়নের মাস খানেক পরে, ২ মার্চ ১৯৪৯। সেই খবর ঢাকা এসে পৌঁছায়।

শেখ মুজিব চিৎকার করে ওঠেন, 'এই পরিষদে বহু সদস্য আছেন যাঁদের পাকিস্তানে বাড়ি নাই। কারও সদস্যপদ বাতিল হলো না, আর শুধু আমার লিডারের পদ বাতিল হলো! এই সাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রবিরোধী খাজা-লিয়াকত সরকারের বিরুদ্ধে আজ থেকে শুরু হলো আমার ডাইরেক্ট অ্যাকশন।'

মোগলটুলির কর্মীরা যে যাঁর বিছানা ছেড়ে এসে মুজিবকে ঘিরে ধরেন।

৫ মার্চ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা ছেড়ে করাচিতে চলে আসেন। ওঠেন তাঁর ভাই শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর বাসায়।

শুধু সোহরাওয়ার্দী নন, এর আগে মওলানা ভাসানীর পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্যপদও গভর্নর এক নির্দেশবলে বাতিল করে দেন।

তিনি ঢাকার ১৫০ মোগলটুলিপন্থীদের নির্দেশ দেন বিরোধী দল গঠন করতে। কামরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ কাজ খুঁজে পান।

৩৬.

১৫০ মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে মুজিব ছটফট করছেন। তাঁর চোখে ঘুম নেই। এ রকম সাধারণত হয় না। সারা দিনের মিছিল-মিটিং শেষে ঘরে ফিরে ক্লান্ত মুজিব চোখ বন্ধ করলেই ঘুমের অতলে তলিয়ে যান। আজ রাতে তা হচ্ছে না। এমনিতেই চৈত্র মাস। খুব গরম পড়েছে। হাতপাখা ঘোরাতে ঘোরাতে হাত ব্যথা হওয়ার জোগাড়।

গরম তো অন্য রাতেও পড়ে। তখন তো হাতপাখা ঘোরাতে হয় না। ঘুমিয়ে পড়লে গরমই কী আর ঠান্ডাই কী।

একটা সিদ্ধান্ত তাঁর নেওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। তাঁকে ১৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে। আর মুচলেকা দিতে হবে, এর থেকে তাঁর আচরণ ভালো করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এই নোটিশ দিয়েছে।

তিনি নোটিশটা আবার বের করেন। পকেটে থাকতে থাকতে ঘামে ভিজে কাগজের ভাঁজ প্রায় ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে গেছে। টেবিলের ওপর হারিকেন তুলে আলো বাড়ান। বিড়বিড় করে পড়তে থাকেন :

...that the following attached students be fined Rs. 15/- each and be allowed to continue as attached students to the condition that they furnish individually a guarantee of good conduct endorsed by their gurdians in the prescribed form to the relevant provost on or before the 17th April, 1949.

1. Sk. Mujibur Rahman II year LLB Roll 166 SMH

২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক দবিরুল ইসলাম, অলি আহাদসহ ছয়জনের শাস্তি হয়েছে চার বছরের বহিষ্কারাদেশ; ডাকসুর ভিপি অরবিন্দ বসুসমেত ১৫ জনের বিভিন্ন হল থেকে জরিমানা; নাইমুদ্দিন আহমেদ, ওই সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় ও তুখোড় ছাত্রীকর্মী নাদেরা বেগমসমেত শেখ মুজিবের ১৫ টাকা জরিমানা; আর একজন ছাত্রী লুলু বিলকিস বানুর ১০ টাকা জরিমানা। সে হিসাবে মুজিবের শাস্তিই হয়েছে কম। একটা মুচলেকা আর ১৫টা টাকা দিয়ে দিলেই সবকিছু ঠিক থাকে। সবকিছু ঠিক থাকবে? মুজিবুর রহমান মুচলেকা দিয়ে পড়াশোনা করবেন? সদাচরণের জন্য মুচলেকা দিতে হবে? তার মানে কি তিনি এত দিন যা করে এসেছেন তা অসদাচরণ?

কী করেছিলেন তাঁরা?

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীরা অনেক দিন ধরেই তাঁদের দাবিদাওয়া আদায়ের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আসছিলেন। আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তাঁরা ধর্মঘটে যান। তাঁদের সমর্থনে ছাত্ররাও ক্লাস বর্জন শুরু করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছাত্রধর্মঘটের ডাক দেয়। মিছিল, সভা, সমাবেশে যোগ দিতে থাকেন ছাত্ররা। দণ্ডপ্রাপ্ত ছাত্ররা ছিলেন সেই আন্দোলনের সংগঠক। নিম্ন

বেতনভুক কর্মচারীদের অবস্থা আসলেই ছিল মানবেতর। ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত বেতনকাঠামোয় তাঁরা ঠিক মানুষের মর্যাদাভুক্ত ছিলেন না। যেকোনো মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষই এই কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার প্রতি সমর্থন জানাবে।

কিন্তু সরকারের আসল ভয় ছিল আসন্ন বাজেট অধিবেশন। ওই অধিবেশন চলার সময় যেন কোনো ছাত্রবিক্ষোভ হতে না পারে, তাই সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তা-ই হয়। ডাইনিং বন্ধ করে দেওয়া হয় হলে হলে। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী হল ছেড়ে চলে যান। তখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। সব কলকাঠি আসলে পেছন থেকে নাড়ছিলেন তিনি। এই নুরুল আমিনের ধমকে মুজিবুর রহমান মুচলেকা দেবেন?

তখনই মনে পড়ে যায় আব্বার মুখ। তিনি আশা করে আছেন ছেলে জজ-ব্যারিস্টার না হোক, অন্তত অ্যাডভোকেট হবে। মনে পড়ে যায় রেনুর মুখ। তিনিও আশা করে আছেন, মুজিব পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন, হাসু আর তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসবেন। তাঁদের নিজেদের সংসার হবে।

না। একবার আপস করলে আর ঘুরে দাঁড়ানো যাবে না। ছাত্রকর্মীদের মন ভেঙে যাবে। তাঁর মিশন তো কেবল অ্যাডভোকেট হওয়া নয়। তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন আর সুভাষ বোসের জীবনকাহিনি তো এই পরামর্শ দেয় না। একবার পেছাতে শুরু করলে পেছাতে থাকতেই হবে।

সবচেয়ে ভালো হলো আন্দোলন দুর্বার করে তোলা। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। আন্দোলনের তোড়ে ভেসে যাবে সব শান্তিনামা।

মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি মুচলেকা দেবেন না। যা হয় হবে। মনে পড়ল, রেনু তাঁকে বলেছেন, পারিবারিক পিছুটানের কারণে তিনি যেন তাঁর নিজের মিশন পরিত্যাগ না করেন।

ছাত্রনেতারা বসলেন সবাই। ১৭ এপ্রিল ছাত্রধর্মঘট ও ছাত্রসভা আহ্বান করা হলো। মুজিব তাঁর বড় সংগঠক। সঙ্গে আছেন অলি আহাদ। কিন্তু এর মধ্যে অনেকেই, গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা মুচলেকাপত্র জমা দিয়ে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে গেছেন। এটা আন্দোলনের ক্ষতি করল। তবু মুজিব টলবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন ধর্মঘট পালিত হলো। সভায় ছাত্র ও কর্মচারীরা যোগ দিলেন বিপুল সংখ্যায়। সেই সভা থেকে মিছিল; সেই

মিছিল নিয়ে শেখ মুজিব, অলি আহাদ প্রমুখ গেলেন উপাচার্যের বাসভবনে। সরকারের, শিক্ষা বিভাগের, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তিরা বসলেন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে। আলোচনা আশাব্যঞ্জক বলেই মনে হচ্ছিল।

কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, যেন এই শাস্তি মওকুফ না করা হয়।

শেখ মুজিব সব বুঝতে পারলেন। তিনি অলি আহাদকে আহ্বায়ক বানালেন ছাত্র কর্মপরিষদের। এর আগের আহ্বায়ক এরই মধ্যে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছেন। ২০ এপ্রিল ঢাকা শহরে ছাত্রধর্মঘট, ২৫ এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হলো।

শেখ মুজিব বললেন, 'চাপ কমানো চলবে না। আমরা অবস্থান ধর্মঘট করব ভিসির বাড়ির সামনে।'

অবস্থান ধর্মঘট আর হরতালের খবরে ভিসির বাড়ির আশপাশ পুলিশে ভরে গেল। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনও ঘোরাফেরা করতে লাগল চারদিকে। শেখ মুজিবের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এসব ব্যাপারে অতি শক্তিশালী। তিনি বুঝলেন, এর পরের পর্ব হবে গ্রেপ্তার অভিযান। অলি আহাদকে ডেকে বললেন, 'শোনো, তুমি ছাত্র কর্মপরিষদের সভাপতি। তোমার অ্যারেস্ট হওয়া চলবে না। খবরদার, গ্রেপ্তার হবা না! সাবধানে থাকবা। রাতে হলে থাকবা না। তুমি অ্যারেস্ট হওয়া মানে কিন্তু আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়া।'

অলি আহাদ মুজিবের চেয়ে বয়সে আর অভিজ্ঞতায় ছোট, বললেন, 'জি আচ্ছা, মুজিব ভাই।'

১৯ এপ্রিল। সকাল থেকেই চলছে অবস্থান ধর্মঘট। বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল এসে ভরে তুলছে ভিসির বাড়ির সম্মুখভাগ। ধর্মঘটীদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন মুজিবুর রহমান।

সেখান থেকেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তোলে।

প্রথমে গোয়েন্দা অফিসে, তারপর কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে।

৫ নম্বর ওয়ার্ডে ঠাঁই হলো মুজিবের। কারাগারে যাওয়ার তাঁর অভ্যাস আছে। এটা নতুন কিছু নয়। পরের দিন সকালবেলা তিনি জেল কর্মচারীদের বললেন খাম, কাগজ, কলম দিতে। তিনি চিঠি লিখবেন।

তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার খবরটা আব্বা আর রেনুকে জানানো দরকার। জানানো দরকার যে তিনি ভালো আছেন।

বিকেল হতে না হতেই ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এসে হাজির অলি আহাদ।

মুজিব তাঁকে দেখেই বকাবকি করতে লাগলেন, 'অলি আহাদ, এইটা কোনো কাজ করলা! মিয়া, তোমাকে না বললাম অ্যারেস্ট হবা না। তুমি অ্যারেস্ট হয়ে চলে আসলা! এখন আন্দোলনের কী হবে?'

অলি আহাদ বললেন, 'আরে, আমি ইচ্ছা করে অ্যারেস্ট হয়েছি নাকি! চারদিকে গোয়েন্দা। কাল রাতটা তো ওদের চোখে ধুলা দিতে পেরেছি। আজ পুলিশের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়েছে। জিমনেসিয়াম মাঠে আমরা সভা করেছি। তারপর মিছিল। মিছিল ঢাকা হলের দিকে যাওয়ার পথেই পুলিশ আক্রমণ করে বসল। লাঠিচার্জ করল। কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল। আমার সঙ্গে তো রীতিমতো হাতাহাতি ধস্তাধস্তি। ওইখান থেকেই আমাকে অ্যারেস্ট করেছে। কিছু করার আছে? আমার কোনোই দোষ নাই।'

মুজিব বললেন, 'এখন আন্দোলন পরিচালনা করবে কে? লিডার লাগবে না? একজনকে বাইরে থাকতে হয়। আমি ভেতরে, তুমি বাইরে, এইটা হলে না হয় আন্দোলন হয়!'

'ঠিক। দুইজনে কারাগারে থাকলে আন্দোলন হয় না।' ব্যাঙ্গমা বলল, কলাভবনের সামনের আমগাছে বসে, 'ওই সময় অলি আহাদের সঙ্গে মুজিবের বনতেছিল ভালো।'

ওই বছরের জানুয়ারিতে মুসলিম ছাত্রলীগ, যাকে মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সদস্যরা সমর্থন করতেন, হল ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে। সলিমুল্লাহ হলের ১২ নম্বর কক্ষে তাদের সভা বসে। ওইটা ছিল অর্গানাইজিং কমিটির সভা। তাতে অলি আহাদ প্রস্তাব করেন, 'মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন করা দরকার। মুসলিম ছাত্রলীগ থাইকা "মুসলিম" শব্দটা বাদ দেওন দরকার। তাইলে সব ধর্মের ছেলেমেয়েরা এই সংগঠনে আসতে পারব।' কিন্তু সেই প্রস্তাব পাস হয় না। শেখ মুজিব কইলেন, 'অহনও সময় হয় নাই।'

তখন রাগ কইরা অলি আহাদ পদত্যাগপত্র লেইখা জমা দেন।

শেখ মুজিব সেই পদত্যাগপত্রটা নিয়া ছিঁড়া ফেলেন।

অলি আহাদ কইলেন, 'মুজিব ভাই, খালি আপনার ভালোবাসা, আমার প্রতি দুর্বলতা আর দরদের কারণে আমি এইটা উইথড্র করতেছি।'

শেখ মুজিব তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা

আমাকে ভালোবাসো, এই জন্যই তো আমি তোমাদের মুজিব ভাই।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'মুজিব তহন এই আন্দোলনে অলি আহাদরে বাইরে রাখতে চাইছিল। অলি আহাদ বাইরে থাকলে আন্দোলন হইত। সেইটা আমরা ইতিহাসে পরে দেখুম। মুজিব জেলে আছিল, তাজউদ্দীন জেলের বাইরে। স্বাধীনতাসংগ্রাম সফল হইছিল।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'অহন মুজিবও জেলে, অলি আহাদও জেলে, বাকিরা মুচলেকা দিয়া দিছে, ২৫ এপ্রিলের হরতাল ভালো হইল না। ২৭ এপ্রিল থাইকা ইউনিভার্সিটির ক্লাসও তাই চলতে লাগল ঠিকঠাক।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'আর মুজিবের ছাত্রত্ব গেল ঘুইচা।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'সেইটা ভালোই হইল। পরে কামরুদ্দীন আহমদ লিখব, "জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তার আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হলো না।" আমার নিজের ধারণা, তাঁর ওই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বাস্তব আর সময়োপযোগী হয়েছিল। তিনি তখন জননেতা হওয়ার পথে—তাঁর আর ছাত্র থাকা শোভা পাচ্ছিল না।'

৩৭.

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ৫ নম্বর ওয়ার্ডটিতেই জায়গা হলো এই রাজবন্দীদের, যাঁদের কারাগারের লোকেরা ডাকত সিকিউরিটি বলে, আইনের ভাষায় সিকিউরিটি প্রিজনার। এর আগে সিকিউরিটি বলতে এই কারাগারের সেপাই-পাহারাদার-কর্তারা আর হাজতি ও কয়েদি বন্দীরা বুঝত কমিউনিস্টদের, যাদের শরীর হবে দড়ি-পাকানো, হাড্ডিসার, পরনে থাকবে জেলের তৈরি হাফহাতা শার্ট আর পায়জামা, পায়ে থাকবে জেলের তৈরি কাঁচা চামড়ার বেঢপ স্যান্ডেল এবং পাকিস্তান তথা ইসলামের শত্রু যাদের বেশির ভাগ সময়েই আটকে রাখা হবে বন্ধ ঘরে। কিন্তু এখন যাঁরা আসছেন, শেখ মুজিব, অলি আহাদ, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, আবদুল মতিন, মাজহারুল ইসলাম, মফিজউল্লাহ—আরও অনেকে, এঁরা সবাই ছাত্র-যুবা। এঁরা কমিউনিস্ট নন, অন্তত সবাই নন, এঁরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা

করতে চান, মুসলিম লীগই করতেন একসময়, এখন মুসলিম ছাত্রলীগের সরকারবিরোধী অংশের নেতা-কর্মী। এঁরা দেখতে ঠিক কমিউনিস্টদের মতোও নন।

শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো বন্দী হওয়া ছাত্র-যুবকর্মীদের ডাকলেন। বললেন, 'শোনো, জীবনের প্রথম জেল তো তোমাদের। তোমাদের জেলের কিছু কিছু নিয়ম-কানুন শিখায়া দিই। প্রথমেই তোমাদের ওজন নিতে আসবে। সবাই যেইটা করো, পকেটে ইটের টুকরা, পাথর, যা পাও, ভরায়া লও, ওজনটা বেশি দেখাইতে হবে। ১৫ দিন পরে যখন ওজন নিতে আসবে, তখন আর পকেটে ইট রাখবা না। যে ওজনটা কমবো সেইটা পূরণ করার জন্য ডাক্তার তখন এক্সট্রা স্পেশাল ডায়েট দিবে।'

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। 'আর তোমাদের খাওয়া-দাওয়া বা অন্য কোনো অসুবিধা যাতে না হয় সেইটা আমি দেখতেছি।'

মুজিব প্রত্যেক কর্মীর নাম জানেন। তাদের নাম ধরে ধরে ডাকেন। এখন সব বন্দীর নামও তিনি মুখস্থ রাখছেন। সবার খোঁজখবর রাখছেন।

নুরুল আমিন সরকারের কারাগারমন্ত্রী মফিজউদ্দিন আহমদ এলেন কারাগার পরিদর্শনে। তিনি এলেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

'কী খবর, মুজিবর সাহেব, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?' মন্ত্রী বললেন।

শেখ মুজিব তাঁর চোখ থেকে চশমাটা খুলে বললেন, 'হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা।'

জেলারসহ সব কর্মকর্তা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন। মুজিবের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা ঘটানোর সাহস কারাগারে তো কারও হওয়ার কথা না! 'না স্যার, আপনাকে তো আমরা...' জেলারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুজিব বললেন, 'আমার ছেলেরা কম খেয়ে, না খেয়ে থাকবে আর আমি একা একা ভালো খাব ভালো থাকব, এইটা তো হয় না। আমার সব ছেলেকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদির মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৪০ সালের সিকিউরিটি প্রিজনারস রুল অনুসারে রাজবন্দীদের যেসব সুবিধা দেওয়া হতো, জালেম মুসলিম লীগ সরকার সেসব মানছে না। বেশির ভাগ রাজবন্দীকে তৃতীয় শ্রেণীর হাজতির স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এরা তো সব মারা যাবে! আর একটা রাজবন্দীর যদি কিছু হয়, মুজিবুর রহমান সেটা সহ্য করবে এটা যেন নুরুল আমিন সাহেব না ভাবে।'

মন্ত্রী বললেন, 'ওয়েল, মুজিবর সাহেব। আমি আপনার কর্মীদের সবাইকে ফার্স্ট ক্লাস স্ট্যাটাস দেওয়ার অর্ডার দিচ্ছি। ওনাদের খাওয়া-দাওয়া, পেপার-পত্রিকা, চিঠিপত্র আর যেসব ব্যাপার আছে, জেলার সাহেব, আপনি সব দেখবেন।'

কারাগারে পত্রিকা আসে সেন্সরড হয়ে। পত্রিকার পাতার কোনো কোনো অংশ কাঁচি দিয়ে কাটা থাকে। যে অংশ থাকে না, তা জানার জন্য বন্দীদের হৃদয় আঁকু-পাঁকু করে।

চিঠিপত্র আসে, তা-ও সেন্সরড।

রেনুর একটা চিঠি এসেছে। তাতে রেনু লিখেছেন, 'আল্লাহর রহমতে তুমি আবার পিতা হইতে চলিয়াছ। এখন ছয় মাস চলিতেছে। হাসু এখন অনেক কথা বলে। বাবা বলা শিখিয়াছে। আমরা সকলে ভালো আছি। আব্বা ও আম্মার শরীর ভালো। তুমি আমাদের লইয়া চিন্তা করিবা না।'

এই পর্যন্ত চিঠিটা আনসেন্সরড ছিল। এর পরে কালি মেরে কয়েক লাইন ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কারাগারবাসে অভিজ্ঞ মুজিব জানেন, এই লাইনগুলোয় আছে অনুপ্রেরণাদায়িনী কথামালা। হয়তো রেনু লিখেছেন, 'তুমি এই জালিম সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়ছো, তাতে আমাদের মাথা উঁচু হইয়াছে। দেশের জন্য লড়িতেছ, তাহা আমাদের গৌরবেরই ব্যাপার। তুমি বন্ড দিবা না।'

কী জানি, কী লিখেছেন রেনু! পড়া তো আর যাচ্ছে না। ওই লাইন কটা পড়ার জন্য মুজিবের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি কাগজে তেল লাগালেন। তারপর রোদের উল্টো দিকে ধরে পড়ার চেষ্টা করলেন। এমনিতেই চোখে কম দেখেন, তার ওপর আবার এই জ্বালা।

হঠাৎ কানে এল কোকিলের ডাক। বৈশাখ মাসে কোকিল ডাকছে কোত্থেকে! তিনি এদিক-ওদিক তাকান। ওই যে বাইরের উঁচু প্রাচীর। তার ওপারে আর কিছু দেখা যায় না। প্রাচীরের ওই পারে গাছ আছে কিছু। তার কোনোটিতে বসেই কি কোকিল ডাকছে?

রেনু আবার সন্তানসম্ভবা। এ সময় তাঁকে কি একবার দেখতে যাওয়া মুজিবের উচিত ছিল না?

আজ মুজিবের 'দেখা' আসবে। মানে তাঁর কাছে আসবে দর্শনার্থী। অনেকেই আসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এরই মধ্যে ঢাকা শহরে তিনি কম ভক্ত-সমর্থক তৈরি করেননি।

তাঁদের ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে তিনজন আছেন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো।

শামসুল হক, ফজলুল কাদের চৌধুরী আর শেখ মুজিব। ফজলুল কাদের চৌধুরী মন দিয়েছেন ব্যবসার কাজে। ফলে রাজনীতির নেতৃত্ব দেওয়ার দৌড়ে তিনি আর নাই। সামনে আছেন শুধু শামসুল হক সাহেব। তিনি আগেই ছাত্রত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন রাজনীতি করে চলেছেন। তাঁর নেতৃত্ব শক্ত হওয়ার পথে।

কিন্তু ভক্ত-সমর্থক মুজিবেরই বেশি। এর কতগুলো কারণ আছে। মুজিব সবাইকে আপন করে নিতে জানেন। সবার সুখদুখের খবর রাখেন। সবার নামধাম তাঁর মুখস্থ। একবার কারও সঙ্গে পরিচয় হলে তাকে ভোলেন না। আর তিনি বাস্তবধর্মী। কোনো আকাশকুসুম চয়নের স্বপ্ন তাঁর মধ্যে নাই। তিনি জানেন, আজকের সমস্যাটা সমাধানের জন্য আজকের লড়াইটা করতে হবে। মিছিলে যেতে হবে, সভা ডাকতে হবে, ভাষণ দিতে হবে, লড়াই করতে হবে। লাঠির বাড়ি, টিয়ারগ্যাস খেতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। ভয় পেয়ে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ, নিজের পারিবারিক বন্ধনকে বড় করে দেখলে আর যা-ই হওয়া যায়, নেতা হওয়া যায় না। নেতা মানে যে-সে নয়। নেতা তিনি, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন, যিনি মৃত্যুকে ভয় পান না।

ফলে তাঁর গুণগ্রাহী অনুসারীরা তাঁকে দেখতে আসেন প্রায়ই।

কিন্তু আজ ভিজিটরস রুমে গিয়ে দেখলেন লুৎফর রহমান সাহেব বসে আছেন। তাঁর পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা।

আব্বার সামনে দাঁড়াতে মুজিবের একটু দ্বিধাই হচ্ছিল। কারণ আব্বা সেদিনও বলেছেন তাঁর স্বপ্নের কথা। তিনি চান মুজিবুর এলএলবি পড়াটা শেষ করুক। কিন্তু এরই মধ্যে ওই ঝামেলা ঢুকেবুকে গেছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেননি। মুচলেকা দেননি। ফলে তিনি এখন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন।

আব্বা খাবার এনেছেন। মা দুধ-নারকেল দিয়ে পিঠা বানিয়ে দিয়েছেন।

'বাবা, খোকা। কেমন আছো, খোকা?'

'ভালো আছি, আব্বা। আপনারা কেমন আছেন?'

'আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছে।'

'নাসের কেমন আছে? হেলেন?'

'ভালো আছে, বাবা। সবাই ভালো আছে।'

'মার শরীরটা ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, বাবা, আছে।'

'রেনু কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'হাসু কথা বলতে পারে?'

'হ্যাঁ। সারাক্ষণ দাদা দাদা বলে ডাকে। আমি যখন বাড়ি যাই আমার কোল থেকে নামতে চায় না।'

'আব্বা, আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা চাওয়ার আছে। আমি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছি। এলএলবি পড়া বোধ হয় আর হলো না। ওরা আমাকে বন্ডসই দিতে বলে। আপস করতে জানলে তো আমাকে জেলেও আসতে হয় না। আপনাদেরও এত কষ্ট দিতাম না।'

'বাবা, খোকা। আমরা শুধু চাই তুমি ভালো থাকো। তোমার জানি কোনো কষ্ট না হয়। তোমার যেটা সুবিধা হয় তুমি সেটা করবা। তোমার অন্তরে যেটা চায় সেটা করবা। শুধু ন্যায়ের পথে থাকবা। অন্যায় করবা না। তাইলেই আমরা সুখী।'

'আব্বা, দোয়া করবেন আব্বা। মাকে বলবেন যেন বেশি পরিশ্রম না করে।'

'দেখা'র সময় ফুরিয়ে আসে। লুৎফর রহমানকে বিদায় নিতে হয়।

মুজিব হাসিমুখে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে পিতাকে বিদায় জানান। আব্বা যাওয়ার আগে ছেলের হাতে গুঁজে দেন কিছু টাকা। ছেলেও সেটা অলজ্জিত ভঙ্গিতে নিয়ে নেন।

টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি ভেতরে চলে যায়। মুজিব ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সবাইকে ডেকে বাটি দিয়ে দেন। 'সবাই মিলে খাও।'

'মুজিব ভাই, খাবার এসেছে আপনার কাছে। আপনার মা রান্না করে পাঠিয়েছেন। মায়ের হাতের রান্না অবশ্যই আপনার আগে মুখে দিতে হবে।' আবদুল মতিন বলেন।

মুজিব সেই পিঠাটার একটা অংশ ভেঙে মুখে দেন। তাঁর হঠাৎই টুঙ্গিপাড়ার কথা মনে পড়ে। রেনুর কথা, মার কথা। এই যে দুধ-নারকেলের পিঠা, এই নারকেল পাড়াতে হয়েছে গাছ থেকে, কুরতে হয়েছে। কে করেছে, হয়তো রেনুই। তখন হয়তো হাসু তার কোলের মধ্যে বসা। উঠোনে বসে এই গ্রীষ্মের গরমে ওরা কাজ করছে। ওদিকে ঢেঁকিতে শব্দ উঠছে একটানা, নরম চালের ওপরে ঢেঁকি পড়ছে, আটা বেরোচ্ছে সাদা সাদা, মা সেই আটা ঢেঁকির মুখ থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন...

কী জানি কেন, মুজিবের মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা, যেদিন তিনি—বালকবেলায়—মধুমতী নদী পেরিয়ে তাঁর মিতা খোকা কাজীসমেত চলে গিয়েছিলেন মোল্লার হাট থানার বড়বাড়িয়ায়। আব্বাসউদ্দীন গান করবেন মুসলিম লীগের সভায়। সভায় স্পিকার তমিজউদ্দিন খান ছিলেন। আব্বাসউদ্দীন গান করবেন। ঘোষণা হলো। এক মাওলানা সাহেব তাঁর পাগড়িটা খুলে ভালোমতো কানে পেঁচালেন, যাতে গানের সুর তাঁর কানে প্রবেশ না করে। প্রথমে আব্বাসউদ্দীন গাইলেন 'বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে...', পরের গান তিনি ধরলেন 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই...' গানের মাঝে তিনি 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে জিকিরের মতো করতে লাগলেন। মাওলানা সাহেব তখন কান থেকে পাগড়ি সরালেন।

সেই তমিজউদ্দিন খান এখন স্পিকার, তাঁরই সভাপতিত্বে পরিষদের বৈঠকে লিডার সোহরাওয়ার্দীর সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে।

তবে লিডার পাকিস্তানে চলে এসেছেন। ভাইয়ের বাসায় উঠেছেন। ঢাকায়ও এসেছিলেন একটা ব্যারিস্টারির কাজে। মুজিব ছাড়া পেয়েই লিডারের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বিরোধী রাজনীতি সংগঠনের কাজে।

শেখ মুজিবের কাছে কারাগারের ভেতরেই আজ একটা বিচার এসেছে। বিচারপ্রার্থী বাহাউদ্দিন আহমদ। তরুণ এই কর্মীটি একটু বেশিই বামঘেঁষা। কিন্তু তাঁর বাবা বরিশালের উলানিয়ার বিখ্যাত জমিদার। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের আদরের সন্তান। এখন নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবাসী।

বাহাউদ্দিন বললেন, 'মুজিব ভাই, খুব একটা সমস্যা হয়েছে। মা আমার সঙ্গে "দেখা"র দিন বরফি মোরব্বা—সব তাঁর নিজ হাতে বানানো—বিদেশি বিস্কুটের কৌটা দিয়ে গিয়েছিলেন; সবই আমার মাথার কাছে রাখা ছিল। জানেনই তো আমার ঘুমটা একটু বেশি। ঘুম থেকে উঠে দেখি কৌটা, টিফিন ক্যারিয়ার সব খালি। এখন নাশতা করব। উঠে দেখি সামান্য কিছু রেখেছে। বেশির ভাগটাই নাই।'

মুজিব বললেন, 'এই তোমার ঘুম থেকে ওঠার আর নাশতা করার সময়। ১০টা বেজে গেছে না?'

'জি, মুজিব ভাই। আপনি জানেন আমার ঘুম বেশি।'

'কে নিতে পারে?'

'সব তো ভদ্র বন্দী। ওয়ার্ড তালা মারা। বাইরের ওয়ার্ডের কেউ এসে

ঢুকবে তারও উপায় নাই।'

মুজিব মাথা চুলকাচ্ছেন। এ তো প্রায় ভুতুড়ে কাণ্ড!

সবাই মাথা নিচু করে আছে। এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎই আতাউর রহমান হেসে উঠলেন।

মুজিব বললেন, 'কী রহমান, হাসো কেন?'

'অলি আহাদকে জিজ্ঞেস করেন,' বলে রহমান যতই হাসি রোখার চেষ্টা করছেন, ততই তাঁর হাসি ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

'অলি আহাদ!' মুজিব তাঁর দিকে তাকালেন।

অলি আহাদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'মুজিব ভাই। শোনেন। ছোটবেলায় আমার কালাজ্বর হয়েছিল। বহু কিছু খাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু ছোট মানুষ কি বারণ শুনতে পারে! ফলে ছোটবেলা থেকেই খাবার চুরি করে খাওয়া আমার অভ্যাস। একবার চিংড়ি মাছ চুরি করে খেতে গিয়ে মায়ের হাতে বমাল ধরা পড়েছিলাম।'

মুজিব বললেন, 'এই তো ভূত ধরা পড়ছে।'

'মুজিব ভাই, আমি একা নই। ওরাও সবাই আমার সঙ্গে ছিল। আর পুরাটা তো খালি করি নাই। আমার কুম্ভকর্ণ বন্ধুটির জন্যও কিছু রেখে দিয়েছি।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

অলি আহাদ বললেন, 'এই যে কারাগারের মধ্যে প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন, এ জন্য তো আপনাদের উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া।'

৩৮.

তাজউদ্দীনের ঘুম নাই, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নাই। তাঁর সঙ্গের কারই বা আছে! এই যাঁরা, মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের যুবকেরা, টাঙ্গাইলে এসে শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারকাজ চালাচ্ছেন! এই আসনটা ছিল মওলানা ভাসানীর। খাজা-লিয়াকত আর নুরুল আমিনরা চান না ভাসানীকে রাজনীতিতে সক্রিয় রাখতে। তাই তাঁরা সেটাকে শূন্য ঘোষণা

করেন। সরকার আর মুসলিম লীগের প্রার্থী করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার খোরম খান পন্নী। আর মোগলটুলিকেন্দ্রিক বিরোধী রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় শামসুল হককে। শামসুল হক সাধারণ কৃষকের ছেলে। পন্নীদের প্রজা। তাঁর টাকাপয়সা বলতে কিছু নাই। এমনকি তাঁদের কোনো দলও নাই।

তার ওপর নুরুল আমিন এখন মুখ্যমন্ত্রী, টাঙ্গাইল তাঁরই এলাকা।

তাজউদ্দীনরাই এখন শামসুল হকের ভরসা। ঢাকা থেকে এসেছেন খন্দকার মোশতাক, শামসুজ্জোহা, শওকাত আলী, আজিজ আহমেদ এমনি আরও অনেকে। তাঁরা উঠেছেন খোদাবক্স মোক্তারের বাড়িতে।

এর মধ্যে কামরুদ্দীন সাহেব এলেন। তিনি ৫০০ টাকা নিয়ে এসেছেন বিভিন্ন জনের কাছ থেকে জোগাড় করে। যাক, কিছু টাকা তো লাগেই। আলমাস সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া গেল আরও ৮০০। শামসুল হকের ভাই নুরুল হক কয়েক মণ চাল দিয়ে গেলেন। যাক, এটা দিয়ে কর্মীদের, যারা অন্তত ঢাকা থেকে এসেছে, তাদের খাওয়াটা চলবে।

কিন্তু এ যে হাতির সঙ্গে পিঁপড়ার যুদ্ধ!

নুরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী, গরুর গাড়ি বোঝাই করে চাল পাঠাচ্ছেন নির্বাচনী এলাকায়।

তাজউদ্দীন বললেন, 'কামরুদ্দীন সাহেব, এইভাবে ভোটারদের কিনে ফেললে শামসুল হক সাহেব জিতবেন কী করে?'

কামরুদ্দীন বললেন, 'না, আমি পথে শুনে এলাম, লোকে বলছে, সারা দেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা, লোকে খেতে পাচ্ছে না, কর্ডন করে রাখা হয়েছে জেলাগুলো, রাস্তায় মানুষ তার বিরুদ্ধে মিছিল করছে, আর এত চাল ইলেকশনের এলাকায় যাচ্ছে, ব্যাপার কী? তার মানে, সরকারের গুদামে চাল আছে। সরকার ইচ্ছা করে আমাদের না খাইয়ে মারছে।'

তাজউদ্দীন মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, এটা সরকারের জন্য হিতে বিপরীত হবে। আচ্ছা, রণদাপ্রসাদ সাহার কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি না? উনি তো আমাদেরই সমর্থন করবেন, এটা স্বাভাবিক। আপনার সঙ্গেও না ভালো সম্পর্ক?'

কামরুদ্দীন সাহেব এক হাতের আঙুল আরেক হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, 'আরেক মিনিস্টার এসে উঠেছেন আর পি সাহার বাসায়। হামিদুল হক চৌধুরী। আমার একটা সোর্স বন্ধ হয়ে গেল।'

নির্বাচনের খেলা জমে উঠল। হাতি আস্তে আস্তে কাদায় পড়তে লাগল।

তাজউদ্দীন একটা লিফলেট পড়ে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। পন্নীর স্ত্রী লিফলেট ছেড়েছেন। বলছেন, 'আমি তাঁর স্ত্রী, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে না থেকে তাঁর আপন বোনের সঙ্গে থাকেন।' সবাই এই লিফলেট নিয়ে কথা বলতে বেশি উৎসাহী। তাজউদ্দীন নন। তিনি মানুষকে বোঝান সরকার কীভাবে সব দিক থেকে মানুষকে শোষণ করছে, পাকিস্তান কীভাবে নতুন ঔপনিবেশিক শক্তি হয়ে উঠছে, জমিদাররা কীভাবে গরিবদের শোষণ করে।

হামিদুল হক চৌধুরীও বিপদে পড়লেন। *মর্নিং নিউজ*-এ খবর উঠেছে, ভারতের ডালমিয়ার যে ড্রামগুলো পাকিস্তানে আটকা পড়েছিল, সেসব ভারতে যেতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য চৌধুরী ঘুষ খেয়েছেন।

এটা নিয়ে জনগণ তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

এদিকে হযরত আলী আসাম থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি দেখা করেছেন সেখানে ধুবড়ি কারাগারে আটক মওলানা ভাসানীর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে স্বাক্ষর করিয়ে এনেছেন টাঙ্গাইলের এই নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের উদ্দেশে লিখিত আবেদনপত্র। মওলানা বলেছেন শামসুল হককে ভোট দিন।

সেটা নিয়ে সবাই উত্তেজিত। কামরুদ্দীন সাহেব সেটা দেখে বললেন, 'এটা দিয়ে কোনো কাজ হবে না।'

হযরত আলী বললেন, 'কেন?'

কামরুদ্দীন বললেন, 'এতে জেলের সিকিউরিটি অফিসারের সিল নাই। এটা প্রচার করা হবে আইনের পরিপন্থী।'

'আরে, তাতে কী? এতে আইন ভঙ্গ হলে মওলানা ভাসানীর হবে, শামসুল হকের তো হবে না। আমরা এই আবেদনপত্র ছাপাব। বিলি করব। শামসুল হক জয়লাভ করবে। কারণ আকরম খাঁ, নুরুল আমিন আর ইউসুফ আলী চৌধুরী মিলে পন্নীর পক্ষে ভোট চেয়ে প্রচারপত্র বিলি করছে।'

'না, তা করা উচিত হবে না।' কামরুদ্দীন বললেন।

কামরুদ্দীন সাহেব আইনজীবী মানুষ। সামনে তাঁর বড় একটা মামলা পরিচালনা করতে হবে। দুই জমিদারের মধ্যে জমি নিয়ে গোলযোগে ১৯ জন খুন হয়েছে। খুব বড় মামলা। কামরুদ্দীন আহমদ টাঙ্গাইল ছাড়লেন।

শামসুল হকের একটা সাইকেল ছিল। সেটা নিয়ে তিনি প্রত্যেক ভোটারের বাড়ি যেতে লাগলেন। ভাসানীর আবেদনটাও ছাপা হয়ে বিলি হতে লাগল।

২৬ এপ্রিল, ১৯৪৯ নির্বাচন। সকাল থেকে তাজউদ্দীন ভোটের কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছেন শামসুল হকের সঙ্গে সঙ্গে। তিনিও একটা সাইকেল জোগাড় করে নিয়েছেন।

ভোটাররা সব শামসুল হককে ঘিরে ধরছেন। বোঝাই যাচ্ছে, জনমত শামসুল হকের দিকে।

ভোট গণনা হলো সারা রাত। সকালবেলা জানা গেল, পিঁপড়ার কাছে হাতি ধরাশায়ী হয়েছে। সামান্য প্রজার কাছে হেরে গেছেন জমিদারপ্রবর। নির্দলীয় প্রার্থীর কাছে হেরেছেন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রার্থী। মুখ্যমন্ত্রী আর মন্ত্রীর প্রার্থী হেরেছেন কতগুলো যুবক ছেলের দলহীন দলের কাছে।

এই উপনির্বাচনে হারার পর ভয়ে মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে আর কোনো নির্বাচন দেয়নি।

শামসুল হক ঢাকায় ফিরবেন কিছুদিন পর। তাজউদ্দীন ঢাকায় ফিরে এলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজেকে অচেনা লাগছে। একি হাল তাঁর চেহারার! ধূলিধূসরিত সমস্ত শরীর। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে তামা হয়ে গেছে।

তিনি তবু হাসলেন।

এই দেশে সামন্ততন্ত্রের পতন শুরু হয়েছে।

জমিদার হেরে গেছে সাধারণ প্রজার কাছে।

ঢাকায় ফিরেও কাজের বিরাম নাই।

একটা বিরোধী দল গঠন করা হবে। রোজ গার্ডেনের বাড়িতে সমমনা রাজনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। কামরুদ্দীন সাহেব সেই কাজে ব্যস্ত। তাঁর একান্ত সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদ আর তাঁর সাইকেল।

৩৯.

মওলানা ভাসানীকে একটা কম্বল দিয়ে পেঁচানো হয়েছে। ৬৫-৭০ বছর বয়স এখন তাঁর। আষাঢ়ের গরমে তিনি সেদ্ধ হচ্ছেন। তাঁকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে বসানো হয়েছে। পাশে বসেছেন শওকত আলী। ঘোড়ার গাড়ি ছুটছে মোগলটুলি থেকে। রোজ গার্ডেন নামের বাড়ির দিকে। বাড়িটা স্বামীবাগে। বাড়ির মালিক কাজী মোহাম্মদ বশির হুমায়ুন। রোজ গার্ডেন নামের বাড়িটা যেন সত্যি গোলাপের বাগান। দোতলায় হলঘর।

সেখানে ঠাঁই নিতে পারে শ চারেক মানুষ।

ঢাকায় সিমেন্টের তৈরি পাকা বাড়ি কম। বেশির ভাগ বাড়িঘর কাদাসুরকি দিয়ে গড়া, এগুলোকে বলা হয় গঙ্গা-যমুনা গাঁথুনি। ছাত্রদের ইকবাল হল মুরলি বাঁশের তৈরি। সে তুলনায় রোজ গার্ডেন সত্যিই একটা ব্যতিক্রম।

মওলানা ভাসানীকে ওই বাড়িতে রাখা হলো। তাঁর বাইরে বেরোনো নিষেধ। কারণ, পুলিশের ভয়।

মওলানা সম্প্রতি কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছেন আসামের ধুবড়ি থেকে। তিনি ছিলেন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের কাছে তিনি অবাঞ্ছিত। এক বছর আগে আইনসভার বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা করার সময় মওলানা আইনসভায় ইংরেজিতে বক্তৃতা না করে বাংলায় করার আহ্বান জানান। বলেন, 'জনাব্ সদর সাহেব, এখানে যাঁরা সদস্য আছেন, তাঁরা সবাই স্বীকার করবেন যে এটা বাংলা ভাষাভাষীদের দেশ, এই অ্যাসেম্বলির যিনি সদর, তিনিও নিশ্চয়ই বাংলাতেই বলবেন। আপনি কী বলেন, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না...আশা করি, আপনি বাংলায় রুলিং দেবেন।' এরপর তিনি সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করতে শুরু করেন। এ কারণেই সরকার তাঁর সদস্যপদ বাতিলের অজুহাত খুঁজতে থাকে। তিনি নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেননি, এই অজুহাতটা পাওয়া যায়। অবশ্য ওই হিসাব কেউ-ই জমা দেননি, তাতে কী, এখন মওলানা ভাসানীর সদস্যপদ নিয়ে কথা হচ্ছে, আগে তাঁরটা বাতিল করা হোক।

তো, মওলানা ভাসানীকে পাওয়া গেছে ঢাকায়। মাঝখানে আসামে গিয়ে তিনি কিছুদিন জেল খেটে এসেছেন। ওদিকে সোহরাওয়ার্দীও কিছুদিন আগে ঢাকা এসেছিলেন মামলা পরিচালনার কাজে। তিনি পরামর্শ দেন, ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম দিয়ে একটা বিরোধী সংগঠন খোলা হোক। মওলানা ভাসানীকে করা যেতে পারে তার সভাপতি। শামসুল হকের কাছে পন্নীর পরাজয়ে সবাই খুবই উৎসাহিতও আছে। মোগলটুলির কর্মীরা তাই উৎসাহভরে কাজ করছে একটা নতুন দল গঠনের জন্য।

মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ, যারা আবুল হাশিম আর সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক, তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। হলঘর গমগম করছে ২৫০-৩০০ লোকের উপস্থিতিতে।

তাজউদ্দীন আহমদ এতে উপস্থিত আছেন। হাজির হয়েছেন অলি আহাদও।

আতাউর রহমান খান এসেছেন। ফজলুল হক খানিকক্ষণ থেকে বক্তৃতা দিয়েই চলে যান। শামসুল হকের নেতৃত্বে মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সবাই এতে যোগ দেন।

সভায় ৪০ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। সহসম্পাদক খন্দকার মোশতাক আহমদ। সদ্য কারামুক্ত ছাত্রনেতারা একযোগে শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করায় তাঁকে একমাত্র যুগ্ম সম্পাদক করা হয়।

খন্দকার মোশতাক একটু মন খারাপ করলেন। তাঁকে মুজিবের পরে রাখা হলো কেন? মওলানা ভাসানীকে কাল রাতে কম্বল পেঁচানোর সময় তিনি কি তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরেননি? শামসুল হকের সঙ্গে টাঙ্গাইল গিয়ে তাঁর পক্ষে অমানুষিক শ্রম স্বীকার করেননি? শেখ মুজিবের চেয়ে তিনি কি বয়সে এক বছরের বড় নন?

শেখ মুজিব কারাগারে বসে জানতে পারেন, তিনি এই নবগঠিত দলের যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন। সম্পাদক হয়েছেন শামসুল হক।

শেখ মুজিব নিজের পদমর্যাদা নিয়ে চিন্তিত হলেন না। বরং তাঁর ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হলো, সেটি নিয়েই তিনি বেশি ভাবিত। এখন তিনি একটা দল পেয়ে গেছেন। কারাগার থেকে বেরিয়েই তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দল আর মানুষকে সংগঠিত করার কাজে।

পরের দিন, ২৪ জুন, ১৯৪৯। আরমানিটোলা ময়দানে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভা। প্রথম জনগণের সামনে আসা।

বিকেলবেলা। একটু পরে জনসভা শুরু হবে। হাজার চারেক লোক এরই মধ্যে উপস্থিত। হঠাৎই হামলা করে বসে মুসলিম লীগের গুন্ডারা। তারা মঞ্চ ভেঙে ফেলে, চেয়ার-টেবিল তছনছ করে।

মঞ্চ দখল করে মঞ্চের ওপর সবচেয়ে বেশি যে লাফায় তার নাম শাহ আজিজ। এখন মুসলিম লীগের নেতা।

শেখ মুজিব কারাগারে, তা না হলে শাহ আজিজকে তিনি মনে করিয়ে দিতে পারতেন কুষ্টিয়া সম্মেলনের মুষ্ট্যাঘাতটার কথা।

ওই টর্নেডো চলে গেলে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা আবার মঞ্চে ওঠেন। মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে লীগ সরকারের ২২ মাসের অপকীর্তি তুলে ধরেন।

৪০.

আজ মুজিবকে কারাগার থেকে আদালতে নেওয়া হবে। তোলা হলো প্রিজনার্স ভ্যানে। শেভ করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে মুজিব ধীরেসুস্থে উঠলেন ভ্যানে।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। গরমও পড়েছে। ভ্যান থেকে নেমে মুজিব ইচ্ছা করেই খানিকটা দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির পানি তাঁর চুল, পাঞ্জাবি ভিজিয়ে দিচ্ছে। তিনি তা-ই চান। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এই বৃষ্টির পানির স্পর্শটুকু তাঁর খুব ভালো লাগে।

আদালতে ভিড় করলেন কর্মীরা। বিশেষ করে ছাত্ররা। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা তো বটেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-কর্মচারীরাও। তাঁদের মধ্যে থেকে তাঁদের দাবিদাওয়া আদায় করতে গিয়ে মুজিব গ্রেপ্তার হয়েছেন। আর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা। মুজিব ভাইকে আজ কোর্টে তোলা হবে, শুনে তাঁরা তাই এসেছেন দল বেঁধে।

মুজিব প্রত্যেকের নাম ধরে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। 'এনামুল কেমন আছো?' 'আসগর আলী, শফিকুর রহমান?'

বারান্দায় ভিড় জমে যায়। সেই ভিড়ের মধ্যেই হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে একজন শার্ট পরা সৌম্যদর্শন মানুষের ওপর। আরে, মানিক ভাই এখানে! 'মানিক ভাই! এই ছাত্র ভাইরা, একটু সরো। আমার ভাইকে একটু কাছে আসতে দাও।'

ভিড় সরে যায়। তফাজ্জল হোসেন মানিক এগিয়ে আসেন।

বরিশালের ভান্ডারিয়ার ছেলে মানিক ভাই। পিরোজপুর স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বিএ। সরকারি

চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ তো মুখ নয়, যেন বন্দুকের নল। সরকারের বিরুদ্ধেই তা থেকে নানা ধরনের গোলা বের হতো। কাজেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চললেন কলকাতা।

তাঁর সঙ্গে মুজিবের পরিচয় বছর ছয়েক আগে, সেই কলকাতায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বাসায়। দুজনই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভক্ত। ভক্ত থেকে তাঁরা হয়ে গেলেন সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য। একই নেতার দুই শিষ্য, যেন এক পিতার দুই সন্তান। মানিক ভাইকে মুজিবের মনে হয় নিজের বড় ভাইয়ের মতো। তাঁর চেয়ে বছর নয়-দশেকের বড়ই হবেন মানিক মিয়া।

মানিক মিয়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাগজ *ইত্তেহাদ*-এ কাজ করতেন। ব্যবস্থাপনার কাজ।

সাতচল্লিশের পরপর যে তিনি কলকাতা ছেড়েছেন, তা নয়। *ইত্তেহাদ* কলকাতা থেকে বের করা হচ্ছিল। সেখান থেকেই ঢাকা আসত। শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন তা ঢাকায় বিলিও করেছেন। কিন্তু খাজা নাজিম উদ্দিন পূর্ব বাংলায় *ইত্তেহাদ* প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। ফলে পত্রিকাটার প্রচারসংখ্যা গেল কমে, আর্থিকভাবে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

মানিক মিয়া সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ঢাকায় চলে এসেছেন। মুজিব, মানিক—দুই ভাই আবার এক শহরে।

মানিক দেখলেন, মুজিবের মাথায় বিন্দু বিন্দু জল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে জল মুছে দিলেন। তারপর আরেক পকেট হাতড়ে বের করলেন একটা কাগজ। 'দেখো।'

'কী এটা?'

'আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি। করাচিতে পোস্টিং। আপনি কী বলেন, যাব?'

'আপনি না এখানে একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করার চেষ্টা করছেন?'

'করছি তো। কিন্তু সাধ্যে তো কুলাচ্ছে না। চারদিকে বিরূপ পরিবেশ। সোহরাওয়ার্দীর লোক আমরা। এখানে কেউ আমাদের বাসাটা পর্যন্ত ভাড়া দিতে চায় না।'

'তা তো আমি জানি। কিন্তু মানিক ভাই, আমাদের তো একটা মিশন আছে। গণতন্ত্র, গভর্নমেন্ট বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল অব দ্য পিপল। আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নিয়ে চলে গেলে আমাদের সেই

মিশনের কী হবে?'

'যাব না বলছেন?'

'লিডারের আদর্শের পক্ষে এত দিন কাজ করলেন, আর আজ করাচি যাবেন খাজার চাকরি করতে?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। ছেলেপুলে নিয়ে পানের দোকানদারি করে খাব। সেও ভালো। তবু ওদের চাকরি নয়।'

আদালত বসছে। মুজিব এজলাসের দিকে এগোলেন। অধৈর্য পুলিশ তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

'মানিক ভাই, আপনার ছোট ভাই মুজিব বেঁচে থাকলে আপনার স্বপ্ন সাপ্তাহিক কাগজ অবশ্যই বের হবে। ইয়ার মোহাম্মদ আমার দোস্ত। আপনি তাঁর কাছে যান। আমার কথা বলেন।' বলতে বলতে মুজিব এজলাসের ভেতর ঢুকে গেলেন।

৪১.

আওয়ামী মুসলিম লীগের কাজ চলছে সারা প্রদেশে। মওলানা ভাসানী ঘুরে বেড়াচ্ছেন জেলা থেকে জেলায়। শামসুল হক তৎপর। কিন্তু কাগজে তাঁদের কথা প্রকাশ হয় না। *আজাদ* ঢাকায় এসেছে, এটা তো খাজাসমর্থক কাগজ। *অবজারভারও* তা-ই।

একমাত্র উপায় হলো নিজেদের কাগজ বের করা। মানিক মিয়ার সাধ আছে সাধ্য নাই।

মানিক মিয়া গেলেন ইয়ার মোহাম্মদের কাছে। ইয়ার মোহাম্মদের বাবা ছিলেন ঢাকার বড়লোকদের একজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে বিমানবন্দর নির্মাণের ঠিকাদারি করে তিনি বিশাল ধনী হয়েছিলেন। ইয়ার মোহাম্মদ যখন স্কুলে পড়েন, তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। ইয়ার মোহাম্মদ অগাধ সম্পত্তির মালিক হন। তখন থেকেই তিনি রাজনীতিসচেতন, সমর্থন করতেন মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপটাকে।

এরই মধ্যে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

মওলানা ভাসানী আর তাঁর আওয়ামী মুসলিম লীগকে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে তুলেছেন। তাঁর কারকুন লেনের বাড়িতেই মওলানা ভাসানী থাকেন। এটাই আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস। ইয়ার মোহাম্মদের স্ত্রী বয়স্ক মওলানার সেবাযত্ন করতেন। সারাক্ষণ পার্টির নেতা-কর্মীতে বাড়ি গমগম করত। পারিবারিক গোপনীয়তা বলতে তাঁদের আর কিছুই রইল না। ইয়ার মোহাম্মদের স্ত্রী-সন্তানদের সমাজের নানা কথা শুনতে হতো, বৈরী সরকারের জুলুমের ভয় তো ছিলই।

ইয়ার মোহাম্মদকে মানিক মিয়া তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। 'সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে চাই। শেখ মুজিব আপনার কাছে আমাকে আসতে বলেছেন।'

'আচ্ছা, এসেছেন যখন, মুজিব ভাই যখন বলেছেন, হবে।'

এদিকে সরকারি কাগজগুলোয় শুধু সরকারের পক্ষের খবর ছাপে; বিরোধী আওয়ামী মুসলিম লীগের খবর ছাপে না। মওলানা ভাসানী যারপরনাই বিরক্ত। তিনি উদ্যোগী হলেন।

ঢাকা বার লাইব্রেরিতে গেছেন তিনি। আইনজীবীরা তাঁকে ঘিরে ধরলেন। মওলানা বললেন, 'আমি একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই। আপনারা আমাকে সাহায্য করেন।'

আইনজীবীরা সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করলেন। ৪০০ টাকা চাঁদা উঠে গেল তখনই।

মুজিব মুক্তি পেলেন কারাগার থেকে। কারাগারের গেটে ভিড় লেগে গেল। মুজিব খোলা আকাশের নিচে আসামাত্রই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন শামসুল হক। ইয়ার মোহাম্মদ খান এগিয়ে এলেন। বললেন, 'জিপগাড়ি এনেছি। আপনি ওঠেন। আপনার আব্বা এসেছেন। কথা বলেন। চাচা, চাচা, আপনি আসেন।'

লুৎফর রহমান সাহেব ভিড়ের চাপে মুজিবের কাছেই ঘেঁষতে পারছেন না।

মুজিব 'আব্বা' বলে এগিয়ে গেলেন। জড়িয়ে ধরলেন পিতাকে।

ভিড়ের চাপে কি কথা বলা যায়।

জিপ চালাবেন ইয়ার মোহাম্মদ। তাঁর পাশে বসলেন শামসুল হক, তাঁর পাশে লুৎফর রহমান। পেছনের সিটে বাম পাশে বসলেন মুজিব।

ভিড়ের চাপে জিপ এগোতেই পারছে না।

কারাগার থেকে বেরিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুজিব। একটার পর একটা মিছিল করছেন। সমাবেশ করছেন।

ইত্তেফাক বের করতে হবে। টাকা দরকার। শেখ মুজিব চাঁদা তুললেন কিছু।

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠাতা, ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রকাশক আর মুদ্রাকর, সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* বের হতে লাগল। প্রথম দিকে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*কে। শুধু ডিক্লারেশন বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাসে দুই পাতা বের করা হতো।

তখন এগিয়ে এলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি মওলানা ভাসানীকে বললেন, '*ইত্তেহাদ*-এ আমি ছিলাম সুপারিনটেনডেন্ট। কাগজ কী করে বের করতে হয়, এটা আমি জানি। আমি পারব। দায়িত্বটা আমার ওপর ছাড়েন।'

মানিক মিয়ার ওপর দায়িত্ব দেওয়ার পরে সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* সজীব হয়ে উঠল।

আওয়ামী মুসলিম লীগ তার খবর প্রকাশের একটা মাধ্যম খুঁজে পেল। বাংলার মানুষও পড়ার মতো একটা কাগজ পেয়ে গেল। পত্রিকাটা জনপ্রিয়তা পেতে লাগল হুহু করে। তাতেই টনক নড়ে গেল সরকারের। তারা ছাপাখানার মালিকদের ভয়ভীতি দেখাতে লাগল কেউ যেন ওই কাগজ না ছাপে। মালিকেরা সরকারের ভয়ে *ইত্তেফাক* ছাপতে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল।

একটার পর একটা ছাপাখানা বদল করতে হলো পত্রিকাটিকে।

৪২.

শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকারের পুলিশ, পুলিশের গোয়েন্দাদের চলছে ইঁদুর-বিড়াল খেলা। মুক্তি পেয়েও মুজিবের শান্তি নাই। তিনি গোপালগঞ্জ যান। আবদুস সালামও তাঁর সঙ্গে আছেন। মুজিব জনসভা করবেন।

চোঙামাইকে প্রচার চলেছে। এরই মধ্যে থানায় থানায়, ইউনিয়নে ইউনিয়নে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হচ্ছে। চারদিকে ব্যাপক সাড়া। স্টিমার থেকে গোপালগঞ্জ ঘাটে মুজিব যখন নামছেন, তখনই ঘাটে ভিড়।

সরকার ভয় পেয়ে গেল। প্রশাসন আর মুসলিম লীগ নেতাদের টনক গেল নড়ে। কী করা যায়? তারা ১৪৪ ধারা জারি করল। অর্থাৎ সভা করা যাবে না।

শেখ মুজিব ওই বান্দা নন যে প্রশাসন তাঁকে বাধা দিল, আর গ্রেপ্তারের ভয়ে তিনি তাঁর আহূত জনসভা থেকে বিরত থাকবেন।

তিনি কোর্ট মসজিদে মিলাদের কর্মসূচি দিলেন। সবাই হাজির হলো মসজিদ প্রাঙ্গণে। শেখ মুজিব মিনারে উঠে বক্তৃতা শুরু করলেন। এই এলাকাটাও ১৪৪ ধারার অধীনে আছে, মসজিদের ভেতর মিলাদ পড়া যাবে, কিন্তু বাইরে সভা করা যাবে না।

মুজিব বললেন, 'আমি গ্রেপ্তার বরণ করার জন্য প্রস্তুত আছি। তবু আমার কণ্ঠস্বর কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না।'

হাজার হাজার মানুষ চিৎকার করে উঠল, 'শেখ মুজিবের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে'।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগে মামলা করে দিল।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এসব তথ্য প্রতিবেদন আকারে পাঠাল তাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে।

রাতের বেলা মুজিব হাজির হলেন তাঁদের গোপালগঞ্জের বাসায়।

বাবা বললেন, 'খোকা, বাড়ি যাবা না? বউমার তো যখন-তখন অবস্থা?'

মুজিব বললেন, 'যাব, কাল সকালেই রওনা দেব। পুলিশ আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ১৮৮ ধারা।'

গোপালগঞ্জ থেকে নৌপথে রওনা হলেন মুজিব, টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশে।

হাসুর বয়স সামনের মাসে দুই বছর পুরো হবে। সে এখন অনেক কথা বলে। প্রথম প্রথম আব্বার কোলে উঠতে চাইত না। পরে ঠিকই উঠল। বাপের ঘাড়ে মাথা গুঁজে দিল। মুজিব তাঁকে নিয়ে চললেন খালের পাড়ে।

খালটা ছোট, কিন্তু খাড়া। ভেতরে বড় বড় নৌকা। জোয়ার-ভাটা হয়

নিয়মিত। তিনি বাচ্চা কোলে হাঁটেন, তাঁর এলাকার বন্ধুবান্ধব সব হাজির হন তাঁর কাছে। তরুণ-কিশোরেরাও আসে। মিয়া ভাই এসেছেন, তারা তাঁকে দেখতে চায়। এর মধ্যে মিয়া ভাইকে যে পুলিশ আটক করেছিল, তিনি যে আবারও কারাগার থেকে ঘুরে এসেছেন, এলাকার মানুষ জানে।

তাঁরা তাঁকে কত প্রশ্ন করেন!

'মিয়া ভাই, চাউলের দাম যে খালি বাড়তিছে, এই আজাদির কী মানে হইল?'

'মিয়া ভাই, সুরাবার্দী সাবরে মিনিস্টার বানাবি না?'

'খোকা, মাওলানা ভাসানী কেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হইল? সরওয়ার্দী সাব নাইলে এ কে ফজলুল হক তো হইতি পারত!'

বিকেল বেলা! আকাশে মেঘ। বৃষ্টি হবে নাকি আবার! মেয়েকে কাঁধে নিয়ে মুজিব চললেন বাড়ির দিকে। পেছনে পেছনে চললেন দর্শনার্থীরাও।

মুজিব বললেন, 'হেলেন, চিড়ামুড়ি কী আছে, দাও দিকিনি। এরা কি খালি মুখে যাবে?'

রেনু বললেন, 'আমি উঠছি। আমি দেখতেছি।'

তিনি বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর পেটটা এবার বেশ উঁচু।

মুজিব বললেন, 'না না, তুমি উঠো না। তুমি বসে থাকো। আমি দেখতেছি। ওরাও দেখবে নে।'

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি এল। রেনু ঘরে গিয়ে বসলেন। অসময়ে এই শরীরে বৃষ্টির ছাট লাগানো ঠিক হবে না। মুজিব হাসুকে দিয়ে দিলেন তাঁর মায়ের কোলে।

হাসু দাদির কোলে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল।

'দাদি' 'দাদি' বলে কী যে একটা হাসি হাসল বাচ্চাটা!

মুজিব বারান্দায়। কিন্তু তাঁকে দেখতে আসা ছেলেপুলের দল উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যে বৃষ্টিতে ভিজছে তাতে তাদের কোনোই আপত্তি নেই।

মুজিব ভাবলেন, এই লোকগুলো নিচে উঠোনে ভিজবে, আর তিনি বারান্দার উঁচুতে টিনের চালের নিচে মাথা বাঁচিয়ে রাখবেন, তা হয় না।

তিনি নিজেই নেমে গেলেন উঠোনে। শ্রাবণের ধারা তাঁকেও ভিজিয়ে দিতে লাগল।

ছেলেপুলের দল হইহই করে উঠল মিয়া ভাইকে তাদের মধ্যে পেয়ে।

হইহই করতে করতে তারা বাড়ির খুলিতে গেল।

বাড়ির সামনে জামরুলগাছ। এই জামরুলগাছের জামরুল কত খেয়েছেন ছোটবেলায়! সব গাছে উঠতে পারতেন। এমনকি নারকেলগাছেও। এই যে দিঘি, এই দিঘিতে কত সাঁতার কেটেছেন! নদীপারের ছেলে, কখন যে সাঁতার শিখে গেছেন আপনা-আপনি, কে আর আলাদা করে খেয়াল রাখে।

রাতের বেলা ভাত খেতে বসেছেন মুজিব। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন রেনু। মা ভাত তুলে দিতে লাগলেন।

মা বললেন, 'খোকা, বউমার তো মনে হয় এবার পোলা হবি। পেটটা তো বেশি উঁচা দেখা যায়।'

মুজিব হাসলেন। লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মুখের হাসিটা কী যে অপূর্ব লাগছে! মা তাঁর দিকে তাকিয়ে 'মাশাল্লাহ' বলে উঠলেন, যেন নজর না লাগে।

মুজিব কাঁসার গেলাস তুলে পানি খেলেন।

মা বললেন, 'খাওয়ার সময় পানি খায় না, বাবা।' তারপর জানতে চাইলেন, 'জেলখানায় কী খাতি দেয়, বাবা?'

মুজিব বললেন, 'আমাদের তো ভালো ভালো খাবার দেয়, মা। আমরা তো সিকিউরিটি। ডাক্তার দেখে যায়, ওজন কমলে স্পেশাল ডায়েট দেয়। তখন বাড়তি ডিম-দুধ। আমরা সব খেয়ে শেষ করতে পারি না। অন্য ওয়ার্ডে পাঠায়া দেই।'

মা বললেন, 'খোকা, পিঠা পাঠিয়েছিলাম, পাইছিলা?'

'জি, মা, তোমার পিঠার তো সবাই খুব প্রশংসা করল। এত ভালো পিঠা নাকি কেউ খায়নি কোনো দিন। আমি বললাম, আমার মায়ের হাতের পিঠা, সবার চেয়ে মিঠা।'

রাতের বেলা রেনু বললেন, 'মাকে কেন বলতি গেলা সবাইরে তুমি পিঠা দিয়েছ? মা তো আশা করে আছেন সবটাই তুমি খেয়েছ!'

মুজিব হাসলেন, 'তুমি কী করে বুঝলা?'

'তুমি যখনই বললা সবাই খুব প্রশংসা করেছে, মার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে আঁধার করে এল, তাতেই বুঝলাম।'

হাসু নড়ে উঠল। রেনু তার গায়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

তারপর বললেন, 'আমার কিন্তু ডেলিভারির সময় হয়ে এসেছে। তুমি থেকে যাবা তো কত দিন! বাচ্চা দেখে যাবা না?'

মুজিব বললেন, 'রেনু, আমার যে অনেক কাজ। মানিক ভাই পত্রিকা করছেন। তাঁর পাশে আমার থাকতে হবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মুসলিম লীগ সরকার অনেক অন্যায়-অত্যাচার করতেছে, সেসবের একটা বিধান করতে হবে। আর তা ছাড়া এক জায়গায় থাকলে পুলিশই এসে ধরে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে যাওয়া ভালো। আমি একটু করাচি যেতে চাই। লিডারের সঙ্গে পরামর্শ আছে।'

রেনু দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললেন, 'তোমাকে আমি আটকাব না। তুমি যাও। খালি নিজের যত্ন নিয়ো।'

দুজনই জেগে রইলেন অতঃপর। চুপচাপ।

রেনু বললেন, 'সবাই বলছে ছেলে হবি। তুমি ছেলে চাও, না মেয়ে চাও?'

মুজিব বললেন, 'আল্লাহ যেটা দেন। আমি স্বামী হিসেবেও ভালো না। বাবা হিসেবেও না। আমার কি ছেলে না মেয়ে বেছে নেওয়ার কথা বলা সাজে! আর তা ছাড়া আল্লাহ যা দেন আমি তাতেই আল্লাহর কাছে হাজার শোকর করব। শুধু চাই তুমি সুস্থ থাকো। বাচ্চা সুস্থ থাকুক।'

রেনু বললেন, 'ছেলে হলে কী নাম রাখবেন?'
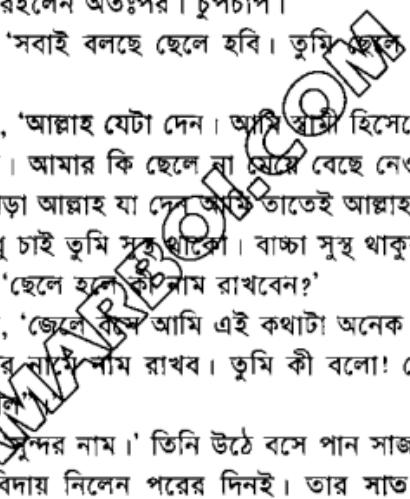
মুজিব বললেন, 'জেলে বসে আমি এই কথাটা অনেক ভেবেছি। তুর্কি বীর কামাল পাশার নামে নাম রাখব। তুমি কী বলো! ছেলে হলে নাম রাখব "শেখ কামাল"।'

রেনু বললেন, 'সুন্দর নাম।' তিনি উঠে বসে পান সাজাতে লাগলেন।

শেখ মুজিব বিদায় নিলেন পরের দিনই। তার সাত দিন পর রেনু একটা ছেলের জন্ম দিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান।

শ্রাবণের সেই দিনটায় খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ ভেদ করে 'শেখ কামাল' নামের সদ্যোজাত শিশুটা তার জন্ম ঘোষণা করল। দাদা শেখ লুৎফর রহমান উপস্থিত ছিলেন। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আজান দিতে লাগলেন : আল্লাহু আকবর।

বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে তাঁর আজানের ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ঢাকায় গিয়ে মুজিব উঠলেন ৯ পাতলা খান রোডে। তাঁর নেতাকে চিঠি লিখলেন।

জনাব,

আপনার প্রতি আমার সালাম। আপনি সব খবর পাবেন মানিক ভাইয়ের চিঠিতে। আপনাকে দেখার জন্য আমি আকুল হয়ে আছি। আর আপনার সঙ্গে আওয়ামী লীগ আর পার্লামেন্টের ব্যাপারে আমার জরুরি কিছু কথা আছে। দয়া করে আমাকে লিখবেন, সব ধরনের দিকনির্দেশনা দেবেন। আপনি কেমন আছেন?

আপনার স্নেহের মুজিবুর

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমাকে এক মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ব্যাপারে আপনার দেওয়া নির্দেশ প্রতিপালন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের হাতে কোনো তহবিল নাই। যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। খোদা হাফিজ।

মুজিবুর

ইংরেজিতে লেখা এই চিঠিটা তিনি মি. এইচ এস সোহরাওয়ার্দীর নামে ১৩এ কাচারি রোড, করাচির ঠিকানায় পৌঁছানোর আশায় খামে ভরে ডাকে দিয়ে দিলেন।

মুজিব জানলেনও না যে তাঁর এই চিঠি গোয়েন্দা পুলিশ আটক করল। এই চিঠি তার প্রাপকের হাতে আর কোনো দিনও পৌঁছাবে না।

সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লিডারের কাছ থেকে কোনো বার্তা আসছে না। মানিক ভাইয়ের চিঠিতে বিস্তারিত জানানো হয়েছে ঢাকার পরিস্থিতি। সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*-এর জন্যও তহবিল দরকার।

চিঠি পাঠানোর ১৫ দিনের মাথাতেও কোনো উত্তর না পেয়ে মুজিব আবার চিঠি লিখতে বসলেন তাঁর নেতাকে।

ইংরেজিতে তিনি লিখলেন :

১৫০, মোগলটুলি, ঢাকা
২১/৮/৪৯

জনাব,

আশা করি মানিক ভাইয়ের চিঠির সঙ্গে পাঠানো আমার চিঠিটা পেয়েছেন। আমরা সবাই ওই চিঠিতে আমাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে আপনার উত্তরের জন্য উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।

আপনি নিশ্চয়ই বর্তমান শাসকদের হীন মনোভাব উপলব্ধি করছেন। দমন-নিপীড়নের হেন উপায় নাই তারা অবলম্বন করছে না। কথায় কথায় ১৪৪ ধারা জারি, আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার আর হয়রানি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এসব সত্ত্বেও আমাদের সাংগঠনিক কাজ চলেছে অপ্রত্যাশিত রকম দ্রুতগতিতে। কিন্তু একটা সংগঠন হিসেবে আমাদের সব কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হতে পারে না। আগের দিন আমরা আরমানিটোলা ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটা জনসভার আয়োজন করেছিলাম। সরকারি দল আমাদের জনসভা ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য যত ধরনের হীন কৌশল আছে অবলম্বন করেছিল। তা সত্ত্বেও তাদের হীন কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে আমাদের জনসভাটি খুবই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সভায় ৫০ হাজারের মতো মানুষ যোগ দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষে কোনো প্রচার নাই। এই কারণে আমাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়া আপনি অন্য অসুবিধাগুলোর কথাও জানেন। মফস্বলে আমাদের কর্মীদের যারপরনাই হেনস্তা করা হচ্ছে। আজ রাতেই আমি গোপালগঞ্জ আর বরিশাল রওনা হয়ে যাব। আমাদের কর্মীদের ওখানে নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের শিকার হতে হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনের তারিখ ঠিক হয়েছে ১৬, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। আপনি কি দয়া করে একটু দেখবেন মিয়া মোনজোরাল আলম, আবদুস সাত্তার খান, নিয়াজি (প্রাক্তন এমএলএ, পাঞ্জাব) আর পশ্চিম পাঞ্জাবের গোলাম নবীকে সম্মেলনে পাওয়া যাবে কি না? আপনার কাছ থেকে শোনার পরই আমরা তাঁদের আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে পারব।

আপনি কবে ঢাকা আসবেন? আমরা সবাই উদ্বেগের সঙ্গে আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অপেক্ষা করছি।

মানিক ভাই খুব অস্থির অবস্থায় আছেন। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছি আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অফিসটার দায়িত্ব নিতে।

শ্রদ্ধাসহ
আপনার স্নেহের
মুজিবুর রহমান।

আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা আমরা করেছিলাম। এমনকি

তিন দিন আগে আমরা গভীর রাতে বসে থেকে আপনাকে ফোন করি। করাচি এক্সচেঞ্জ জানায়, আপনি রাত দুটোতেও বাসায় নাই।

মু. র.

শেখ মুজিব চিঠি লিখছেন তাঁর লিডারকে। সেটা গোয়েন্দারা আটকে ফেলছে। শেখ মুজিব ফোন করছেন। করাচি এক্সচেঞ্জ বলছে সোহরাওয়ার্দী বাসায় নাই। রাত দুটোতেও সোহরাওয়ার্দী বাসায় থাকেন না!

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর এই চিঠিটা ২৬ তারিখে তাদের যথাযথ ফাইলে জমা দেয়।

৪৩.

ছোট্ট একটা পুতুল পেয়েছে হাসু। সারাক্ষণ মায়ের কোল ঘেঁষে থাকে তার ছোট ভাইটি। হাসু তার দুই বছরের জবানে আধো আধো বোল ফুটিয়ে বলে, 'কোলে দেও। আমার কোলে দেও।'

রেনু হাসুকে জলচৌকির ওপরে বসান। তারপর তার কোলে ২৫ দিন বয়সী কামালকে তুলে দেন। হাসু দিব্যি তাকে কোলে নেয়। মা দুজনকেই ধরে রাখেন। উঠোনে মুরগি চরছে। বরইগাছে কাঁচা বরইয়ে ঢিল দিচ্ছে পাড়ার ছেলের দল। বিকেলের আলো পড়েছে উঠোনে। ছোট্ট বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামাতেই চায় না হাসু। রেনু তবু তার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিজের কোলে তুলে নেন।

'যাও তো দেখো দাদি কী করতিছে?' রেনু বলেন।

'হাসু, এদিকে আয়,' দাদি হাঁক পাড়েন।

হাসু থপথপ করে ছোট্ট পা ফেলে দাদির দিকে যায়। একটা মুরগি অনেকগুলো ছানা দিয়েছে। উঠোনে তারা চরছে। হাসু দেখে, কী সুন্দর হলুদ রঙের একেকটা মুরগির বাচ্চা! সে সেদিকে হাত বাড়াতে চায়। মা-মুরগি তেড়ে আসে কক কক শব্দ করে। রেনুর বুকটা কেঁপে ওঠে। এই বুঝি হাসুকে ঠোকর মারে। তিনি মুখে শব্দ করে ওঠেন।

কোলের বাচ্চা কাঁদে। তাকে আবার আঁচলের নিচে নেন।

বাচ্চাদের আব্বার দেখা নাই। তিনি গোপালগঞ্জ যাচ্ছেন। বরিশাল যাচ্ছেন। একবারও আসতে পারেন না টুঙ্গিপাড়ায়।

ছেলেটার মুখটাও কি তিনি একটু দেখবেন না?

এর মধ্যে বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। তাঁকে খুঁজে গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার অন্ত নাই। গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

আবার যেকোনো দিন গ্রেপ্তার হবেন। জেলে যাবেন। রেনুর বুকটা কেঁপে ওঠে। হাসু আবার এসেছে তাঁর কাছে, 'মা, কোলে দেও।'

মা-মুরগিটার মতোই পক্ষ বিস্তার করে রেনু তাঁর আঁচলের নিচে হাসু-কামাল দুজনকেই টেনে নেন।

এ সময় ঘাটে নৌকা এসে ভেড়ে। বরিশাল থেকে ফেরার পথে মুজিব টুঙ্গিপাড়ায় নেমেছেন।

পাড়ায় হইহই শোনা যায়।

মিয়া ভাই এসেছে। মিয়া ভাই এসেছে।

রেনুর বুকটা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। সত্যি কি সে এসেছে?

'কই, আমার পোলা কই?' মুজিবের ভরাট গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।

মুজিবের মা ছুটে যান বাইরে। 'খোকা, এসেছ বাবা! আসো। ওই যে তোমার পোলা।'

রেনুর মুখের দিকে তাকান মুজিব। শেষ বিকেলের সোনালি রোদ পড়েছে রেনুর মুখে। রেনুকে একটা পিতলের মূর্তির মতো দেখা যাচ্ছে। সেই মুখে ফুটে উঠেছে অপূর্ব হাসি।

মুজিব এসেই বলেন, 'দেও, পোলারে কোলে দেও।'

রেনু বলেন, 'তুমি জার্নি করে এসেছ। যাও, আগে হাতমুখ ধুয়ে নেও। কাপড় পাল্টাও। এত ছোট বাচ্চা, আ-ধোয়া হাতে ধরতে নাই।'

রেনু মুজিবের কোলের কাছে বাচ্চাটাকে ধরেন। মুজিব ছেলের কপালে চুম্বন করেন। হাসু গিয়ে তাঁর পায়ে পড়লে তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন, 'হাসু মাকে কোলে নিতে নিশ্চয়ই মানা নাই। আমি আসতেছি হাতমুখ ধুয়ে।

'কিন্তু কাপড় আর বদলাব না। আজ রাতেই আমি ঢাকা চলে যাব। অনেক কাজ। দেশে দুর্ভিক্ষ। লোকে না খেয়ে আছে। এর মধ্যে লিয়াকত

আলী খান আসতেছে ঢাকায়।' মুজিব একমনে বলতে বলতে চললেন বারান্দার দিকে। এরই মধ্যে বালতি-বদনায় পানি এসে গেছে।

রেনুর মুখের হাসিটা নিভে আসে। মুজিব আজই চলে যাবে? তাহলে আসার দরকারই বা কী ছিল?

মুজিব সেটা লক্ষ করেন। হাত-পা ধুতে আরম্ভ করলে রেনু তাঁর পাশে গামছা নিয়ে দাঁড়ান।

তিনি গামছা দিয়ে হাতমুখ মুছে গামছাটা তারে ঝুলিয়ে কামালকে কোলে নেন।

রেনু বলেন, 'বলো তো ও দেখতে কার মতো হয়েছে?'

মুজিব দেখেন, হুবহু একটা ছোটবেলার মুজিব তাঁর কোলে। কিন্তু রেনুকে খুশি করার জন্য তিনি বলেন, 'না, ধরতে পারতেছি না। তোমার চোখই তো পেয়েছে মনে হচ্ছে।'

রেনু হাসেন। বলেন, 'ওর দাদি বলে ছোটবেলায় খোকা একদম এই রকমই ছিল দেখতে।'

মুজিব বলেন, 'আজকা রাতে আর তাহিলে যাই না। কাল যাব। ভোরবেলা উঠেই যাওয়া লাগবে। লিডারের কোনো খবর পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমার করাচি যাওয়া লাগবে।'

মুরগি ধরা হচ্ছে। বাড়ির রাখাল-মাঝি সব উঠোন ঘিরে ধরেছে। তারা একটা লাল মোরগ টার্গেট করেছে। ওটার ওপর এখন ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। হায়দার আলী তার খ্যাপ মারা জালটা নিয়ে এক কনুইতে মেলে ধরে দুহাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। মোরগের ওপরে জাল নিক্ষেপ করা হবে।

জাল ছোড়া হলো বটে, কিন্তু লাল মোরগটা উড়ে গিয়ে উঠে গেল ঘরের চালে। তাই দেখে হাসু হাততালি দিয়ে ওঠে।

ভোরবেলাতেই নৌকায় ওঠেন মুজিব। গৃহকর্ম তাঁর কাজ নয়। রেনুও হাসিমুখেই তাঁকে বিদায় দেন ঘাটে এসে। হাসু আর কামালকে চুমু দিয়ে মুজিব উঠে পড়েন নৌকায়।

নৌকা চলতে শুরু করে। বাইগারি খাল থেকে কাটা গাঙ, তারপর মধুমতী। ভোর হচ্ছে। শরতের ভোর। পুব আকাশ ফরসা করে সূর্য উঠছে। এক ঝাঁক বক এসে বসছে নদীর ধারে। নদীর ধারে ধানখেত। আমন ধানে শিষ আসছে। মাছরাঙা রঙিন পাখা মেলে পুরো প্রভাতটাকেই

রঙিন করে তুলেছে।

মুজিব বাংলা মায়ের এই রূপ দেখে মুগ্ধ হন—আপন মনেই বিড়বিড় করতে থাকেন :

'চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে,
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে।'

কবিতাটার কথা মনে করে মুজিব আশ্চর্য হলেন। এই কবিতায় রবিবাবু যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সবই মিলে গেছে তাঁর আজকের বিদায়পর্বটির সঙ্গে।

গিয়েছে আশ্বিন। পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিস-পত্র দড়াদড়ি লয়ে—
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ ঘরে, ও ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড-তরে। বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে, যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা।

সত্যি, কী কী সব যে দিয়েছে রেনু বোঝা বেঁধে! মায় চুলকানির ওষুধ পর্যন্ত। নারকেল, সর্ষের তেল, পাটালি গুড়, গব্যঘৃত।

তারপর রেনুও হাসিমুখে বিদায় দিচ্ছেন। মা-ও বলছেন, 'ভালো থেইকো, বাবা', তখন হাসু, যে কথাই বলতে শেখেনি ভালোমতো, বলে উঠল, 'আব্বা যাবে না। আব্বা যাবে না।'

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধাভরে
'যেতে আমি দিব না তোমায়'! চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে...

যেতে তবু দিতে হয়েছে হাসুকে।

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

'কর্তা, হাওয়া ছেইড়েছে ভালো, পাল তুলে দিব।' সমীর মাঝি বলে। মুজিব সংবিৎ ফিরে পান। তাঁর চোখে জল। তিনি চশমা খুলে চোখ মোছেন। 'দাও, পাল তুলে দাও।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের আমতলায় বসে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি বলাবলি করে, দুই বছরের হাসু যেতে দিতে চায়নি তার আব্বাকে, আর সেই মেয়েটিকেই আর একটি মাত্র ছোট বোনসমেত একদিন বহন করে চলতে হবে পুরো পরিবারকে যেতে দেওয়ার বেদনার পাষাণভার। সে আজ থেকে ২৬ বছর পরে। তারপর তার বাকিটা জীবন।

৪৪.

আশ্বিন বিদায় নেয়, কার্তিক আসে। রমনার ঘাসের ডগায় শিশির জমে ভোরবেলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিরীষগাছগুলোর শীর্ষে বসে থাকা গগনচিলের পাখায় শেষ শরতের আলো পড়ে। শিশির আর শিউলিপতনের শিরশির শব্দ শোনা যায় স্বামীবাগে, চামেলিবাগে। শিশির জমে ধোলাইখালের পাড়ে ঢোলকলমির ঝাড়ে, পল্টনের আল বিছানো পথের ধারে চোরকাঁটার ডগায়। শিশির টলমল করে ধানমন্ডিতে সবুজ ধানের ডগায়। শান্তিনগর থেকে নবাবপুর রওনা হওয়ার আগে লোকে বিদায় নেয়, দোয়া করবেন, ঢাকা যাচ্ছি, পানা পুকুরের কচুরিপানার বেগুনি ফুলের পাপড়ি শিশিরের আর্দ্রতায় রোদের আদরে পথিককে মাথা নেড়ে বিদায় জানায়।

হাতি ঠেলা যায়, কার্তিক তো ঠেলা যায় না। বিশাল বাংলাকে ঢেকে

দেয় যেন এক শকুনির পাখার ছায়া, তার নাম আকাল, তার নাম খাদ্যাভাব। পুরো উত্তরবঙ্গে মঙ্গার করালগ্রাস। দক্ষিণবঙ্গজুড়ে হা-অন্ন রব।

জিনিসপত্রের দাম বেশি, তার ওপর পাওয়াও যায় না। খাজা নাজিম উদ্দিন গভর্নর জেনারেল করাচিতে, লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী, ওদের ভাষায় উজিরে আলা, পূর্ব পাকিস্তানে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন—তাঁরা কর্ডন প্রথা করেছেন, এক জেলার উদ্বৃত্ত খাদ্য আরেক জেলায় তাঁরা যেতে দেবেন না, এর প্রতিবাদে প্রদেশজুড়ে কত মিছিল-মিটিং!

খুলনা জেলাতেই মারা গেছে ২০ হাজার মানুষ, আওয়াজ উঠেছে। শেখ মুজিবের মাথা গরম হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বাংলার মানুষ কি কেবল দুঃখই পাবে, কষ্ট স্বীকার করে যাবে! আর পাঞ্জাবি লিয়াকত খান প্রধানমন্ত্রিত্ব ফলাতে আসবেন ঢাকায়? ফুড কনফারেন্স করবেন?

চার মাস আগে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী জনসভা ডেকেছেন আরমানিটোলা ময়দানে। খাদ্যসংকটের প্রতিবাদে এ জনসভা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এ জমায়েত।

সরকার-সমর্থক দৈনিক *আজাদ* লেখে, খাদ্যসংকট যখন প্রায় দূরীভূত হয়েছে, এমতাবস্থায় উজিরে আলা নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের পূর্ববঙ্গ সফরে বিঘ্ন সৃষ্টিই ওই দলের ওই জনসভার উদ্দেশ্য।

এর আগে যতবার আওয়ামী মুসলিম লীগ বা সোহরাওয়ার্দী-সমর্থক মুসলিম লীগ জনসভা আয়োজনের চেষ্টা করেছে, পুরান ঢাকার স্থানীয় উর্দুভাষী গুন্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিংবা শাহ আজিজের নেতৃত্বে মুসলিম লীগাররা এসে সভামঞ্চ ভাঙচুরের চেষ্টা চালিয়েছে।

শেখ মুজিব এখন কারাগারের বাইরে। তিনি যখন কারাগারে ছিলেন, সে সময় আরমানিটোলা ময়দানে আয়োজিত ভাসানীর জনসভার চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে মঞ্চে উঠে বাঁদরনাচ নেচে গেছে শাহ আজিজ। সেদিন মুজিব কারান্তরালে ছিলেন, তাই শাহ আজিজ এই স্পর্ধা দেখাতে পেরেছিল। আজ আসুক দেখি!

মুজিব আজ প্রস্তুতি নিচ্ছেন আরমানিটোলার জনসভা সফল করতে। বাধা আসবে যেখানে, লড়াই হবে সেখানে। সোহরাওয়ার্দী-সমর্থক মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীদের মুজিব আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলে দিয়েছেন। সকাল থেকেই বিপুলসংখ্যক কর্মী প্রস্তুত হয়ে আছে মঞ্চের

চারদিকে। তাদের বলেছেন, হাতে পোস্টার রাখবে। পোস্টারে লেখা থাকবে, অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও। পোস্টারগুলো বাঁধা থাকবে গজারি কাঠের শক্ত লাঠির মাথায়। আক্রমণ এলে পোস্টারগুলো সব লাঠি হয়ে যাবে। মুজিবের চোয়াল শক্ত, বাহুর পেশি টানটান। গোপালগঞ্জের চরের লাঠিয়ালদের ঘূর্ণমান লাঠির শনশন আওয়াজ তাঁর মাথার মধ্যে গুঞ্জরণ তুলেছে। কুষ্টিয়ায় মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে শাহ আজিজকে যে মুষ্ট্যাঘাতটা করেছিলেন, সেটা মনে করেন। ফরিদপুরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে কিংবা কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে বহুত গুন্ডার মোকাবিলা করেছেন মুজিব। এসব গুন্ডাদলের মনোবল বলতে কিছুই থাকে না। একবার তুমি বুক চিতিয়ে দুই বাহু বিস্তার করে রুখে দাঁড়াও, 'খবরদার' বলে হুংকার ছাড়ো, দেখবে, সব কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে।

মোল্লা জালাল উদ্দিন এখন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। তিনি বিষয়টি বুঝে নিয়েছেন। আজকের জনসভা কিছুতেই ভণ্ডুল করতে দেওয়া যাবে না শাহ আজিজ ও তার গুন্ডাদলকে। তাদের রুখতে হবে। ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রস্তুত হও।

মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী গুন্ডা জড়ো করেছেন জনসভায় আক্রমণ করার জন্য। খবর আসে। কর্মীরা ঘিরে আছে পুরো মাঠ।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়তে থাকে। আর পুব দিকে নিজেদের ছায়া ফেলে আসতে থাকে মানুষ, বিক্ষুব্ধ মানুষ, কষ্টভোগী মানুষ, একে একে। জনসভা শুরুর আগেই ময়দান লোকে ভরে যেতে লাগল। গুন্ডারা এল সেই সময়, যখন আরমানিটোলা মাঠের ধারের লম্বা পাকুড়গাছটার ছায়া হলুদ রোদে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার নিচে এরই মধ্যে হাজার খানেক লোক উপস্থিতও হয়েছে।

গুন্ডাদের দেখেই লাঠিতে বাঁধা পোস্টারগুলো হাতে নিয়ে ছাত্রকর্মীর দল স্লোগান ধরল 'গণবিরোধী লিয়াকত খান, ফিরে যাও পাকিস্তান'। সেই স্লোগানে কণ্ঠ মেলাল উপস্থিত জনতা। গুন্ডারা দেখল, এখানে হামলা করতে গেলে হাড্ডি আর মাংস আলাদা করে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরতে পারবে না। তারা কেটে পড়ল।

মাথায় বেতের টুপি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি—ভাসানী এলেন। সঙ্গে আচকান পরা আওয়ামী মুসলিম লীগের সহসভাপতি আতাউর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। মুজিবুর রহমান এলেন

তখনই, যেন শূন্য থেকে, জাদুকরের হাতের কারসাজিতে যেমন শূন্য থেকে বেরিয়ে আসে কবুতর, ফুলের গুচ্ছ, রঙিন ছাতা। তিনি আসলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলেছেন। তিনি যেখানেই যান, সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে শুরু করেন, লোক জমে যায়, তিনি মিছিল করতে শুরু করেন, পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে তাঁর মিছিল প্রতিরোধ করতে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের একাধিক মামলা পড়েছে এরই মধ্যে। মুজিবুর রহমানের গায়ে শার্ট, কলারওয়ালা, দুই পকেট, পরনে পায়জামা।

সভার কাজ শুরু হলো।

শামসুল হক, আতাউর রহমান খান ভাষণ দিলেন। কিন্তু জনতা 'শেখ মুজিব', 'শেখ মুজিব' বলে চিৎকার করতে লাগল। শেখ মুজিব এরই মধ্যে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি যেখানে যান, সেখানেই ভিড় লেগে যায়। এর মধ্যেই জনতা জেনে গেছে, এই ২৯-৩০ বছর বয়সী যুবক ভাষণ দেন চমৎকার। ভাসানী বললেন, 'ঠিক আছে, এবার শেখ মুজিবুরের ভাষণই তাইলে শোনেন।'

শেখ মুজিব বললেন, 'একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুন করলে কী হয়? খুনির ফাঁসি হয়। এখন নুরুল আমিন দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছেন, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে? তাহলে তাঁর শাস্তি কী হওয়া উচিত?'

জনতার মধ্য থেকে চিৎকার ওঠে, 'নুরুল আমিনকে এই মাঠে এনে গুলি করা উচিত।'

শেখ মুজিব বলেন, 'শোনেন নুরুল আমিন, জনতার রায়। লজ্জাশরম কিছু থাকলে এখনই পদত্যাগ করেন।'

জনতা চিৎকার করে ওঠে 'নুরুল আমিন গদি ছাড়ো, ভাত দাও কাপড় দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও'।

মুজিবের ভাষণ শেষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ দিতে শুরু করেন।

তাঁর ভাষণে বাংলার নিরন্ন মানুষের হাহাকার ধ্বনিত হতে থাকে ময়দানজুড়ে। শকুনির ছায়া দেখতে পায় প্রত্যেক মানুষ। মানুষের শোককে তিনি অচিরেই পরিণত করেন ক্ষোভে। ঘোষণা করেন, 'এবার আমরা মিছিল করে যাব গভর্নর হাউসের দিকে, লিয়াকত আলী খানকে ঘেরাও করব।'

মিছিল শুরু হয়। ভাসানী, শামসুল হক, মুজিব সামনে। এরই মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে গভর্নর হাউসের আশপাশের এলাকায়।

মিছিল নাজিরাবাজার রেলক্রসিংয়ের কাছে এলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে শুরু করে। লাঠিচার্জ করে। মওলানা ভাসানী আর শামসুল হককে গ্রেপ্তার করে।

মুজিব জানতেন, তাঁর ওপর হুলিয়া আছে। পুলিশ যেকোনো সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তিনি মুহূর্তেই সেখান থেকে সটকে পড়েন।

রাতে যান মোগলটুলির পার্টি অফিসে। অনেকেই পুলিশের লাঠির আঘাতে মারাত্মক আহত। ডাক্তার করিমকে ডেকে আনা হয়। তিনি আহতদের ব্যান্ডেজ করেন। ওষুধ দেন।

মুজিব জানেন, ভাসানী গ্রেপ্তার হয়েছেন। শামসুল হকও। এ অবস্থায় যুগ্ম সম্পাদকের ধরা দেওয়া চলে না।

তিনি দুজন কর্মীকে দায়িত্ব দেন বাইরে সার্বক্ষণিক নজর রাখার। পুলিশ দেখলেই তারা আওয়াজ দেবে। ভোরবেলা সবে যখন এই পরিশ্রান্ত কর্মীদের চোখ একটু ধরে এসেছে, তখনই প্রহরারত কর্মীদ্বয় এসে মুজিবের শরীরে ধাক্কা মারে, 'মুজিব ভাই, ওঠেন ওঠেন। আইয়া পড়ছে।' দোতলার বারান্দা থেকেই পাশের বাড়ির ছাদে যাওয়ার পথ তাঁরা দেখেই রেখেছিলেন। শেখ মুজিব, আবদুল মতিন, শওকত আলী, এমনকি গ্রেপ্তার এড়াতে এখানে এসে আশ্রয় নেওয়া ইয়ার মোহাম্মদ সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পেছনের বারান্দা থেকে প্রথমে পাশের বাড়ির ছাদে, সেখান থেকে দেয়াল টপকে চলে যান মৌলভীবাজারের দিকে।

পুলিশ বাড়িতে আসে। বাড়ি তল্লাশি করে শেখ মুজিব আর শওকতের খোঁজে। না পেয়ে তারা চলে যায়।

দিনের বেলা পুলিশ রিপোর্ট লেখে :

'একটা সূত্র থেকে খবর পেয়ে ১৫০ মোগলটুলির ইস্ট পাকিস্তান মুসলিম লীগ অফিস ভোর চারটা ৩০ মিনিটের দিকে তল্লাশি করা হয়। পার্টির দুজন জঙ্গি সদস্য শেখ মুজিব ও শওকত আলীকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে এ তল্লাশি পরিচালিত হয়। তারা দীর্ঘদিন ধরে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যাচ্ছে। যাদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মামলা আছে, সেখানে তাদের পাওয়া যায়নি। কোনো কিছু জব্দও করা যায়নি।'

শেখ মুজিব আশ্রয় নেন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোল্লা জালাল উদ্দিনের খাজে দেওয়ান নামের আস্তানায়। আবদুল হামিদ চৌধুরী,

মোল্লা জালাল উদ্দিন আর অলি আহাদ মিলে বসেন পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে।

সবাই মিলে সাব্যস্ত করা হয়, মুজিব লাহোরে চলে যাবেন। যাবেন লিডার সোহরাওয়ার্দীর কাছে। পরামর্শ করবেন। দিকনির্দেশনা আনবেন। পার্টির খরচ পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহও করতে হতে পারে।

পূর্ব বাংলার পুলিশ আর তাঁকে খুঁজে পায় না।

এর পরের রিপোর্ট আসে লাহোর পুলিশের কাছ থেকে, ওখানে শেখ মুজিব কী করছেন না করছেন, পুলিশ রিপোর্ট করতে থাকে।

দুই মাস পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে সেখানকার সরকারবিরোধী নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন মুজিব। এমনকি তিনি সেখানে সংবাদ সম্মেলনও করেন। পূর্ব বাংলার দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন সাংবাদিকদের সামনে। পাকিস্তানি রাজনীতিটা বুঝতে ওই সফর তাঁকে সাহায্য করেছিল।

১৯৫০ সাল। পয়লা জানুয়ারি। শুভ নববর্ষে পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ একটা চমৎকার উপহার তুলে দিতে পারে সরকারকে।

শেখ মুজিব ঢাকায় গ্রেপ্তার হন।

খাজা তাঁর গানের আসরে বসে সেই খবর লাভ করে খুশিতে নিজেই নাচতে থাকেন। নুরুল আমিন বহুদিন পর আরাম করে ঘুমোন। তাঁদের জানের দুশমন ধরা পড়েছে।

আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিব—তিন গুরুত্বপূর্ণ নেতা জেলে। এখন আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন সহসভাপতি আতাউর রহমান খান, যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার মোশতাক। তাঁরা দুজন একটা জুটি বাঁধেন। ওকালতির জুটি। তাঁরা আটঘাট বেঁধে ওকালতি করতে শুরু করলেন।

৪৫.

১৯৫০-এর ঢাকা ছিল প্রধানত সদরঘাট, নবাবপুর, আরমানিটোলা, মাহুতটুলি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। বুড়িগঙ্গা বেয়ে

সদরঘাট থেকে লঞ্চ বা স্টিমার ছাড়ত, কেউ সন্ধ্যার পর সিটি বাজাত না, পাছে আহসান মঞ্জিলের নবাব পরিবারের আদমিদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।

শিল্পী আব্বাসউদ্দীন থাকতেন পাতলা খান লেনে। তারপর এসে ওঠেন পুরানা পল্টনে, ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের পেছনের কানাগলিতে। কলকাতা থেকে এসে তিনি হয়েছেন পূর্ব বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের অতিরিক্ত সংগীত প্রচারণা কর্মকর্তা। আব্বাসউদ্দীনকে পল্টনবাসী দেখতে পায় সাইকেলের ওপরে। তাদের ধারণা হয়, তিনি সারাক্ষণ সাইকেলেই থাকেন, দুটো পায়ের অতিরিক্ত তাঁর দুটো চাকাও আছে। সারাক্ষণ ঘোরে সেটা। লোকে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছেন?' তিনি সাইকেলের গতি শ্লথ করে বলেন, 'ভালো।' এবার প্রশ্নকর্তার সম্পূরক প্রশ্ন, 'বাড়ির সবাই ভালো?' তিনি সাইকেল থামান। ক্যাচ করে শব্দ হয়। একদিকে একটা পা নামিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি তো আচ্ছা লোক সাহেব, বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে, তিন ছেলেমেয়ে আছে, একসঙ্গে সবাই ভালো থাকবে, এমন আশা করেন কী করে?' তারপর আবার সাইকেলে প্যাডেল মারেন। প্রশ্নকর্তা তাঁর প্রস্থানের দিকে বিমূঢ় তাকিয়ে থাকে।

আনিসুজ্জামান তখন স্কুলের ছাত্র। নাইনে পড়েন। কলকাতা থেকে এসেছেন '৪৭-এর পর, খুলনা হয়ে ঢাকায়। থাকেন শান্তিনগরে। ঘুরে বেড়ান সাহিত্য সম্মেলনে। আব্বাসউদ্দীনকে দেখলে সালাম দেন। বাপ রে, এত বড় গায়ক!

একদিন আব্বাসউদ্দীন সাইকেল থামিয়ে আনিসুজ্জামানকে বলেন, 'বুঝলে, আল্লাহ যে আছেন, তার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

'কীভাবে?' আনিসুজ্জামান মাথা চুলকে জানতে চান।

'তা ছাড়া পাকিস্তান চলছে কী করে?' বলে সাইকেল চালিয়ে তিনি হীরামন মঞ্জিল নামের তাঁর বাড়ির দিকে চলে যান, যেখানে মাঝেমধ্যে বসে সাহিত্য আর সংগীতের আসর, কিশোর আনিসুজ্জামানও মাঝেমধ্যে সেসব আসরে উঁকিঝুঁকি মারেন।

শান্তিনগরে তখন বিদ্যুৎ ছিল না, পানির সরবরাহ ছিল না, কিন্তু শান্তি ছিল। চারদিকে গাছপালা। পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ। পাখির ডাক, ঝিঁঝির রব। রাতে শিয়ালও ডাকে। আনিসুজ্জামানের বড় ভালো লাগে।

শান্তিনগরে অশান্তির কোনো কারণ ঘটত না। কবি গোলাম মোস্তফাও থাকতেন শান্তিনগরে।

তাঁর শ্যালিকারা আসতেন সেখানে। আনিসুজ্জামানরা তখন ওই কবির

বিখ্যাত কবিতা থেকে আবৃত্তি করতেন, 'দেখেশুনে করিলাম তালিকা, সবচেয়ে সুমধুর ছোট শ্যালিকা।'

গোলাম মোস্তফার ছেলে মুস্তাফা মনোয়ার ওরফে মন্টু। তিনিও পড়েন ক্লাস নাইনে। তাঁরও ছিল একখানা সাইকেল। ছবি আঁকা, গান করা আর রসিকতা করা—মন্টুর গুণের অভাব ছিল না।

আনিসুজ্জামানকে নিয়ে সাইকেলের সামনে বসিয়ে সে ঘুরত পাড়াময়। তখন এক সাইকেলে দুজন ওঠা নিষিদ্ধ, পারলে পুলিশ এই অপরাধে সাইকেল আরোহীকে আটকও করতে পারে। মন্টু যথারীতি আরেকজনকে তাঁর সাইকেলে বসিয়ে চলেছেন প্যাডেল ঠেলে, ক্রিং ক্রিং ঘণ্টি বাজিয়ে, পথে পুলিশ হাঁক ছাড়ল, 'দো আদমি কিঁউ?'

'আওর এক নেহি মিলা', বলে মন্টু অবলীলায় চলে গেলেন তাঁর গন্তব্যের দিকে।

সাইকেলে বাতি থাকাও তখন বাধ্যতামূলক ছিল। মন্টুর সাইকেলে বাতি ছিল না। আরেকবার পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'সাইকেল মে বাত্তি নেহি হ্যায় কিঁউ?'

মন্টু সাইকেলের গতি দিলেন বাড়িয়ে, আকাশে তখন জ্বলজ্বল করছে চাঁদ। সেদিকে আঙুল তুলে মন্টু বললেন, 'আল্লাহ মিয়া এত্তা বাত্তি দিয়া, সাইকেল মে বাত্তি জরুরত নেহি হ্যায়।'

কবি জসীমউদ্‌দীন ছিলেন গায়ক আব্বাসউদ্দীনের অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

তিনি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের বন্ধু।

ফজলুর রহমান ঢাকায় এসেছেন। সংবাদ সম্মেলন করলেন, বললেন, 'বাংলা লেখা হবে আরবি বর্ণমালা দিয়ে। তাহলেই সব প্রদেশের মধ্যে বিভেদ দূর হবে। আর আরবি লেখা সহজ। এই ভাষায় টাইপরাইটার আছে। সিন্ধুর ভাষা সিন্ধি, কিন্তু তার হরফ আরবি। পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষা উর্দু, তবে তার হরফ নাসতালিক। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের ভাষা পশতু, সেও তো বহুলাংশে আরবি। এখন শুধু বাংলা ভাষাটা যদি আরবিতে লেখা যায়, তাহলেই হয়ে যায়। কারণ, আরবি হচ্ছে হরফুল কোরআন।'

জসীমউদ্‌দীন সাহেবের কানে গেল এই প্রেস কনফারেন্সের কথা। তাঁকে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, 'আপনার বন্ধু ফজলুর রহমান তো পাগল হয়ে গেছে। কী বলছে সে এসব?'

জসীমউদ্‌দীন গেলেন ফজলুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে সরকারি অফিসে, তখন তিনি সরকারি লোকজন আর পার্টির দর্শনার্থীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছেন। জসীমউদ্‌দীন বললেন, 'আমি আপনার সাথে বর্ণমালা বদলের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

ফজলুর রহমান বললেন, 'আজ রাত আটটার পরে আপনি মওলা মিয়ার বাড়ি আসবেন।'

মওলা মিয়ার বাড়ি ফুলবাড়িয়ায়। রাত সাড়ে সাতটার দিকে জসীমউদ্‌দীন ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন ফুলবাড়িয়া যাবেন বলে। ঘোড়ার গাড়ি চলছে। অশ্বখুরের আওয়াজ উঠছে খটখট। বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। সেই বাতাস জসীমউদ্‌দীনের চুল উড়িয়ে নিচ্ছে।

জসীম ভাবছেন, এ আমি কার কাছে চলেছি। ফজলুর রহমান? সে তো এক কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন, '৪৭-এর আগে, তিনি ছিলেন সেই বিরল মানুষদের একজন, যাঁরা আহসান মঞ্জিলের খান্দানের বাইরে নেতৃত্বের গুণ দেখিয়ে অনেকেরই প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলেন না বলেই হল সংসদের নির্বাচনে দাঁড়াতেন না। কারণ, ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদের নির্বাচনে ছাত্ররা ভালো ছাত্রদেরকেই ভোট দিত। নবাব না হয়েও, গ্রাম থেকে এসেও, ছাত্রদের আকৃষ্ট করার ক্ষমতা দেখিয়ে ফজলুর রহমান রাজনীতিতে নতুন একটা পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন। তিনি অবশ্য ওকালতিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। ওকালতি জীবনের শুরুতেই তিনি হোঁচট খান। সরকারি উকিলের নথি থেকে কাগজ সরাতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন। সিনিয়র উকিল তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা চান, 'একেবারে আনকোরা নতুন উকিল, ও জানে না, কোন নথির কাগজ কোথায় রাখতে হয়। ভুল করে ফেলেছে, মাফ করে দিন।' আদালত তাঁকে মাফ করে দেন, কিন্তু তাঁর ওকালতি জীবনের সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। অতএব, তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন রাজনীতিকেই। জনসমক্ষে তিনি বক্তৃতা করতে পারতেন না, আলাপ-আলোচনাতেও কোনো শালীনতা দেখাতে পারতেন না। কারণ, কি ইংরেজি, কি বাংলা—কোনো ভাষাই তিনি ভালোভাবে রপ্ত করতে পারেননি। তিনি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। যখন রাজনীতি শুরু করেন, তাঁর পকেট ছিল খালি; তাঁর ছিল না কোনো রাজনৈতিক গুরু। গ্রামের সম্পত্তি সব তাঁর ভাই আত্মসাৎ করায় তিনি ছিলেন কপর্দকহীন। বাবুবাজারের মেসে থাকতেন, বন্ধুরা

টিফিন ক্যারিয়ারে করে তাঁর খাবার পাঠিয়ে দিত। বাবুবাজার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া ছিল দুই আনা, সে পয়সাও তাঁর খরচ করার সাধ্য ছিল না। তিনি তাঁর প্রতিবন্ধিতা জয় করে হেঁটে হেঁটে আসতেন। বন্ধুরা তাঁর জন্য সবকিছু করতে পারত, তিনিও পারতেন বন্ধুদের জন্য যেকোনো কিছু করতে। আর তাঁর ছিল এক অভূতপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭, ঢাকার মুসলিম লীগ রাজনীতিতে যে তরুণেরা সক্রিয় ছিল—শামসুল হক, আজিজ আহমেদ, খন্দকার মোশতাক, এমনকি কামরুদ্দীন আহমদ—সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে এই ফজলুর রহমান তো নিজের নামটা হাস্যকর করে তুলেছেনই, পুরো বাংলার নামও তিনি ডোবাবেন।

ফুলবাড়িয়া গিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে দুই আনা পয়সা গুনে দিলেন কবি জসীম। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে, বারান্দা অন্ধকার। দরজা খোলা। তিনি পর্দা ঠেলে গলা খাঁকারি দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, শিক্ষাসচিব ফজলে করিম আর অধ্যাপক সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান বেতের সোফায় বসে আছেন। মন্ত্রী এঁদের আগেই ডেকে এনেছেন, যাতে কবির সঙ্গে তর্কে জিততে পারেন। জসীমউদ্‌দীন মনে মনে হিসাব কষলেন।

মন্ত্রী ভেতরের ঘর থেকে পায়জামায় গিঁট দিতে দিতে প্রবেশ করলেন। কুশল বিনিময়ের পরে জসীমউদ্‌দীন বললেন, 'আপনি কী করছেন? আপনি কি চান, বাঙালিরা পশ্চিমাদের কাছে জীবনের সব ক্ষেত্রে সংগ্রামে হেরে যাক? বাংলার পরিবর্তে উর্দু হরফ, আরবি হরফ—এসব কী শুনছি?'

ফজলুর রহমান সাহেব সোফায় বসে দুই পা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'বাঙালি জাতি সম্পর্কে আপনার দেখছি বড়ই খারাপ ধারণা! বাঙালিরা সব পারে। তারা খুব দ্রুত উর্দু বর্ণমালা শিখে নিয়ে পশ্চিমা ছাত্রদের হারায়া দিবে।'

সৈয়দ আলী আহসান বললেন, 'ঠিক, বাঙালিরা সব পারে।'

ফজলে করিম, যিনি এরই মধ্যে মন্ত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হরফুল কোরআন বিষয়ে একজন স্কুল মৌলভির লেখা বইকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিজের নামে প্রকাশ করেছেন, তিনি জোর গলায় মন্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করলেন।

জসীমউদ্‌দীন বললেন, 'আপনার এই কথা আমি সমর্থন করি না। এখনই আমাদের দেশে ছাপাখানা নাই, কাগজ নাই, প্রকাশনা নাই। এর মধ্যে আমাদের অতীতকালের যেসব সাহিত্যিক তাঁদের অমর অবদান রেখে গেছেন, তা উর্দুতে রূপান্তরের সাধ্য সরকারের নেই। উর্দু অক্ষর বা আরবি অক্ষর করলে আমাদের ছাত্ররা সেই সাহিত্য উপভোগ করতে পারবে না।'

ফজলুর রহমান বললেন, 'সরকার ইচ্ছা করলে কী না পারে। কামাল পাশা অল্প দিনের মধ্যেই তুরস্কের বর্ণমালা বদলে দিয়েছেন।'

জসীমউদ্‌দীন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'কামাল পাশার মতো বড় প্রতিভা তো আমাদের দেশে নাই।'

মন্ত্রী সটান দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'কে বলল নাই। এই দেখেন, আপনার সামনে কে দাঁড়ায়া আছে। আমিই এই কাজ করব। দেখেন, বাংলা ভাষায় কোনো লাইনো টাইপ মেশিন নাই, টাইপরাইটার নাই, উর্দু ভাষায় আছে। উর্দু হরফে লেখা হলে আমরা এসব মেশিনের সাহায্য পাব।'

জসীম বললেন, 'উর্দুর অনেক আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা লাইনো টাইপ মেশিন ও টাইপরাইটার আছে।'

ফজলে করিম বললেন, 'আপনি ভারতের দিকে অত তাকাচ্ছেন কেন?'

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর দাড়ি নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এখন আমরা আজাদ। সবকিছুতে আর পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে চলবে না। সারা পৃথিবীর মুসলিম সভ্যতার দিকে তাকাতে হবে। আরবি শিখলে সেটা সহজেই সম্ভব।'

জসীমউদ্‌দীন বললেন, 'সৈয়দ আলী আহসান, তুমি কথা বলছ কেন। আমি এসেছি আমার বন্ধু ফজলুর রহমানের সঙ্গে কথা বলতে। তোমাদের সঙ্গে তো কথা বলতে আসিনি।'

সৈয়দ আলী আহসান চুপ করে গেলেন।

ফজলে করিম থামার পাত্র নন। তিনি বললেন, 'আপনি মুসলিম সভ্যতায় বিশ্বাস করেন না?'

জসীমউদ্‌দীন স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'মুসলিম সভ্যতা বলে কিছু আছে কি না, জানি না। তবে পারস্য সভ্যতা আছে, আরব সভ্যতা আছে; বাঙালি সভ্যতাও তেমনি আছে।'

শুনে ফজলে করিম আর সৈয়দ আলী আহসান হেসে উঠলেন, যেন

এইমাত্র ভারি একটা কৌতুকের কথা শ্রবণ করলেন।

জসীম সেদিকে না তাকিয়ে ফজলুর রহমানকে বললেন, 'আপনি উর্দু, আরবি বর্ণমালা প্রবর্তন করতে চেয়ে বাঙালি সন্তানদের এক চোখ কানা করে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হবে।'

ফজলুর রহমান প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'আমিও তো তা-ই চাই। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের প্রতি যেন বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা আকৃষ্ট না হয়। তাহলে তারা আর বিশ্বাসঘাতক হতে পারবে না।'

জসীম বললেন, 'তাহলে আজ থেকে আমি আপনার বিরোধিতা করতে শুরু করলাম।'

ফজলুর রহমান বললেন, 'তাহলে সেই কাজ তোমাকে একাই করতে হবে। কেউ তোমার পাশে দাঁড়াবে না।'

'যদি না দাঁড়ায়, তবে আমি একলাই দাঁড়াব। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'

জসীমউদ্‌দীন একাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সৈয়দ আলী আহসান আর ফজলে করিম মন্ত্রী-সন্নিধানে বসেই রইলেন।

তখন অনেক রাত। ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে ট্রেন আসছে। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এখন কোনো ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। জসীমউদ্‌দীনকে একা অনেকটা পথ যেতে হবে।

ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে গেলে রিকশা পাওয়া যাবে। তিনি সেদিকেই পা বাড়ালেন।

মাঘ মাস পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না। তরুছায়ায় ঘেরা ঢাকা শহরে ভীষণ শীত। এত ঠান্ডা কেন? কামরুদ্দীন সাহেব তাঁর জিন্দাবাহারের বাসায়।

শীতে তিনি ঠকঠক করে কাঁপছেন। ৩৮ বছর বয়সী এই উকিল রাজনীতিকের শরীর এতটা বুড়ো হয়নি যে তিনি শীতে কাঁপবেন।

আসলে তাঁর শরীর কাঁপছে ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, উত্তেজনায়।

তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বিপরীত দিকে অবস্থিত হারমোনিয়ামের দোকানের মালিক রসিক দাসের মেয়ে আর জামাই।

সকালবেলা, তখনো কুয়াশা কাটেনি পথে, তখনো সূর্য পুরোপুরি দখল নেয়নি আকাশের। এরই মধ্যে এই কাণ্ড।

কামরুদ্দীন সাহেব তাঁদের বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে রাখলেন। পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা বেধেছিল আগেই। এখন ঢাকায় লেগে গেছে।

মেয়েটি শাঁখা-সিঁদুর পরা, তাকে কামরুদ্দীন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবা এল না?'

মেয়েটি মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে বলল, 'বাবারে কইছিলাম আইতে। বাবা কইল, আমি এইহানে এতু বছর, আমারে এই পাড়ার হকলে চিনে। আমারে কেউ মারব না, মা। তুই যা। জামাইরে লগে লইয়া যা।'

'আচ্ছা, তোমরা থাকো।' ওদের নিচতলার ঘরে বসিয়ে বাইরের লোহার শক্ত দরজাটা ঠিকমতো লাগিয়ে কামরুদ্দীন সাহেব দোতলায় উঠলেন।

এত ঠান্ডা কেন।

তিনি কাঁপছেন আর আবহাওয়াকে দুষছেন।

গুন্ডারা এল হইহই-রইরই করতে করতে। হরিদাসের বাড়িটা ঠিক উল্টো দিকেই। তারা এসে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

কামরুদ্দীন সাহেব জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন, ঘটনা কী!

ওরা গেটটায় ধাক্কা মারছে। বড় ইট এনে বাড়ি মারছে দরজায়। শাবল-খুন্তি দিয়ে নানা কসরত করছে। সত্যি, দরজাটা ভেঙে ফেলল যে!

রসিক দাস কী করবে এখন। সে পেছনের জানালা দিয়ে মারল এক লাফ। তারপর দৌড়াতে শুরু করল।

গুন্ডারা টের পেল একটু পরেই। তারাও দৌড়াতে শুরু করল রসিক দাসের পেছন পেছন। গুন্ডারা দৌড়াচ্ছে। ভয়ে, উত্তেজনায়, আতঙ্কে কামরুদ্দীন সাহেবের শরীর হিম হয়ে আছে।

ইশ্, রসিক দাস পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে।

একটা গুন্ডা এত্ত বড় একটা ছুরি ওর পেটের মধ্যে...ও মা গো...

বীরপুরুষেরা আবার এসে ঢুকল তাঁর বাড়িতে। ঢুকে দেখল, মেয়েটি নেই। এত বড় শিকার হাতছাড়া!

হায়, হায়, তারা এসে যে এই বাড়ির দরজাতেই ধাক্কা মারতে লাগল।

রসিক দাসের মেয়ে আর জামাই দোতলায় এসে কামরুদ্দীন সাহেবের পায়ে পড়ল। 'দরজা খুলবেন না, ওরা আমাদের মেরেই ফেলবে।'

গুন্ডারা ছুরি উঁচিয়ে এ বাড়ি লক্ষ করে চেঁচাচ্ছে।

গুন্ডারা রাস্তা ছাড়ছে না।

এত শীত। পৃথিবীর সব শৈত্য এসে যেন জিন্দাবাহার লেনের এই বাড়িতে আছড়ে পড়ছে। বিকল শরীর নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কামরুদ্দীন।

তাঁর স্ত্রী নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন ওই মেয়ে আর তার বরকে।

ঘন্টা খানেক পরে গুন্ডারা চলে গেল। আবার আসবে না তো!

গেছে, দরজায় আবার ধাক্কা।

আরও খানিক পরে, তখন সূর্য আরেকটু তেজি হয়েছে, কুয়াশা খানিকটা কেটে গেছে, দরজায় আবার ধাক্কা।

উফ! এইভাবে বাঁচতে পারা যায়!

কামরুদ্দীন জানালার কাছে এসে উঁকি দিলেন। অলি আহাদ।

তাড়াতাড়ি গেট খুলে তাঁকে ভেতরে আনলেন কামরুদ্দীন সাহেব।

অলি আহাদ বললেন, 'দেখেছেন, কী পরিস্থিতি। দাঙ্গা বেধে গেছে। চলেন পার্টি অফিসে। আমাদের কর্তব্য ঠিক করতে হবে। আলোচনা করতে হবে।'

কামরুদ্দীন বললেন, 'আমার প্রথম কর্তব্যটা কী, আমি জানি।'

'কী?'

'আমার ঘরে একটা হিন্দু মেয়ে আর তার জামাই আশ্রয় নিয়েছে। ওর বাবা রসিক দাসকে একটু আগে গুন্ডারা খুন করেছে। ওকে আগে আমি নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাব। তারপর অন্য কাজ। আপনি এক কাজ করেন। পার্টি অফিস থেকে কয়েকজন ছেলেকে পাঠান। খুব বিশ্বস্ত ছেলে হতে হবে। আমি আগে ওদের নিরাপদ স্থানে সরাব। সূত্রাপুরের দিকে হিন্দুপাড়ায়।'

অলি আহাদ চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এল কয়েকজন যুবক। তারা বলল, তাদের অলি আহাদ পাঠিয়েছেন।

কামরুদ্দীন তাঁর বাড়ির দেয়ালের পেছনের দিকটা ভাঙতে লাগলেন যুবকদের সহায়তায়। তারপর একটা ফোকর বেরোলে সেই পথে রসিক দাসের মেয়ে আর জামাতা যুবকদের প্রহরায় বিদায় নিল।

কামরুদ্দীন সাহেব সেদিন আর পার্টি অফিসে যাওয়ার সাহসই পেলেন না।

সন্ধ্যায় এলেন তাজউদ্দীন সাহেব।

২৫ বছর বয়সী এই যুবকের বোধ করি শীত লাগে না। বিকেলের দিক

থেকে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে আর সঙ্গে বইছে ঝোড়ো বাতাস। কামরুদ্দীন সাহেব পায়ে মোজা পরে লেপের নিচে ঢুকেও শরীর থেকে শীত তাড়াতে পারছেন না। এর মধ্যে শীতকালের বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তাজউদ্দীন এলেন।

'কী করেছেন?' একটা গামছা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন কামরুদ্দীন, 'এমন দুর্যোগের দিনে একা একা এলেন...'

'শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম কামরুদ্দীন সাহেব। মনটা খুব খারাপ। নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলী, ইসলামপুর, সিদ্দিকবাজার, ইংলিশ রোড, চকবাজার—সব ঘুরে ঘুরে এলাম। সবখানে ধ্বংসের চিহ্ন। আগুন জ্বলছে হিন্দুদের দোকানপাটে। রাস্তার ধারে লাশ পড়ে আছে।'

'পুলিশ নাই? ১৪৪ ধারা না জারি করা হয়েছিল দিনের বেলা?'

'বিহারি পুলিশরা আরও উৎসাহ দিচ্ছে। যারা এসব করছে, তারা সবাই মুহাজের। থাকার জায়গা নেই। হিন্দু তাড়িয়ে বাড়িঘর দখল করতে চাচ্ছে। আর পেছন থেকে উসকানি দিচ্ছে মুসলিম লীগের বদমাশ নেতাগুলো।'

'কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা কেউ প্রতিবাদ করছে না?'

'না, বাঙালিরা চুপচাপ দেখছে।' তাজউদ্দীন মাথা মুছতে মুছতে বললেন, 'রেডিওটা অন করুন তো। কী বলে শুনি।'

রেডিওতে বলা হচ্ছে, 'কারফিউ জারি করা হয়েছে। কারফিউয়ের মেয়াদও বাড়ানো হলো। বিকেল পাঁচটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।'

কামরুদ্দীন লুঙ্গি আর শার্ট এনে দিলেন তাজউদ্দীনকে। ভেজা কাপড় ছেড়ে সেসব পরে নিলেন তাজউদ্দীন। আজ রাতে আর হলে ফেরা হবে না।

'অলি আহাদ এসেছিলেন। পার্টি অফিসে ডেকেছিল শান্তির পক্ষে কিছু একটা করা যায় কি না। আজ আমার এখানেই যা ঘটেছে, তারপর...' সবিস্তারে ঘটনা বর্ণনা করলেন কামরুদ্দীন আহমদ। বললেন, 'আমার তো ভয় করছে, গুন্ডারা না এবার আমাকেই আক্রমণ করে বসে। আপনি রাতটা থাকেন। কিছুটা সাহস পাই। খুব ঠান্ডা পড়েছে তাজউদ্দীন সাহেব। খুব ঠান্ডা!'

তাজউদ্দীন পরের দিন হলে ফিরলেন সকাল সকাল। তারপর গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাস হলো না। শান্তি রক্ষার পক্ষে একটা সভা হলো। তাতে ছেলেমেয়ে খুব বেশি উপস্থিত হলো না। তাজউদ্দীন হতাশা বোধ

করলেন। মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে না বিপদে দুর্যোগে দুর্বিপাকে?

৪৬.

জয়নুল আবেদিন বিয়ে করতে যাবেন। বরযাত্রা করবে সাংবাদিক লেখক আবু জাফর শামসুদ্দীনের কলতাবাজারের বাসা থেকে।

জয়নুল ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্রপারের ছেলে। বাবা পুলিশ বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারী। নরমাল স্কুলের কাছে তাঁর নিজের বাড়ি, ওপরে ঢেউটিন, পাশে তরজার বেড়া। কায়ক্লেশে সংসার চলে, কারণ বৃদ্ধ পিতা অবসর নিয়েছেন।

তিনি আসতে পারবেন না বিয়েতে। বরকর্তা আবু জাফর শামসুদ্দীনই। তখন তাঁর বয়স ৪০-এর মতো।

জয়নুলের বয়স ৩৬।

জয়নুলের পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। টুপিও নেই। আচকানের তো প্রশ্নই আসে না। আবু জাফর তাঁকে পায়জামা-পাঞ্জাবি ধার দিলেন।

পাত্রী পড়ে ক্লাস টেনে।

পাত্র ড্রয়িংয়ের শিক্ষক। সরকারি হাইস্কুলে ছবি আঁকা শেখান।

তিনি ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলের খ্যাতিমান শিক্ষক। সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে পেয়েছিলেন সোনার মেডেল। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের ছবি এঁকে কলকাতা তো কলকাতা, পৃথিবীরই টনক দিয়েছিলেন নড়িয়ে। '৫০-এর সেই কুখ্যাত দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছিলেন মোটা তুলির দ্রুত টানে, পথের ধারে পড়ে থাকা নিরন্ন কঙ্কালসার নারী-পুরুষ আর কাক তাঁর তুলিতে মূর্ত করে তুলেছিল ওই মানবিক বিপর্যয়কে, জাগিয়ে দিয়েছিল মূঢ় বিবেককেও।

এখন সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিল্পী ঢাকায় পরিণত হয়েছেন গরিব এক স্কুলশিক্ষকে। কিন্তু তাতে তাঁর মুখের হাসি এতটুকুন ম্লান হয়নি। হাসিমুখে রুমাল চাপিয়ে তিনি চললেন বিয়ে করবেন বলে। স্বজনহীন,

বন্ধুবান্ধবহীনভাবে। তবু আকবর বাদশার সঙ্গে তাঁর কোনো তফাত নেই যেন।

আবদুল হাদি লেনে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। সেখানেই বিয়ে পড়ানো হবে। ঘোড়ার গাড়ি ডাকা হলো। বর জয়নুল ও বরযাত্রী আবু জাফরকে নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল।

৪৭.

'হুজুর, আপনে আসাম গেলেন, ওই সব দিনের গল্প একটু করেন না?' শেখ মুজিব তাঁর চোখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করেন। মুজিবের চোখ সমস্যা করছে। চোখ দিয়ে অবিরাম পানি পড়ছে।

মওলানা ভাসানী, বয়স ৬৫ কি ৭০, মাথায় বেতের টুপি, তোবড়ানো গালে লম্বা সাদা দাড়ি, পরনে লুঙ্গি, হাসেন। 'মজিবর, সেই সব দিনের কথা শুনবার চাও?'

'জি, বলেন।'

কারাগারের ভেতরে তাঁরা বসে আছেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ঘরে। কেন্দ্রীয় কারাগারের দোতলায় আশ্রয় পেয়েছেন এই বন্দী। নিচে একটা কক্ষে থাকেন শেখ মুজিব, আরেকটায় কমিউনিস্ট নেতা হাজী দানেশ।

শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক। ভাসানী সভাপতি। দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে কারাগারে।

ভাসানীর জন্ম ঠিক কবে, কে জানে, হয়তো ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫ সালের কোনো এক সময়। শৈশবে মা মারা যান। তারপর নানা ঘাটের পানি খেয়েছেন। পড়াশোনা করেছেন দেওবন্দ মাদ্রাসায়। সিরাজগঞ্জের ছেলে আবদুল হামিদ কলকাতা, পাঁচবিবি, টাঙ্গাইল নানা জায়গায় ঠাঁই গাড়েন। চরমপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন কিছুদিন। কিছুদিন টাঙ্গাইলের কাগমারীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কংগ্রেসে যোগ দেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হন।

আসামে গিয়ে আশ্রয় নেন। সব সময়ই পীর-ফকিরে আস্থা ছিল। আসামেও গিয়েছিলেন পীরের মুরিদ হিসেবেই। মুজিব তাঁর কাছে জানতে চান সেই সময়ের কথা।

'শুনবা মিয়া? পথের ধারে বাঘ শুইয়া থাকে। দিনের বেলাও হাতে হাতিয়ার নিয়া পথ চইলতে হয়। অস্ত্রশস্ত্র নিয়া আগুনের বোন্দা জ্বালায়া তারপর না রাইতে বাইর হইতে হয়। সাপের কামুড়ে দৈনিক মানুষ মরে। মশা একেকটা এত বড়—মশার পায়ে সুতা বাইন্দা রাখতে পারবা চড়াই পাখির মতন। ডেঙ্গুজ্বর, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া—সব জ্বরই ওই দেশে আসল রাজা। মরণ-বাঁচন কোনো ঠিকঠিকানা নাই। রাইতের বেলা পাহাড় থাইকা মহিষ নামে, হরিণ নামে, হাতি নামে। খেতের ফসল ব্যাবাক সাফ কইরা ফেলায়। হাতির পায়ের নিচে ঘরদুয়ার ভাইঙা তছনছ হয়। একেকটা জোঁকের সাইজ ধরো আধা হাত। রক্ত চুইষা খায় তিন পোয়া। বিরান পাথার। পাঁচ-সাত মাইল পরপর বসতি। তা-ও হাতেগোনা। এমন দেশে গিয়া খড়ের ছাউনি দিয়া ঘর বাইন্ধলাম। সবলগে খরচ এক টাকা চইদ্দ আনা।'

হাজী দানেশ এসে এই আড্ডায় যোগ দেন।

মওলানা ভাসানী বলে চললেন, 'আসামে পরথম আসছিলাম কোনো রাজনীতি করতে না, সামাজিক মিশন লইয়াও না। পীরের সাথে তালেবে এলেম হইয়া আসছিলাম। পীরের বোঁচকা-বুচকি বওয়া, ফুট-ফরমাশ খাটা, আর প্যাটটা ভইরা দাওয়াত-জিয়াফত খাওয়া—এই আছিল কাম। পীর ভাইদের সাথে মিইশা দেখলাম, আখেরাতের সুখ বহুত দূর। ইহকালের দোজখের জ্বালা বড়ই নজদিক। রোজ দোজখের জ্বালা। লাইন প্রথা আর বঙ্গাল খেদার জ্বালায় হাজার হাজার বনি আদমের ঘর-সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। তাই আমার নজর পরকালের তরিকার চায়া ইহকালের বাঁইচা থাকার উপরেই পড়ল বেশি। লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম। বঙ্গাল খেদার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম। মোল্লা মানুষ হইলাম রাজনীতির মানুষ। ধুবড়ির ভাসানে গিয়া ভাষণ দিছিলাম, আসামের লোক আমার নাম দিল মওলানা ভাসানী।'

এরই মধ্যে হাজী দানেশের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর খুব খাতির হয়েছে।

হাজী দানেশ কমিউনিস্ট, আর ভাসানী গরিব মানুষ ভূমিহীন মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। যদিও ইসলামের প্রতি তাঁর আস্থা অগাধ। পীর

হিসেবে গ্রামেগঞ্জে মানুষকে পানি-পড়া দেন।

ভাসানী বলেন, 'হাজী সাহেব, এইবার ছাড়া পাইলে আমরা একসাথে রাজনীতি করুম।'

হাজী দানেশ বলেন, 'মওলানা সাহেব, আপনার সাথে আমাদের মিলবে না। আমরা তো আসলে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করি।'

মওলানা ভাসানী বলেন, 'আমরা ইলেকশনে সব কিষান মজুর গরিব মানুষরে নমিনেশন দিব। তাইলে তো অ্যাসেম্বলিতে গরিব মানুষই আইন বানাইব।'

'আপনি তো কৃষক শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠিয়ে আইন পাস করলেন। কিন্তু এক্সকিউশন করবে কে? সব আমলাই তো একই রকম।'

ভাসানী বলেন, 'তাইলে কি আমগোরেও সশস্ত্র লাইন নিতে হইব? মজিবর কী কও?'

শেখ মুজিব বলেন, 'আপনি যা বলেন, হুজুর। আপনি হইলেন আমাদের পার্টির সভাপতি।'

'না, আমি একলা সিদ্ধান্ত দিব নাকি।'

এরপর তাঁরা পরিকল্পনা করেন, কীভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করা যায় খাজা-লিয়াকত মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁরা নানা স্বপ্ন বুনে চলেন।

তাঁদের পার্টির সদর দপ্তর হবে মধুপুরের জঙ্গলে। ওখানেই অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হবে। শেখ মুজিবের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তাদের সামনে একমাত্র বাধা কুওমিনতাং বাহিনী। একদিন ভাসানী খবর পেলেন, কুওমিনতাং বাহিনী পরাজিত হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি হাজী দানেশকে ডেকে নিলেন দোতলায়। তাঁর মুখে হাসি। 'হাজী সাহেব, কমিউনিজম তো আইসা গেল। বাড়ির পাশে চীন পর্যন্ত আইছে।'

হাজী দানেশের মুখেও হাসি। তিনি বললেন, 'তাহলে তো আপনার দাড়ি কামাতে হবে।'

ভাসানী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কামাইতে হইলে হইব। মানুষ তো খাইতে পারব। পরতে পারব। হাজী সাহেব, শুনেন, আমার ইসলাম যদি সত্য হয়, তাইলে হাজারটা কমিউনিস্টও ইসলামরে ঠেকায়া রাখতে পারব না।'

৪৮.

শেখ মুজিব চিঠি লিখতে বসেছেন। ফরিদপুর কারাগারে এখন তিনি। কনকনে শীত পড়েছে। ১৯৫০-এর ডিসেম্বর। সূর্যের আলো যেন কারাগারে ঢুকতেই পারছে না। কুয়াশাও খুব বেশি।

মুজিব জেলখানায় উবু হয়ে বসে চিঠি লিখছেন তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীকে।

এর মধ্যে একটা মামলায় তাঁর তিন মাসের কারাবাসের শাস্তি হয়েছিল। সেই শাস্তির মেয়াদ দিন দশ আগে পেরিয়েও গেছে। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। বরং গোপালগঞ্জের আরেকটা মামলার জন্য গোপালগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

গোপালগঞ্জে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন রেনু। আব্বা তো ছিলেনই। আর ছিল তাঁর দুই ছেলেমেয়ে, তিন বছরের হাসু আর এক বছরের কামাল। টুঙ্গিপাড়া থেকে নৌকায় এসেছিল তারা। গোপালগঞ্জে তাদের বাসা, আদালতপাড়াতেই।

আদালতেই মাকে দেখলেন মুজিব। মা তাঁর মাথায় হাতও দিলেন।

রেনু ছেলেমেয়ে দুটোকে টেনে আনলেন তাদের বাবার কাছে। হাসিনা তাঁকে যেন লজ্জা পাচ্ছে। তিনি বললেন, 'কী রে হাসু, কাছে আয়।'

হাসিনা কাছে এল। 'মাশাল্লাহ মা, বড় হয়ে গেছ। চুলও তো অনেক লম্বা হলো।'

হাসু বলল, 'আরও বড় হতো। মা কেটে দিছল!'

কামালকে এক কোলে আর হাসুকে আরেক কোলে নিলেন মুজিব।

ঠিকমতো কথা কি আর বলা যায় কারও সঙ্গে?

তাঁকে দেখতে ভিড় হয়ে গেছে পুরো গোপালগঞ্জের আদালতপাড়ায়। পুরো গোপালগঞ্জই যেন ভেঙে পড়ছে তাঁকে দেখতে।

পুলিশ কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।

ভিড়ের মধ্যে আর রেনুর সঙ্গে ভালো করে কথা হলো না।

মুজিব বললেন, 'রেনু, শক্ত থেকো। আমি তো এই জালিম সরকারের

বিরুদ্ধে লড়াই চালায়াই যাব।'

রেনু চোখ তুলে বললেন, 'আমি শক্তই আছি। তুমি তোমার শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাইখো।'

এরই মধ্যে পুলিশের বাঁশি। তাঁর আওয়ামী মুসলিম লীগের থানা কমিটি, মহকুমা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি—সব চলে আসতে চাইছে তাঁকে দেখতে।

এই অবস্থায় শুনানিই বা হবে কী করে। সরকারি উকিল বললেন, তাঁরা প্রস্তুত নন আজ। তারিখ পেছানো হোক। তারিখ পেছানো হয়েছে।

গোপালগঞ্জ উপকারাগারে স্থানসংকুলান হবে না। তাই তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে ফরিদপুর কারাগারে।

মুজিব লিখে চলেছেন, ইংরেজিতে :

শেখ মুজিবুর রহমান
নিরাপত্তাবন্দী,
জেলা কারাগার,
ফরিদপুর,
পূর্ব বাংলা।
২১/১২/ ৫০

এই পর্যন্ত লিখে মুজিব 'পূর্ব বাংলা' শব্দ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাংলা শব্দটা দেখলেই তাঁর বুকটা ভরে ওঠে। তিনি কখনো পূর্ব পাকিস্তান কথাটা বলেনও না, লেখেনও না।

জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব,

আপনার প্রতি আমার সালাম। জেনে খুশি হয়েছি যে মওলানা সাহেব কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি উচ্চ রক্তচাপ আর হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। গত নভেম্বরে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হাজিরা দেওয়ার জন্যে গোপালগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আমাকে আবার ফরিদপুর জেলে আনা হয়েছে। কারণ, গোপালগঞ্জে নিরাপত্তাবন্দীদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাকে গোপালগঞ্জের আদালতে সব হাজিরা দিতে যেতে হয় ফরিদপুর কারাগার থেকে। ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ একবার যেতেই ৬০ ঘণ্টা লেগে যায়। যে পথ আর যে বাহনে যেতে হয়, তা যারপরনাই ক্লান্তিকর। আমি জানি না এই মামলা কত দিন চলবে। যা-ই হোক না কেন, আমি এসবকে পাত্তা

দিই না। জনাব আবদুস সালাম খান আমাকে দেখতে ফরিদপুর কারাগারে এসেছিলেন। তিনি আমার হেবিয়াস করপাস মামলা পরিচালনা করবেন হাইকোর্টে। গোপালগঞ্জের মামলায় সালাম সাহেবও একজন আসামি। এটা পাকিস্তানের ইতিহাসে একমাত্র ঘটনা, যেখানে পুলিশ মসজিদের মধ্যে ঢুকে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পিটিয়েছিল। দয়া করে আমার জন্য ভাববেন না। আমি জানি, যারা মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মরণকেই বেছে নেয়, তাদের কেউ পরাজিত করতে পারে না। বড় জিনিস অর্জিত হয় বড় আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ যেকোনো কারও চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান, আর আমি তাঁর কাছেই কেবল ন্যায়বিচার চাই।

এই পর্যন্ত লিখে মুজিব একটু থামেন। এই কথাগুলো কেবল কথার কথা নয়। এগুলো তাঁর মনের কথা। তিনি সত্যি বিশ্বাস করেন, নিজের জীবনটাকে তিনি দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, আদর্শের জন্য বিলিয়ে দিতে পারেন। মরতে তিনি ভয় পান না। আর এ-ও বিশ্বাস করেন, মহৎ আদর্শ অর্জনের জন্য যে মরতে প্রস্তুত, তার বিজয়ও অবশ্যম্ভাবী।

একদিন বিজয়ী হবেন তিনি, তাঁর বিজয় মানে তাঁর একার বিজয় নয়, সবাইকে নিয়ে, পূর্ব বাংলার সকলের বিজয়, কী এক স্বপ্নদৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেটা যে ঠিক কী, তিনি ধরতে পারেন না। একধরনের ভালো লাগায় তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন হয়। চোখের কোণে জল আসে।

তিনি চশমা খোলেন। সোনালি ফ্রেমের চশমা। ফুলহাতা শার্টটা দিয়ে চোখের জল মোছেন।

আবার তিনি লিখতে থাকেন :

আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে? আমি অনুভব করতে পারি, আপনি খুবই ব্যস্ত। দয়া করে মওলানা নিয়াজি, জনাব গোলাম মোহাম্মদ খান, নওয়াবজাদা জুলফিকার আর আমার অন্য বন্ধুদের সালাম জানাবেন। আমি সব সময়ই তাদের ভালোবাসা ও স্নেহের কথা স্মরণ করি। তাঁদের বলবেন, যদি আবার কখনো সুযোগ পাই, আমি অবশ্যই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে লাহোর যাব।

গত অক্টোবরে যখন আপনার সঙ্গে আমার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে দেখা হয়েছিল, আপনি দয়া করে কথা দিয়েছিলেন, আমার জন্য কিছু বই পাঠাবেন। আমি এখন পর্যন্ত কোনো বই পাই নাই। আপনার

ভুলে গেলে চলবে না যে আমি একা আর বইপুস্তকই হচ্ছে আমার একমাত্র সঙ্গী। যা-ই হোক, আমার দিন চলে যাচ্ছে। দয়া করে শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

ইতি আপনার স্নেহের মুজিবুর

তিনি এই চিঠিটা ডাকে ফেলার জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে দিলেন।

তাঁকে না জানিয়ে কারা কর্তৃপক্ষ সেটা গোয়েন্দাদের হাতে দিয়ে দিল, আর চিঠিটা চিরদিনের জন্য বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

মুজিবের শরীরটা ভালো নয়। কাশির গমক উঠছে। বুকে মনে হয় ইনফেকশন হয়েছে। একবার ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ যেতে লাগে ৬০ ঘণ্টা। আড়াই দিন। ফিরতে লাগে আরও আড়াই দিন।

মুজিব এরই মধ্যে পূর্ব বাংলার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলকে চিঠি লিখেছেন। বলেছেন, 'আমার প্রতি আর আমার মামলাটার প্রতি সুবিচার করতে হলে একটা কাজ করুন—শাস্তির মেয়াদ যেদিন শেষ হবে, মানে ১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর, সেদিন আমাকে হয় মুক্তি দিন। মুক্তি যদি দেওয়া না যায়, তাহলে আমাকে গোপালগঞ্জ থানা চত্বরেই আটক করে রাখুন। এই দুটো বিকল্পের একটাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাকে খুলনা নয়তো বরিশাল জেলে পাঠিয়ে দিন, যেখান থেকে গোপালগঞ্জ যাওয়া-আসাটা সহজতর।'

এই তিনটা বিকল্পের তিন নম্বরটা সরকারের পছন্দ হয়েছে। মুজিবকে খুলনা কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খুলনা কারাগারে মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে আসেন গোয়েন্দা বাহিনীর এক সদস্য।

তিনি তাঁকে বলেন, 'শেখ সাহেব, আপনাকে আমরা মুক্তি দেব। আপনার শরীরটা ভালো না। বুকে কফ জমে গেছে দেখতে পাচ্ছি। কাশি দিচ্ছেন। আপনি কেন কষ্ট করছেন। আপনি এক কাজ করেন। এই কাগজটাতে একটা সাইন করেন। তার পরই আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

মুজিবের মুখ কঠিন হয়ে যায়। তিনি একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, 'এই কাগজটা কী, আমি জানি। এটা একটা মুচলেকা। আমি আর কোনো দিনও পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিব না। শোনেন সাহেব, আমার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বন্ড দিয়ে আমি শেখ

মুজিবুর রহমান নুরুল আমিনের কাছে মুক্তি চাই না। বন্ডে সাইন করতে রাজি হলে তো আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকেই বার করে দিতে পারত না। বন্ডে সাইন করতে রাজি হলে আমি অনেক আগেই ছাড়া পেতাম।'

'না, মানে শেখ সাহেব। সবাই তো বন্ডে সাইন করেই মুক্তি পাচ্ছে। আপনি একা কেন কষ্ট করবেন। মওলানা ভাসানী সাহেব বাইরে, শামসুল হক সাহেব বাইরে।'

'আমি জানি। ভাসানী মওলানা বন্ডে সাইন করে মুক্তি নেবেন, এটা আমি কল্পনাও করি না। আমিও বন্ড দিব না। শোনেন। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমাকে ডিটেনশন দিয়ে যদি মেরেও ফেলেন, তবু আমি বন্ড দিয়ে মুক্তি নেব না। কারণ, আমি মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছি। কোন মানুষ, পূর্ব বাংলার গরিব মেহনতি মানুষ। যাদের ত্যাগের মধ্য দিয়ে এই পাকিস্তান সম্ভব হয়েছে।

'শোনেন, এই পাকিস্তানের জন্য পূর্ব বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। তারা ভোট দিয়েছে বলে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল ইলেকশনে। সেই ইলেকশনে আমি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেব করেছেন। মওলানা ভাসানী না থাকলে সিলেটে জিততে পারতাম আমরা? এই বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষ পাকিস্তান এনেছে, আর অযোগ্য মুসলিম লীগ সরকার এই গরিব মানুষকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমি সেই গরিব মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করছি।

'আর সংবিধানের মৌলিক নীতি কমিটির রিপোর্ট যেটা জমা দেওয়া হয়েছে এটা কী? এটা তো পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরা বাংলাকে তাদের কলোনি বানাতে চায়। এটা আমরা মানব না।

'পাঞ্জাবে নির্বাচন হচ্ছে। ওই নির্বাচনে মুসলিম লীগ অল্প মার্জিনে জিতে যাবে। কিন্তু সাহস থাকে তো বাংলায় নির্বাচন দিতে বলেন। আমরা আওয়ামী মুসলিম লীগ একতরফাভাবে জিতে যাব। মুসলিম লীগের ভরাডুবি হবে। আদৌ যদি পূর্ব বাংলায় নির্বাচন হয়।

'যান, আপনার নুরুল আমিন খাজাকে বলে দেন মুজিবুর রহমান এই সব কথা বলেছে। লিখে দেন। আর ওই বন্ডের কাগজ আমার চোখের ত্রিসীমানাতেও আনার চেষ্টা করবেন না। যান।'

গোয়েন্দা সদস্যটি, যাঁর বয়স ৪০-এর কোঠায়, চুল ছোট করে ছাঁটা, গাল বসানো, মুজিবকে বললেন, 'আপনি কি বুঝছেন আপনার এই সব

কথা আমাকে লিখে ওপরওয়ালাকে জানাতে হবে।'

'বললাম তো, নুরুল আমিনকে জানান। খাজাকে জানান। অন্যায় করে, অত্যাচার করে আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মীর ওপরে অত্যাচার করে তারা গদিতে থাকতে পারবে না। বাংলার মানুষের মুক্তি আমি আদায় করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।'

গোয়েন্দা সদস্যটি বিদায় নিয়ে চলে যান। তাড়াতাড়ি নিজের অফিসে গিয়ে বসেন। ভুলে যাওয়ার আগেই পুরো আলোচনাটা তাঁকে লিখে ফেলতে হবে। তিনি লিখতে শুরু করেন, 'আই ইন্টারভিউড দ্য সিকিউরিটি প্রিজনার শেখ মুজিবুর রহমান ইন খুলনা জেইল অন ২২-২-৫১।' তিনি পুরো কথোপকথনের একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট বর্ণনা লেখেন দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর রিপোর্টের শেষ দুটো লাইন হলো, 'হি ওয়াজ নট উইলিং টু এক্সিকিউট অ্যানি বন্ড ফর হিজ রিলিজ ইভেন ইফ দ্য ডিটেনশন উড কজ হিম টু ফেইস ডেথ। হিজ অ্যাটিচুড ওয়াজ ভেরি স্টিফ।'

এরপর শেখ মুজিবকে কী করা হবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, পুলিশ, গভর্নর অফিস, কারাগার কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। একবার নির্দেশ আসে তাঁকে অবিলম্বে খুলনা থেকে বরিশাল কারাগারে নেওয়া হোক। তারপর বলা হয়, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আবার গ্রেপ্তার করা হোক।

চৈত্র মাসে তাঁকে ফরিদপুর জেলা কারাগারে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগারের ফটকে তাঁকে বরণ করে নিতে ভিড় জমে যায়। তিনি সেখানেই সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করেন।

তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-যুবকেরা মিছিল বের করে, ফরিদপুরের পথেঘাটে জনতা আওয়াজ তোলে 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই'। গোপালগঞ্জে পরের দিন হরতাল পালিত হয়।

গোয়েন্দা কর্মকর্তার পাঠানো প্রতিবেদন আর তাঁর সঙ্গে শেখ মুজিবের আগের কার্যকলাপের সব গোয়েন্দা প্রতিবেদন মিলিয়ে দেখেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর 'যেহেতু এই বন্দীর মনোভাব অনড় এবং যেহেতু ভবিষ্যতেও তিনি আরও অপকর্ম ঘটানোর সম্ভাবনা ধারণ করেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর ডিটেনশন বা আটকাদেশ আরও ছয় মাসের জন্য বাড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করছেন।'

গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি তাই চূড়ান্ত সুপারিশ করেন, 'আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একমত পোষণ করি এবং সুপারিশ করছি, এই বন্দীর আটকাদেশ নিরাপত্তা আইনে আরও ছয় মাস বৃদ্ধি করা হোক।'

মো. এ খালেক, ডিআইজি, আইবি, ২৮-৩-৫১।

গভর্নর সেই আদেশই দান করেন।

৪৯.

ফেব্রুয়ারি মাসে মুজিবের কাছে মুচলেকা আদায়ের জন্য গিয়েছিলেন গোয়েন্দা সদস্য, সেটা ছিল খুলনা কারাগারে।

১৯৫১ সালের মে মাসের ২২ তারিখে ফরিদপুর কারাগারে আসেন আরেক গোয়েন্দাকর্তা। উদ্দেশ্য, শেখ মুজিবকে মুচলেকায় স্বাক্ষর দেওয়ানো, তাঁকে সরকারের কাছে নতিস্বীকার করানো, তাঁকে নমনীয় করা।

গোয়েন্দা সদস্য তাঁকে বলেন, 'শেখ সাহেব, ভাসানী মুক্তি পেলেন, শামসুল হক মুক্তি পেলেন। আপনি কি মুক্তি চান না?'

শেখ মুজিব বলেন, 'অবশ্যই মুক্তি চাই। আমার পার্টির প্রেসিডেন্টকে সরকার মুক্তি দিল, সাধারণ সম্পাদককে মুক্তি দিল, আমি তো তিন নম্বর লোক, যুগ্ম সম্পাদক, আমাকে কেন মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না, আমি বুঝছি না।'

'আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি বন্ড সই করেন। বলেন, এই ধরনের সরকারবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী কাজে আপনি আর জড়িত হবেন না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

মুজিব বলেন, 'অসম্ভব। বন্ড দিয়ে আমি মুক্তি নেব না।'

'আপনি যা করেছেন, তার জন্য কি আপনি অনুতপ্ত নন?'

'মোটেও না। আমি যা করেছি বাংলার মানুষের ভালোর জন্য করেছি। প্রতিটা দেশপ্রেমিক মানুষের এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামাটাই কর্তব্য।'

'আপনি কি মুক্তি পেলে এসব রাষ্ট্রবিরোধী কাজ থেকে সরে দাঁড়াবেন?'

'মোটেও না। আমি আমার কাজ চালায়া যাব।'

'আপনার পরবর্তী কর্মসূচি কী?'

'সেটা আমি আপনাকে বলব না।'

'মওলানা ভাসানীকে ছাড়া হয়েছে। শামসুল হককে ছাড়া হয়েছে। আপনাকেও তো ছাড়া হবে। আপনি বলেন, আপনি ভুল করেছেন।'

'আমি এটা বলব না। আমার যা হয় হবে। দেশের জন্য আমি নিজেকে কোরবানি করে দিয়েছি।'

মে মাসের ২২-এর পরে জুলাইয়ের ১৪। আবারও ফরিদপুর জেলে ডিআইবি পুলিশ শেখ মুজিবের কাছে যায়। তাঁকে একই প্রকারে মুক্তির প্রলোভন দেখানো হয়। কিন্তু মুজিব মুসলিম লীগ সরকারের তীব্র সমালোচনা করা, জেল থেকে মুক্তি পেলে আরও সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন না। মুচলেকা দিতে বরাবরের মতোই অস্বীকৃতি জানালেন।

বরাবরের মতোই কর্মকর্তারা, সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই হোক, আর ডিআইবির উপমহাপরিচালকই হোক, তাঁর আটকাদেশের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেন।

এভাবে অন্তত ছয়বার মুজিবের কাছে যান গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা। তাঁকে নোয়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মুজিব অনমনীয়। তিনি ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। তিনি মুচলেকায় স্বাক্ষর করলেনই না। মুক্তি তাঁকে দেওয়াও হচ্ছে না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নব্য উপনিবেশের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য দেওয়াও বন্ধ করলেন না। প্রত্যেকবার কর্তৃপক্ষ তাঁর আটকাদেশের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর জন্যই সুপারিশ করল।

৫০.

২৫-২৬ বছর বয়সী যুবক তাজউদ্দীন আজ ভেতরে ভেতরে কিছুটা উত্তেজিত। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি। অথচ এত ভোরে না উঠলেও চলত। আজ ১১ মার্চ, আজ রাষ্ট্রভাষা দিবস। আজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ এই দিনে ছাত্র-জনতা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছিল, মিছিলে ব্যারিকেডে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তারও পরে আক্রমণ চালিয়েছিল খাজা নাজিম উদ্দিনের পুলিশ বাহিনী। তিন বছর পর, এই ১৯৫১ সালে, সেই দিনটাকে আবার বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার।

১৯৪৯ সালে দিনটা তেমন করে পালিত হতে পারেনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে আন্দোলন চলছিল তখন। গত বছর এই সময়টাতে চলছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতার দাঙ্গার ঢেউ আছড়ে পড়ে ঢাকায়। তারপর ঢাকার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে, গ্রামগঞ্জে।

ফজলুল হক হলের কমনরুমে পত্রিকা পড়তে পড়তে তাজউদ্দীন সেসব কথাই ভাবছিলেন। ঢাকায় যেসব অবাঙালি শরণার্থী এসেছিল, দাঙ্গায় তাদের উৎসাহ ছিল বেশি। কারণ, ঢাকায় থাকার মতো বাড়িঘর পাওয়া যাচ্ছিল না, এমনকি বাসা ভাড়াও পাওয়া যায় না। হিন্দু পরিবার তাড়িয়ে তারা সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছিল। সারা দেশেও একই কারণে দাঙ্গা তথা গুন্ডামি ছড়িয়ে পড়ল। এটা ছিল হিন্দুদের জোতজমি, হালের গরু দখল করার একটা মোক্ষম উপলক্ষ।

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বা ১৫০ মোগলটুলিকেন্দ্রিক ছাত্র-যুবারা আগে থেকেই সচেষ্ট আর সচেতন। তারা এবার ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করবে।

আজকের পত্রিকায় পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু উত্তেজনাকর খবর আছে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, যিনি আবার প্রতিরক্ষামন্ত্রীও, তাঁর নির্দেশে মেজর আকবর খান, ব্রিগেডিয়ার লতিফ, মিসেস আকবর খান, *পাকিস্তান টাইমস*-এর সম্পাদক কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুদিন আগে। আজ খবরের কাগজে আছে সেই খবরটা।

সামনে যুব কনভেনশন। মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখের সঙ্গে তাজউদ্দীনও এই যুব সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। গত রাতেও তাঁরা পশ্চিম ব্যারাকে গিয়ে যুব সম্মেলনের জন্য চাঁদা তুলেছেন। কাল রাতে শুতে শুতে তাই সোয়া ১১টা বেজে গিয়েছিল।

সামনে পরীক্ষাও। হল অফিস থেকে প্রবেশপত্র তুলেছেন গতকাল। খবরের কাগজ পড়ে নিজের রুমে এলেন তাজউদ্দীন। পরীক্ষার পড়া খানিকটা পড়ে রাখা ভালো। সামনের দিনগুলোয় তাঁর কাজ আরও

বাড়বে। রাজনীতির কাজ। পড়াশোনা যতটা পারা যায়, এগিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থনীতি নিয়ে পড়ছেন তিনি। তাঁর রুমমেট মোজাফফর আলীও পড়ছেন অর্থনীতি নিয়ে।

রুমমেট একই বিষয়ের ছাত্র হওয়ায় তাজউদ্দীন আহমদের সুবিধা হয়েছে। তিনি নিজে সারা দিন ব্যস্ত থাকেন রাজনীতি নিয়ে। আজকাল অবশ্য তাঁর নিজের এলাকা কাপাসিয়ার বন বিভাগের সঙ্গে কী একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। বন বিভাগের কর্মচারীরা যেসব অপকর্ম ও দুর্নীতি করে, তাজউদ্দীন তার প্রতিবাদ করছেন। তাদের ধরিয়ে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ফন্দিফিকির করছেন। প্রায়ই তাঁকে বন বিভাগের ঢাকা অফিসের উচ্চতর কর্মকর্তাদের কাছে যেতে হচ্ছে।

রুমমেট মোজাফফর আলীর পারিবারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। বলা যায়, তিনি একজন সহায়-সম্বলহীন মানুষ। টিউশনি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালান। উল্টো তাঁকে গ্রামে টাকা পাঠাতে হয়। তাজউদ্দীন আহমদ নিজেই গিয়ে দেখা করলেন প্রভোস্ট ড. এম এন হুদার সঙ্গে। তাজউদ্দীনকে অবশ্য প্রভোস্ট এম এন হুদা কিংবা হাউস টিউটর বি করিম খুবই পছন্দ করেন। ছেলেটা কথা বলে কম, কিন্তু কাজ করে যায় নীরবে। বোঝা যায়, চিন্তাভাবনা করে পথ চলে। তিনি যে ছাত্রনেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য, সেটা এই শিক্ষকেরা বোঝেন এবং তাঁর কথাকে মূল্য দেন।

এম এন হুদাকে তাজউদ্দীন বললেন, 'স্যার, মোজাফফর আলীর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বিবেচনা করতে হবে। ওর ইকোনমিক অবস্থা তো খুবই খারাপ। টিউশনি করে টাকা আয় করে। আবার বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়। গত মাসে তো যা টিউশনি করে পেল, তার চেয়ে বেশি টাকা তাকে বাড়িতে পাঠাতে হয়েছে। আমাদের কাছে ধারকর্জ করতে হচ্ছে তাকে। আপনি স্যার ওর হলের ডাইনিং চার্জটা যদি মওকুফ করে দিতেন।'

এম এন হুদা তাকালেন তাজউদ্দীনের দিকে। ছেলেটার চোখ উজ্জ্বল। কিন্তু চশমা ঢাকা চোখেমুখে পড়াশোনার ছাপ। আজকালকার ছাত্রনেতারা সাধারণত অদ্ভুত অদ্ভুত দাবিদাওয়া নিয়ে আসে। এই ছেলেটা এসেছে তার রুমমেটের জন্য।

তিনি বললেন, 'তুমি এক কাজ করো। মোজাফফরকে বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। একটা পিটিশন করতে হবে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।'

তাজউদ্দীন এসে বললেন মোজাফফরকে, 'আপনি প্রভোস্টের সঙ্গে

দেখা করেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে এসেছি। আপনি গেলেই হবে।'

মোজাফফর আলী নিয়মিত ক্লাস করেন। সুন্দর করে নোট তুলে রাখেন। রাত নটা-দশটার দিকে তাজউদ্দীন হলে ফিরে এসে মোজাফফরকে বলেন, 'কী কী পড়লেন একটু বোঝান দেখি।'

মোজাফফর যা পড়েছেন, তা থেকে যা বুঝেছেন, তা-ই বিবৃত করেন। তাজউদ্দীন মন দিয়ে শোনেন। মাঝেমধ্যে প্রশ্ন করেন। এইভাবে রাত ১১টা-১২টা পর্যন্ত একসঙ্গে পড়াশোনা করেন দুজন। পড়াশোনা কথাটা তাঁদের দুজনের বেলায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য, মোজাফফর পড়েন, তাজউদ্দীন শোনেন।

আজ মোজাফফর বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু ক্লাস হবে না, রাষ্ট্রভাষা দিবসের ধর্মঘট, আমি একটু যাই। টিউশনিটা সারি। আমার ছাত্রের ম্যাট্রিক পরীক্ষা। মোজাফফর চলে গেলেন।

নিজের পড়াটা একটু এগিয়ে নিলেন তাজউদ্দীন। অর্থনীতি পড়তে তাঁর ভালো লাগে। তিনি অর্থনীতি বিষয়টা বেছে নিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতিটাই চালিকাশক্তি। অর্থনীতিটা বুঝতে হবে। তাহলেই দেশের মানুষের মুক্তির জন্য কী ধরনের রাজনীতি দরকার, সেটা বোঝা যাবে।

কুহু কুহু। কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে। বসন্তকাল। জানালা দিয়ে বসন্তের বিখ্যাত দখিনা বাতাসও এসে ঢুকে পড়ছে ঘরে।

তাজউদ্দীনের একটুখানি উদাসমতো লাগে। এমনিতেই প্রচণ্ড গরম। শরীর ঘর্মাক্ত। এর মধ্যে এই বাতাসটা এসে যখন শরীরে ঝাপ্টা দেয়, খুবই আরাম লাগে।

নাহ। ওঠা যাক। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাওয়া যাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা। আমগাছের ছায়ায় সমবেত হয়েছে ছাত্ররা। বসন্তের বাতাসে পাতারা নড়ছে। নড়ছে ছায়াও। তবু প্রচণ্ড গরম, সেটা মানতেই হবে। ছাত্রদের অবশ্য গরম-ঠান্ডা এই সব দিকে মোটেও খেয়াল নেই।

সভাপতিত্ব করলেন মুসলিম ছাত্রলীগের খালেক নেওয়াজ খান। হাবিবুর রহমান শেলী, বদিউর রহমান, মোহাম্মদ আলী বক্তৃতা করলেন। তাজউদ্দীন একটু মুখচোরা স্বভাবের। তিনি এসব সভায় বক্তৃতা করেন না সাধারণত।

বক্তাদের বক্তব্য বিষয় মোটামুটি এই রকম : ১৯৪৮ সালে খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে যে একটা চুক্তি হয়েছে, সেটা কেন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। নুরুল আমিন সরকার যদি এই চুক্তি বাস্তবায়ন না করার কথা ভাবে, তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়ংকর। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাদেরও ইতিহাস ক্ষমা করবে না। সারা দেশে যে অরাজকতা চলছে, দেশের মানুষ যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা না করে আরবি অক্ষরে বাংলা লেখানোর যে অপপ্রয়াস চলছে, এসবের জন্য দায়ী অযোগ্য মুসলিম লীগ সরকার। তার প্রতিবাদে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সব সদস্যের উচিত একযোগ পদত্যাগ করা।

আবদুল মতিন এক কোণে সভার শ্রোতাদের ভিড়ের মধ্যে বসে ছাত্রনেতাদের ভাষণ শুনছেন। তাঁর কোনো ভাষণই ভালো লাগছে না। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। 'মাননীয় সভাপতি, আমি কিছু বলতে চাই।'

সভাপতি আবদুল মতিনকে কথা বলার অনুমতি দিলেন।

আবদুল মতিন বলতে লাগলেন, 'শোনেন, কিছুদিন আগে ফজলুল হক হলের পশ্চিম-দক্ষিণ ব্যারাকে চায়ের দোকানে বসে ছিলাম। আমার পাশে টুলে বসে আছেন দুই ব্যক্তি, কথাবার্তা শুনে বেশভূষা দেখে আমি বুঝতে পারলাম, তারা সচিবালয়ের কর্মচারী। তাদের একজন আরেকজনকে বলছে, "ছাত্রদের আন্দোলন থেমে গেল। বাংলা আর রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে না, উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হয়ে যাবে। আমরা উর্দু পড়তে পারি না। লিখতে পারি না। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে আমাদের তো খুব অসুবিধা হবে। কী আর করি। আমরা চাকরি করে খাই। আমরা তো আর আন্দোলন করতে পারব না। আন্দোলন করতে গেলে আমাদের চাকরি চলে যাবে। আন্দোলনে নামা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্ররা ছিল আশা-ভরসা। তারাও ঠান্ডা হয়ে গেল।"

'সত্যি কি আমরা ঠান্ডা হয়ে যাইনি! মাননীয় সভাপতি, এইভাবে সভা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে? আপনারা যা কিছু করছেন সবই তো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এতে কোনো কাজ হবে না। যদি বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে রাস্তায় আন্দোলনে নামুন। আপনারা সংগঠন গড়ে তুলুন।'

উপস্থিত ছাত্ররা বিপুল করতালিতে অভিনন্দিত করল এম এ মতিনের ভাষণ।

ছাত্ররা বলল, 'পরে নয়, এখনই একটা কমিটি করুন।'

তখন একটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হলো। এম এ মতিনকেই আহ্বায়ক করা হোক, ছাত্ররা আওয়াজ তুলল। এম এ মতিনই আহ্বায়ক হলেন। তাজউদ্দীন আহমদকে ওই কমিটির একজন সদস্য রাখা হলো।

সভা শেষ হলে তাজউদ্দীন গেলেন মধুর দোকানে। গিয়ে দেখেন, সেখানে গন্ডগোল বেধে গেছে। কেউ ক্লাস করছে না। এ অবস্থায় চারজন ক্লাসে ছিল। এরা সবাই অবাঙালি। চারজনের মধ্যে আবার তিনজন বেরিয়ে এসেছে ক্লাস থেকে। কিন্তু জুবায়ের নামে একজন কিছুতেই ক্লাস থেকে বেরোবে না। সে আবার ড. শাদানির ভাগনে, তারই তেজ দেখাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন সেও এসেছে মধুর চায়ের দোকানে।

ওয়াদুদ খেপে গেছে। সে জুবায়েরকে পারলে মারে। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলো, জুবায়েরও চিৎকার করছে। ক্লাস এসেছি ক্লাস করতে। আমগাছতলায় গিয়ে আড্ডা মারতে তো আসিনি। ধর্মঘট করা তোমাদের অধিকার। না করা আমার অধিকার। এবার সব বাঙালি ছেলে যদি জুবায়েরকে মারতে আরম্ভ করে ও তো ছাতু হয়ে যাবে। তাজউদ্দীন প্রমাদ গুনলেন। তাড়াতাড়ি তিনি দাঁড়ালেন দুই পক্ষের মধ্যখানে। শিক্ষকেরাও এলেন। একটা সম্ভাব্য খণ্ডযুদ্ধ এড়ানো গেল।

৫১.

দুই দিন পর এই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বৈঠক বসল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাজউদ্দীন যোগ দিলেন তাতে।

বসন্তের এই দিনগুলো এই রকমই যাচ্ছে তাজউদ্দীনের। আজ এই সভা, কাল ওই সভা। মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা আন্দোলন করছে, তিনি ছুটে যাচ্ছেন সেখানে। আবার ফজলুল হকের বার্ষিক মিলাদ হবে, আবুল হাশিম সাহেব, কামরুদ্দীন আহমদ সাহেবকে অতিথি করে সেখানে আনার কাজটাও তিনি করছেন।

আবুল হাশিম সাহেব এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে এসেছেন ঢাকায়। দাঙ্গার সময় তাঁর বর্ধমানের বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়েছে। ইদানীং তিনি পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে বর্ধমান ছাড়েন তিনি। কলকাতায় একসময় ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। কত তাঁর ভক্ত-অনুসারী ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলিম লীগাররা তো সব পূর্ববঙ্গে চলে এসেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির যাঁরা তাঁর ভক্ত ছিলেন, তাঁরাও কেউ তাঁকে আশ্রয় দিলেন না। আবার ফিরে গেলেন বর্ধমানে। এইখানে তাঁদের আছে বংশগত ঐতিহ্য। গ্রামের নাম ছিল কাশিয়ারা, আবুল হাশিমের বাবার নাম অনুসারে সেটা হয়েছে কাশিমনগর। গ্রামের গরিব প্রজারা বলল, 'কর্তা, আপনি থেকে যান, আমরা থাকতে কেউ আপনার গায়ে হাত দিতে পারবে না।' এই কথাতেই নাকি হাশিম সাহেব বেশি দুঃখ পেয়েছেন। এত দিন যাঁদের তাঁরা রক্ষা করে এসেছেন, এখন তাঁরাই তাঁকে অভয়বাণী দিচ্ছে। তাঁর সামন্ত অভিজাততান্ত্রিক মনে এটাই নাকি বেশি ব্যথা দিয়েছে।

আবুল হাশিম সাহেব, কামরুদ্দীন সাহেব তো মিলাদে এসেছিলেন, এসেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও।

আবার একদিন দুপুরবেলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা। সভাপতিত্ব করলেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলী। খসড়া কমিটি একটা স্মারকলিপি পেশ করল। এই স্মারকলিপি সব এমএলএ আর এমসিএর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাজউদ্দীন আহমদ হাতে নিলেন খসড়াটি। ইংরেজিতে রচিত :

সমীপেষু

সদস্য, গণপরিষদ
করাচি, পাকিস্তান।

জনাব,

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যারা তিন বছর আগে পূর্ব বাংলায় ভাষার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলাম তারা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সেই লক্ষ্য অর্জনের বেশি দৃঢ়সংকল্প। আমরা সেই সব ছাত্র আপনাদের

সবার করাচিতে একত্র হওয়ার উপলক্ষকে সামনে রেখে আরও একবার আমাদের ন্যায়সংগত দাবি পূরণের জন্য আপনাদের তাগাদা দেব।

অনেক বড় হয়েছে স্মারকলিপিটি। আরেকটু ছোট হলে ভালো হতো, তাজউদ্দীন ভাবলেন। যা-ই হোক, ছোটখাটো সংশোধনী শেষে খসড়াটা অনুমোদিত হলো।

পয়লা বৈশাখ পেরিয়ে গেল। বসন্তের বাতাস এখন পরিণত হচ্ছে কালবৈশাখীতে। গতকালও সারা দিন ধূলিঝড় হয়েছে। গরম খুব। আজ অবশ্য বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। কিন্তু গরম কমছে না।

তাজউদ্দীন ফজলুল হক হলের ৭৬ নম্বর রুমে বসে ঘামছেন। হাতে একটা কাগজ। সেটা নেড়ে নেড়ে বাতাস করছেন। রুমে আরও কয়েকজন উপস্থিত। আবারও বসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা। আজ সভাপতিত্ব করছেন তাজউদ্দীন নিজে।

ইদানীং তাজউদ্দীন কথা বলতে শুরু করেছেন। একটু একটু করে সামনে আসছেন। যুবলীগের কমিটিতেও তাঁকে রাখা হয়েছে।

গত মাসে যুব সম্মেলনে এই কমিটি হয়। সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্যও বেশ পরিশ্রম করেছেন তাজউদ্দীন। সম্মেলন হওয়ার কথা বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে। কিন্তু সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মিটিং করা যাবে না। রাতের মধ্যে সবাইকে খবর দেওয়া হলো জিঞ্জিরা বাজারে আসার জন্য। দুপুরে সভা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সন্ধ্যার পর সভা শুরু হয়। আসলে উদ্যোক্তারা পুলিশি হামলার আশঙ্কা করছিলেন। তাই বিকল্প ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন। কনভেনশনের উদ্বোধন করলেন ডেইলি *অবজারভার*-এর সভাপতি আবদুস সালাম। সভাপতিত্ব করেন সিলেটের মাহমুদ আলী। তিনি যথারীতি শেরওয়ানি আর পায়জামা পরে এসেছেন। তিনি আসলে ভক্ত মওলানা ভাসানীর। ভাসানী মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেছেন, মাহমুদ আলীও মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়েছেন।

পুলিশের লোকজন গিজগিজ করছে।

রাত ১০টায় সভা থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিরা আলাদা আলাদা চারটা নৌকায় উঠলেন। পুলিশ কিছু বুঝতে পারল না। মাঝনদীতে গিয়ে চার নৌকা একত্র হলো। একসঙ্গে বাঁধা হলো নৌকা চারটাকে। ১৪৪ ধারা ফাঁকি দিয়ে চাঁদের আলোর নিচে বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসতে ভাসতে অনুষ্ঠিত

হলো যুবলীগের প্রতিনিধি সম্মেলন। রাত ১১টায় এ সম্মেলন শুরু হলো। একটা করে জাহাজ যায়। পানিতে ঢেউ ওঠে। নৌকা ওঠে দুলে। আলোচনার গাম্ভীর্য আর গুরুত্ব তাতে একটুখানি টলে না।

খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হলো। মাহমুদ আলীকে সভাপতি আর অলি আহাদকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হলো এর কমিটি। তাজউদ্দীনকেও রাখা হলো এই যুবলীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে।

নৌকাগুলো ভাসতে ভাসতে চলে গেল অনেকটা ভাটিতে। আবার উজানপথে চলতে শুরু করল বোটগুলো। আলোচনাও চলতে লাগল উজানপথে পূর্ব বাংলার মানুষের দাবিদাওয়াগুলো কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, তা নিয়ে।

রাত আড়াইটায় নৌকা ভিড়ল মিটফোর্ড ঘাটে। সহকর্মীদের সঙ্গে নেমে পড়লেন তাজউদ্দীনও। ঘোড়ার গাড়ি করে এলেন ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে। চা খেলেন।

তারপর ফিরে এলেন হলে।

সে রাতে তাজউদ্দীনের আর কিছু খাওয়া হলো না। ভোরবেলা শুতে গেলেন।

সে রাতে তিনি হলেন যুবলীগের সদস্য, আজ তিনি **সভাপতিত্ব** করছেন রাষ্ট্রভাষা কমিটির সভায়।

তাজউদ্দীনের মনে হচ্ছে, এর আগে যে স্মারকলিপি এমএলএ আর এমসিএদের পাঠানো হয়েছিল, সেটা বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ব্যস্ত মানুষের জন্য স্পষ্ট কথা সংক্ষেপে পেশ করা ভালো। এর একটা সহজ উপায় আছে। তা হলো, সবাইকে টেলিগ্রাম পাঠানো। তাতে আসল কথাটা তাঁদের কাছে দ্রুত গিয়ে পৌঁছাবে। টেলিগ্রাম বলে তাঁরা ফেলেও দেবেন না, পড়ে দেখবেন।

এই প্রস্তাবই তিনি পেশ করলেন এই সভায়।

তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলো।

টেলিগ্রামের একটা খসড়াও তৈরি করে ফেলা হলো :

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আপনাদের কাছে জরুরি আবেদন জানাচ্ছে যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে শর্ট নোটিশ প্রশ্ন উত্থাপন করুন।'

টেলিগ্রামটা পাঠানোর দায়দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে সেদিনের মতো সভার কাজ শেষ হয়।

৫২.

তাজউদ্দীন আহমদ ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে পৌঁছে দেখলেন, মওলানা ভাসানী আগেই পৌঁছে গেছেন। ভোরবেলা। ছয়টা পাঁচ মিনিটে ট্রেন। বৈশাখ মাস শেষে জ্যৈষ্ঠ আসি আসি। কাল প্রচণ্ড রোদ ছিল। আজ সকালটা মেঘলা মেঘলা। মনে হয়, একটু পরে বৃষ্টি হবে।

আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকও এসেছেন। এরই মধ্যে আরও কয়েকজন কর্মী তাঁদের ঘিরে ধরেছেন।

তাজউদ্দীন আহমদ ভাসানীকে সালাম জানালেন।

'ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়ব তো? খোঁজ নিছ?' ভাসানী বললেন।

তাজউদ্দীন একজন কর্মীকে পাঠালেন স্টেশনমাস্টারের কাছে।

এই সময় একজন অপরিচিত লোক এসে ভাসানীকে সালাম দিলেন। বললেন, 'হুজুর, আমার ওপরে অর্ডার হইছে, আপনার মৈশনের মিটিং আমিই রিপোর্ট করব।'

মওলানা বললেন, 'কয়ো। তোমার কাম তুমি করবা, আমার কাম আমি করব।'

লোকটা হাত কচলে কাচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমার যাওয়ার আর ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েন।'

মওলানা বললেন, 'তুমি মিয়া তোমার পা দিয়া যাইবা, আমরা যামু আমগো পা দিয়া। ব্যবস্থা তো আল্লাহতালাই কইরা রাখছে। তাজউদ্দীন, দেখো, কী ব্যবস্থা করতে পারো। ডিআইবির লোক। আমাগো সঙ্গে যাওনের ডিউটি পড়ছে বেচারার ওপরে।'

ট্রেন ছাড়ল যথাসময়েই।

মওলানার এই জনসভাটা তাজউদ্দীনই আয়োজন করেছেন। তাঁদের এলাকার কাছে হবে জনসভাটা। এলাকার লোকজন এসে ধরেছিল, তারা ভাসানীকে তাদের এলাকায় মিটিংয়ের জন্য নিয়ে যেতে চায়। তাজউদ্দীনই ভাসানীর কাছে নিয়ে গেছেন তাদের। জনসভার তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এমনকি লিফলেট লিখে দিয়েছেন। শামসুল হককেও তিনিই

বলেছেন। মুজিব ভাই বাইরে থাকলে তাঁকেও বলতেন জনসভায় যেতে। মুজিব ভাই ভাষণটা খুব ভালো দেন।

ট্রেন ঠিক ছয়টা পাঁচ মিনিটেই ছাড়ল। ভাসানীকে উঠিয়ে দিয়ে শামসুল হক সাহেবের পেছন পেছন তাজউদ্দীন উঠে পড়লেন ট্রেনে। আর সবাই উঠল। ডিআইবির সদস্যও উঠে পড়লেন। ট্রেন টঙ্গী পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। টঙ্গী স্টেশনে ট্রেন থামল। শামসুল হক বললেন, 'আমি নেমে যাব।'

তাজউদ্দীন বললেন, 'নেমে যাবেন মানে?'

শামসুল হক বললেন, 'আমি ফিরতি ট্রেনে ঢাকা ফিরে যাব।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

'কী দরকার।'

'আছে।' বলে তিনি ট্রেন থেকে সত্যি সত্যি নেমে গেলেন।

তাজউদ্দীন বিস্মিত। ইদানীং শামসুল হকের ভাবভঙ্গি একটু ছাড়া ছাড়া। একটু ধার্মিক হয়ে পড়ছেন। আবুল হাশিম সাহেবও খেলাফতে রব্বানি নামের দল করার কথা বলছেন। বর্ধমানে বাড়ি পোড়ার পর ভিটেমাটি ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এই একদা বামপন্থী বলে পরিচিত লোকটা এখন রবের খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বইপুস্তক লিখছেন। শামসুল হক আগে থেকেই তাঁর ভক্ত ছিলেন। সত্যি বলতে কি, আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম দিনের ইশতেহারে আবুল হাশিমের এই সব আধ্যাত্মিক লাইনের তত্ত্ব অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছিল।

শামসুল হকের আরেকটা পিছুটান আছে। তা হলো তাঁর স্ত্রী। তিনি ইডেন কলেজের ইংরেজির শিক্ষিকা। আফিয়া খাতুন। আফিয়া খাতুনের বাবা নরসিংদীর সেকান্দর মাস্টার। আফিয়া খাতুন নবাবপুর রোডে বাসা নিয়েছেন। তাঁদের একটা মেয়ে হয়েছে।

কামরুদ্দীন সাহেব তাজউদ্দীনকে বলেন, 'আফিয়া খাতুনকে বিয়ে করায় শামসুল হকের অর্থনৈতিক অসুবিধা কমে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতাও কমছে সেই সঙ্গে। কারণ আফিয়া চান, তাঁর স্বামী সংসারের দায়িত্ব পালন করুন। তিনি চান, শামসুল হক উকিল হোক। টাকাপয়সা আয় করুক। সমাজে পরিচয় দেওয়ার মতো একটা অবস্থানে আসুক। সব রাজনীতিবিদই তো আইন ব্যবসায় ভালো, সোহরাওয়ার্দী সাহেব, ফজলুল হক সাহেব, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন সাহেব—শুধু শামসুল হক কেন কিছু

করবেন না। এই পিছুটানে শামসুল হক কিছুটা দিশেহারা। অন্যদিকে দেখো, শেখ মুজিবের স্ত্রী। তিনি কোনো দিনও মুজিবকে পেছনের দিকে টানেননি। স্বামীর সব কাজেই তিনি হ্যাঁ বলে দিয়ে রেখেছেন।'

শ্রীপুর স্টেশনে নামলেন সবাই। তখন কেবল সাড়ে সাতটা। তাঁরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাংলোয় গিয়ে উঠলেন বৃষ্টিভেজা পথ বেয়ে। লুঙ্গি তুলে ভাসানী হাঁটছেন। তাঁর এসব কর্দমাক্ত পথে হাঁটার দিব্যি অভ্যাস আছে।

বেলা ১১টা পর্যন্ত তাঁরা ওই ডাকবাংলোতেই অপেক্ষা করলেন। কারণ, আগে থেকে গাড়ির কোনো ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। তাজউদ্দীন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন গাড়ির ব্যবস্থা করতে। সাড়ে ১২টার দিকে তিনটা মোষের গাড়ি এল। মওলানাসহ ঢাকা থেকে আগত নেতা-কর্মীদের গাড়িতে তুলে দিলেন তাজউদ্দীন। গাড়ি রওনা হলো। আর নিজে চললেন হেঁটে।

আড়াইটায় তাঁরা পৌঁছালেন গোসিংগা। সেখান থেকে সাড়ে চারটায় মোষের গাড়ি পৌঁছাল দেওনা কাচারি। এরপর আর গাড়ি যাবে না। মওলানাও নামলেন। প্রায় ৬৫ কি ৭০ বছর বয়স মওলানার। হাঁটতে লাগলেন সবার আগে। এক ঘণ্টা হেঁটে তাঁরা পৌঁছালেন মৈশনের মিয়াবাড়ি। এখানেই তাঁদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিকেল সাড়ে চারটায় তাঁরা দুপুরের খাবার খেলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু হলো জনসভা। মাইক্রোফোনে আওয়াজ হচ্ছে দারুণ। সকাল ১০টার পরে ঝড়বৃষ্টিও গেছে থেমে। আবহাওয়া অতি মনোরম। তাজউদ্দীন মাইকে ঘোষণা দিলেন, এবার বক্তব্য রাখবেন মজলুম জননেতা, সংগ্রামী জননেতা অনলবর্ষী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী...

ভাসানী সারা দিনের ধকলের পর দাঁড়িয়ে মাত্র দেড়টা ঘণ্টা একটানা ভাষণ দিলেন। মুসলিম লীগের দুঃশাসন যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মওলানার অগ্নিবচনের উত্তাপে। সমস্ত জনসভা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনল তাঁর বক্তৃতা।

রাত্রিবাস হলো ওখানেই। পরের দিন মিয়াবাড়িতে নাশতা করে সবাই মিলে রওনা দিলেন হেঁটে। সকাল আটটার দিকে। তাজউদ্দীন আহমদের বাড়ি পৌঁছাতে লাগল আড়াই ঘণ্টা।

দই খেয়ে আধঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে মোষের গাড়িতে করে তাঁরা রওনা দিলেন শ্রীপুর স্টেশনের দিকে।

৫৩.

চার কি পাঁচ বছরের হাসু যেন একটা বিশাল খেলাঘর পেয়ে গেছে। ফ্রকের কোনা ধরে আঙুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে সে তাকায় গোপালগঞ্জের থানা চত্বরের দিকে। লাল রঙের ইটের দালান, লাল রঙের টিনের ছাদ। এটা ঠিক যেন একটা পুতুলের বাড়ি। বাড়িটা একটু বড়, এই যা! পুতুলগুলোকেও তো তাহলে বড় হতে হবে। কত বড় পুতুল হলে এত বড় ঘরবাড়িগুলোয় মানিয়ে যাবে। মাঠটাও কত বড় আর সবুজ। গাছপালাগুলোও পুতুলের বাড়ির গাছপালা। তাদের টুঙ্গিপাড়ার বাড়ির সামনেও মাঠ আছে, গাছপালা আছে। কিন্তু তাদের বাড়ির গাছগুলোর নিচটা তো এমন সাদা রং করা নয়।

মা বললেন, 'হাসু, আমরা গোপালগঞ্জ যাচ্ছি। তোমার আব্বার সাথে দেখা করতি।'

হাসুর মনের মধ্যে তখন গোপালগঞ্জের একটা কল্পনার ছবি আঁকা হয়ে যায়। এর আগেও সে গোপালগঞ্জ গেছে, সেবারও আব্বাকেই দেখতে। কিন্তু তখন সে ছিল খুব ছোট, তার কিচ্ছু মনে নেই। এবার তার মনে হয়েছিল, টুঙ্গিপাড়ার বাইগারখালের পাড়ে, একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে যখন সে ছাগলছানাগুলোর পিছনে ছুটছিল, ছাগলছানার গলায় ঘুঙুর পরানো ছিল বলে ঝুমঝুম আওয়াজ হচ্ছিল, সেই আওয়াজ থেকে তার মনটাকে সরিয়ে নিল তার চোখ। একটা ঝলমলে হলদে-কালো প্রজাপতি ওই মধুর গাছের সাদা সাদা ছোট ফুলের ওপরে ছটফটে পাখা মেলে ওড়াউড়ি করছে। হাসু তার পিছু নিল, সেখান থেকে তার চোখ পড়ল গিয়ে চোরকাঁটায় ভরা দূর্বা ছাওয়া মাঠটাতে। তার বন্ধু, সমবয়সী রানু বলল, 'হাসু দেখ দেখ, এইখানে ফড়িংয়ের বাজার বসছে, এই বাজার গোপালগঞ্জ টাউনের বাজারের সমান।'

তখনই হাসুর মনে পড়ল, তারা গোপালগঞ্জ যাচ্ছে, আব্বাকে দেখতে। তার মনে হলো, গোপালগঞ্জের সবকিছু পোড়ামাটির তৈরি—বাড়িঘরগুলো পোড়ামাটির, রাস্তাঘাটগুলো পোড়ামাটির, যেমন পোড়ামাটিতে হয়

কলসি, হাঁড়িকুড়ি, শানকি, তেমন। এইটা মনে হওয়ার কারণ, গোপাল নামের একজন কুমার তাদের বাড়ি বাঁক বয়ে নিয়ে আসত লাল লাল মাটির হাঁড়ি। নৌকায় করে টুঙ্গিপাড়া থেকে আসার পথে, খাল থেকে নদীতে পড়ার সময়ে শাপলার ফুল ধরে হাসু টান দিয়েছিল। দাদা লুৎফর রহমান আঁতকে উঠেছিলেন, 'হাসি, পইড়ে যাবি তো! মাঝখানে বস।' মা হাসুকে টেনে কোলের কাছে নিয়েছিলেন। আর ছোট্ট কামাল, শাপলার সাদা দল দেখে মুগ্ধ। বারবার ওই দিকে আঙুল তুলে বলছে, 'ফুল দেও, ফুল দেও।' দাদি তাকে কোলে ধরে রেখেছেন। চঞ্চল ছেলে আবার পানিতে পড়ে না যায়।

দাদা-দাদি, মা, হাসু—সবাই মিলে তারা চলেছে গোপালগঞ্জে—আব্বাকে দেখতে।

গোপালগঞ্জে তাদের বাসা আছে, আদালতপাড়াতেই। কাজেই তাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

আব্বা থানার মধ্যে একটা ঘরে বসে আছেন। বারান্দায় পুলিশ, ভিড় ঠেলে সামলাতে পারছে না। মুজিব ভাই এসেছে, আজকে তাঁর মামলার তারিখ পড়েছে, শুনেই কর্মীর দল আর সাধারণ মানুষ ভিড় করছে তাঁকে একটা নজর দেখার জন্য। মুজিবের বয়স ৩২-এর মতো। তিনি পরে আছেন ফুলহাতা শার্ট আর পায়জামা।

হাসুকে হাতে ধরে আর কামালকে কোলে নিয়ে হাসুর মা রেনু ঢোকেন ওই ঘরে। পুলিশ আর গোপালগঞ্জের আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা তাদের এগিয়ে নেন। পেছনে পেছনে মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে আসেন হাসুর দাদি। দাদা একটু পিছে পড়েছেন। ছেলে তার ছোটবেলায় খুব সল্টেড বিস্কুট খেতে পছন্দ করত, যখন সে ছিল এই গোপালগঞ্জে, আর পড়েছে মিশন স্কুলে, তখন তাকে অনেক দিন তিনি সল্টেড বিস্কুটের প্লাস্টিকের প্যাকেট কিনে দিয়েছেন। লুৎফর রহমান দুটো বিস্কুটের প্যাকেট কিনে আনেন। ছেলেরা যে বড় হয়ে যায়, বাবা-মা অনেক সময় সেটা বুঝতেও পারেন না।

রেনু বলে, 'এই যে দেখো তোমার কামাল, কত বড় হয়েছে। কত কথা বলে। নেও, কোলে নেও।' কামালকে মুজিব কোলে নেন। চুমু দিয়ে গালটা নেড়ে বলেন, 'কেমন আছো, বাবা।'

এর মধ্যে হাসু কাছে আসে, 'বলে, আব্বা, এখানে গাছগুলোর নিচে সাদা কেন?'

মুজিব তখন হাসুর দিকে তাকান। 'আরে, আমার মেয়েটা তো অনেক বড় হয়ে গেছে।'

আসলেই মুজিব অনেক দিন হাসুকে দেখেন না। প্রায় দুই বছর। এর মধ্যে হাসুর বয়স ডাবল হয়ে গেছে।

হাসু বলে, 'আব্বা, আপনিও বড় হয়ে গেছেন।'

রেনু বলেন, 'আম্মাও এসেছেন। কথা বলো। আম্মা ঘোমটাটা একটু সরান। আপনার ছেলে আপনার মুখ দেখবে না!'

'মা কাছে আসো।' মুজিব ডাকেন মাকে। এগিয়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেন।

সায়রা খাতুন, মুজিবের মা, ছেলেকে হাতের মধ্যে পেয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না। একবার অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলতে পারলেন, 'খোকা, ভালো আছিস বাবা?'

রেনু কিন্তু কাঁদবেন না। তিনি শক্ত হয়ে থাকবেন। মুজিবের সঙ্গে তাঁর এইটাই চুক্তি। তিনি বলেছেন, 'তুমি শুধু আমার জন্য ভাববা না, তুমি সারা দেশের জন্য ভাববা। মানুষের জন্য কাজ করবা।'

এখন চোখের জল ফেলে মুজিবকে সেই ব্রত থেকে সরাবেন না রেনু। তিনি শক্ত হয়ে থাকেন।

মুজিব বলেন, 'রেনু, কেমন আছো?'

'ভালো আছি আল্লাহর ইচ্ছায়। তোমার স্বাস্থ্য দেখি খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

একটা কাশি দিয়ে মুজিব বলেন, 'আরে না, একটু ঠান্ডা লেগেছে।' মুজিব আসলে সত্য গোপন করছেন। তাঁর কাশিটা বেশ মারাত্মক। ব্রঙ্কাইটিসের মতো হয়েছে তাঁর। শুকনো কাশির সঙ্গে রক্তও পড়ছে। এসব কথা তিনি এখন বলবেন না। রেনু মন খারাপ করবে, মা আরও কাঁদবেন।

ভিড় বাড়ে। হাসু আর কামাল চলে যায় পাশের টিনে ছাওয়া ভবনটার বারান্দায়। কী বড় মাঠ। আর দিঘির জলটা কত শান্ত। দেখলেই শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যায়। আরে আশ্চর্য, সেই হলুদ-কালো প্রজাপতিটা টুঙ্গিপাড়া থেকে কী করে এল গোপালগঞ্জে।

হাসু অবাক হয়ে ভাবে, গোপালগঞ্জটা মোটেও তার কল্পনার মতো নয়। এখানে পোড়ামাটি দিয়ে বানানো ঘরদোর, রাস্তাঘাট নাই।

কামাল আর হাসু মিলে প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ায়। নীলচে সবুজ কতগুলো কাঁটাগাছ। তার ডগায় হলুদ ফুল। প্রজাপতি একটা নয়,

কয়েকটা। তারা ফুলের গায়ে বসছে, কিন্তু ধরতে গেলেই উড়ে যাচ্ছে।

থানার এই ভবনটার পিড়িলি ঘেঁষে পরাটার গাছ। ছোট ছোট পানপাতার মতো পাতা। পুঁতির মতো গোল গোল সবুজ তার ডগার দিকটা। ওই পাতায় চাপ দিলে তেলের মতো বেরোয়। তাই বাচ্চারা ওটাকে বলে পরাটার গাছ।

সেই গাছ থেকে পাতা তুলতে তুলতে হাসু বলে, 'কামাল চল, রান্নাবাটি খেলি।'

তারা রান্নাবাটি খেলার জন্য নানা ধরনের ফুলপাতা, কলসির কানা, ইটের গুঁড়ো নিয়ে জমা করে বারান্দার লাল মেঝেতে।

পাশের দেয়াল বেয়ে সার বেঁধে যাচ্ছে কালো পিঁপড়ের দল।

'আচ্ছা চল, কামাল, আবার আব্বাকে দেখে আসি।'

'চলো।'

ওই সবুজ মাঠের মধ্যে দৌড়ে আবার তারা দুই ভাইবোন ওঠে সেই ঘরের বারান্দায়, যেখানে আব্বা আছেন।

হাসু বাবার কাছে যায়, 'আব্বা আব্বা, আমরা রান্নাবাটি খেলি।'

কামালও বলে, 'রান্নাবাটি খেলি।'

'খেলো মা, যাও।' মুজিব সালাম খান সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন। সালাম খানও এই মামলার আসামি। আবার তিনি অ্যাডভোকেটও।

হাসু আর কামাল ফের চলে আসে তাদের বিশাল খেলাঘরটার বারান্দায়। 'যা কামাল, তুই নদীতে ডুব দিয়ে আয়, ওই সিঁড়িটা হলো নদী, সেখানে গিয়া বল হাপুস, এই তো একটা ডুব হলো...আমি রান্না করি, এইটা তো ভাত, ওইটাতে মাছ, এইটা, এই লাল ইটের টুকরা হলো গোশত...'

আরেকটু খেলে হাসু বলে, 'কামাল, চল, আবার যাই আব্বাকে দেখে আসি।'

কামাল বলে, 'হাসু আপা, তোমার আব্বাকে একটু আব্বা বলে ডাকি...'

হাসু বিস্মিত হয় না। তার এই দুই-আড়াই বছরের ভাইটা আব্বাকে তো কমই দেখেছে। আব্বাকে সে বাসায় কোনো দিনও পায়নি। আব্বা সব সময়ই জেলখানায়। আব্বাকে তো আব্বা বলে ডাকার সুযোগই পায়নি।

হাসু বলে, 'চল চল। উনি কি খালি আমার আব্বা নাকি? পাগল। তোরও তো আব্বা।'

তারা দৌড়ে যায় মুজিবের কাছে। হাসু বলে, 'আব্বা, কামাল কী বলে

জানো, কামাল বলে', দৌড়ানোর কারণে হাসু হাঁপাচ্ছে, 'কামাল বলে, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে একটু আব্বা বলে ডাকি।'

আব্বা উঠে কামালকে লুফে কোলে তুলে নেন। আব্বা বলেন, 'কামাল আব্বা, আমাকে দেখো নাই তুমি, আমি বাড়ি আসি না, আমি তো তোমারও আব্বা...'

অনেক চুমু দেন তিনি ছেলেকে।

হাসু গিয়ে বাবার জামার কোনা ধরে। 'বলছি না আব্বা তোমারও আব্বা, ডাকো আব্বা বলে, বলো, আব্বা আমরা এখন খেলতে যাই?'

কামাল ছোট মুখে লজ্জা ফুটিয়ে বলে, 'আমরা খেলতে যাই...', আব্বা সে বলতেই পারে না।

মুজিব বলেন, 'বাবা, আমি তোমার আব্বা হই। বলো, আব্বা।'

কামাল বলে, 'আব্বা।'

মুজিব তাকে কোলে তুলে নেন।

তখন আকাশে একখণ্ড সাদা মেঘ সূর্যকে এক লহমার জন্য ঢেকে দেয় আর একটা ছায়া গোপালগঞ্জ থানার ওপরে একবার পাখা বিস্তার করে পরক্ষণেই রোদের ঝলক বইয়ে দেয়। কামাল কোল থেকে নেমে যায়।

মুজিব চশমা খোলেন। রুমাল হাতে নেন। চশমার কাচ ঘোলা হয়ে এসেছে। তিনি কাচ মোছেন।

হাসু আর কামাল আবার সবুজ মাঠের মধ্যে খেলতে থাকে।

৫৪.

ঢাকা কারাগারের ভেতরে জেল হাসপাতালের বেডে বসে শেখ মুজিব চিঠি লিখছেন। একটা চড়ুই পাখি তাঁর সেলের ভেতরে ঢুকে কিচিরমিচির করল খানিক। শেখ মুজিব পাখিটার দিকে তাকালেন। পাখিটা মনের সুখেই গান গাইছিল বোধ হয়। এবার টের পেল, সে বন্দী। তার বেরোনোর পথ জানা নাই। পাখিটা কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল, শেখ মুজিব খেয়াল করেন নাই। জানালায় একটা পর্দা লাগানো। চড়ুইটি কি সেই পর্দা পেরোনোর

পথ পাচ্ছে না। শেখ মুজিব উঠে পর্দাটা টেনে ফাঁকা করে দিলেন। একঝলক আলো এসে ঢুকল প্রকোষ্ঠের ভেতরে।

চড়ুইটা উড়ে চলে গেল।

মুক্তির আনন্দ!

শেখ মুজিবকে কিছুতেই ছাড়ছে না সরকার।

ফরিদপুর কারাগার থেকে তাঁকে ঢাকা আনা হয়েছে। কারণ, তাঁর শরীরটা খুবই খারাপ। কাশি, সর্দি এসব তো আছেই। তার ওপর তাঁর বুক ব্যথা করে। হৃৎপিণ্ডে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না, আল্লাহ জানেন।

হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যাধিতে কি তিনি এই কারাগারেই মরে পড়ে থাকবেন?

মরতে তিনি ভয় পান না। আল্লাহ যেদিন মরণ লিখে রেখেছেন, তার আগে তো আর মৃত্যু আসবে না। কিন্তু তাঁর ভয় হলো, তাঁর কাজগুলো তাঁকে শেষ করে যেতে হবে। কাজ শেষ না করে তিনি মরতে পারেন না।

পার্টির সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের স্ত্রী আফিয়া খাতুন তাঁকে কয়েকটা চিঠি লিখেছেন। তিনি উত্তর দেননি। শরীরটা ভালো নয়। তার ওপর এত টানাহেঁচড়া। একবার ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ, গোপালগঞ্জ থেকে ফরিদপুর করলে ছয় দিন শুধু যাতায়াতেই চলে যায়। যা-ই হোক, অনেক লেখালেখি করে অবশেষে তাঁকে ফরিদপুর থেকে ঢাকা কারাগারে আনা হয়েছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। তাঁর চোখের ব্যারাম বেড়েছে। সারাক্ষণ চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

তিনি শামসুল হককে চিঠি লিখতে বসেন :

এস এম রহমান

সিকিউরিটি প্রিজনার

সেন্ট্রাল জেল

ঢাকা।

১২/৯/৫১

হক সাহেব,

আমার আদাব নেবেন। ভাবির চিঠি মাঝে মাঝে ফরিদপুরে পাইতাম। সকল সময় উত্তর দিতে পারা যায় না, তাহা আপনি বুঝতে পারেন। গোপালগঞ্জের মামলা আজও শেষ হয় নাই। তবে চিকিৎসার জন্য ঢাকা

এনেছে। রোগমুক্ত হলেই আবার যেতে হবে। যাহা হউক, ভাবিকে বলেন শীঘ্রই চিঠির উত্তর দিব, তাহাকে ভাবতে নিষেধ করবেন। ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমি জানি, আমি মরতে পারি না, বহু কাজ আমার করতে হইবে। খোদা যাহাকে না মারে মানুষ তাহাকে মারতে পারে না।

নানা কারণে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, আমার কোনো কিছুর দরকার নাই। যদি দুই-একখানা ভালো ইতিহাস বই অথবা গল্পের বই পাঠাতে পারেন সুখী হব।

বহুদিন মওলানা সাহেবের কোনো সংবাদ পাই নাই, এখন কেমন আছেন এবং কোথায় আছেন জানালে সুখী হব। আপনার শরীর কীরূপ, বন্ধুবান্ধবদের আমার সালাম দিবেন, কোনোরকম ভয়ের কারণ নাই, তাদের জানাবেন। আমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করব বলে আশা রাখি, বাকি খোদা ভরসা। কলেজটা চলছে জেনে সুখী হলাম। মানিক ভাই ও ইয়ার মোহাম্মদের ওপর কলেজের ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আপনি অন্য কাজ করবেন, তাহা হইলে ভালো হবে।

ভাবিকে চিঠি দিতে বলবেন।

ইতি

আপনার মুজিবুর

এনবি: গোপালগঞ্জ মামলার তারিখ ১৯ অক্টোবর। শরীর ভালো হলে পাঠাবে আর ভালো না হলে পাঠাবে না। তবে ঐ তারিখেই সমস্ত সাক্ষী আসবে বলে মনে হয়। কারণ, তিন মাস পরে তারিখ পড়েছে। কোর্ট সকল কিছুর বন্দোবস্ত না করে আর তারিখ ফেলে নাই। চিঠিটা মানিক ভাইকে দিবেন।

এই চিঠিটা লিখে মুজিব আরেকটা চিঠি লিখতে বসেন তফাজ্জল হোসেন মানিককে।

ঢাকা জেল
ঢাকা।
১২-৯-৫১

মানিক ভাই,

আমার সালাম নিবেন। আমার মনে হয়, আপনারা সকলে আমার জন্য

একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চিন্তার কোনো কারণ নাই। আমি জেল হাসপাতালে ভর্তি আছি।

চিকিৎসার চেষ্টা খুবই হইতেছে। হাসপাতালে কিছুদিন থাকতে হবে বলে মনে হয়। কারণ, শরীরের অবস্থা এখনো উন্নতির দিকে যায় নাই।

আতাউর রহমান সাহেব দেখা করতে এসেছিলেন। ফেডারেল কোর্ট করা যায় কি না আর করিবে কি না? জনাব সুরাওয়ার্দি সাহেব তো পিন্ডি মামলা নিয়া ব্যস্ত। কে মামলা পরিচালনা করিবেন। আপনি সুরাওয়ার্দি সাহেবের কাছে চিঠি লেখে জানুন, তিনি করতে পারবেন কি না আর তা না হলে অন্য কাহাকে দিয়া মামলা পরিচালনা করার কোনো অর্থ হবে বলে আমার মনে হয় না। আপনারা বাহিরে আছেন, ছালাম সাহেব, আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যান্য সকলের সাথে পরামর্শ করে যাহা ভালো বোঝেন, তাহাই করিবেন। আমার কিছু বলার নাই।

শুনে সুখী হবেন, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, কত দিন বাবার পয়সার সর্বনাশ করা যায়। আর শরীরের অবস্থাও ভালো না। কারণ, হঠাৎ ঢাকা জেলে আসার পর থুতুর সাথে পরপর তিন দিন রক্ত পড়ে, তবে সে রক্ত সর্দি শুকাইয়াও হতে পারে, আবার হাঁচি খুব বেশি হয় বলে অনেক সময় গলা দিয়ে রক্ত পড়তে পারে আর কাশের সাথেও হতে পারে। তাই নিজের থেকেই হুঁশিয়ার হওয়া ভালো। কতকাল থাকতে হয় ঠিক তো নাই। এক্স-রে করার কথা বলেছি। তবে সরকারের কাছে সকল সময়ই খুব সময় লাগে। কবে এক্স-রে করে বলা যায় না। তবে যাহাতে তাড়াতাড়ি হয়, তাহার চেষ্টা করিব।

ঢাকা জেলের সুপার সাহেব খুব ভালো ডাক্তার, তাই শীঘ্রই ভালো হয়ে যাব বলে আশা করি। চিন্তার কোনো কারণ নাই। জেলখানায়ও যদি মরতে হয় তবে মিথ্যার কাছে কোনো দিন মাথা নত করব না। আমি একলা জেলে থাকতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। কাজ করে যান, খোদা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। আমার জন্য কিছুই পাঠাবেন না। আমার কোনো কিছুরই দরকার নাই। নূতন চীনের কিছু বই যদি পাওয়া যায়, তবে আমাকে পাঠাবেন। চক্ষু পরীক্ষার পর আপনাকে খবর দিব, কারণ চশমা কিনতে হইবে। নিজেই দরখাস্ত করে আপনার সাথে দেখা করতে চেষ্টা করব।

আপনার ছোট ভাই মুজিব

দুটো চিঠি ভাঁজ করে একই খামে পুরে শামসুল হকের নামে ৯৪ নবাবপুর রোডের আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য জমা দেন মুজিব।

সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ দুটো চিঠিই আটকে রাখে। শেখ মুজিব তা জানতেও পারেন না।

৫৫.

গোপালগঞ্জের সাইদুর রহমান ওরফে চাঁদ মিয়া, বয়স ৩২, কুষ্টিয়া থানার কৃষি অফিসার, পড়ে আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের পোস্ট অপারেটিভ রুমে। অচেতন। তাঁর হাতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছিল কুষ্টিয়াতে, বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জার্মান চিকিৎসক অধ্যাপক নোবাকের চিকিৎসাধীন। তিনি কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন, জানেন না। আস্তে আস্তে তাঁর জ্ঞান ফিরতে থাকে। তিনি নানা কিছু স্বপ্নদৃশ্যের মতো দেখতে থাকেন। গোপালগঞ্জের মধুমতী নদী, লঞ্চঘাট, কাদাভরা পথঘাট তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। তারপর তিনি দেখেন, তিনি আকাশে মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন আর একজন আলোয় তৈরি মানুষ তাঁর হাত ধরে তাঁকে মেঘের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে জ্ঞান পুরোপুরি ফিরে এলে তিনি বোঝেন যে তিনি হাসপাতালে, আর তাঁর হাত কে একজন ধরে আছে।

দৃষ্টি পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কে, কে আমার হাত ধরে আছে?'

'মজিবর।'

'শেখ মজিবর?'

'হ্যাঁ, আমি শেখ মজিবর।'

আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটা সাইদুর রহমান ওরফে চাঁদ মিয়ার ধাতস্থ হয়। তিনি কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছেন হাতের হাড়

ভাণ্ডার চিকিৎসা নিতে। তাঁর অপারেশন হয়ে গেছে, আর শেখ মুজিবকে আনা হয়েছে পুলিশ প্রহরাধীনে, তিনি কারাগার থেকে এখানে এসেছেন চোখের চিকিৎসা করাতে। পুলিশ সারাক্ষণ তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখে।

শেখ মুজিব শুনতে পেলেন, গোপালগঞ্জের চানমিয়া, যিনি কিনা কলকাতায় ভেটেরিনারি কলেজে পড়ার সময় তাঁর মিছিলে এসে যোগ দিতেন, পাশের ওয়ার্ডেই আছেন আর তাঁর অপারেশন হয়ে গেছে, তিনি তাঁর পাশে এসে বসেছেন।

'মুজিব ভাই, আপনি ভালো আছেন?'

'কথা বোলো না। চুপচাপ থাকো। আমি ভালো আছি।'

পুলিশ আসে। মুজিবকে বলে, 'স্যার, আপনি আপনার ওয়ার্ডে যান। এখানে কতক্ষণ থাকবেন!'

মুজিব বলেন, 'চানমিয়া, আমি ওয়ার্ডে যাচ্ছি। তোমার কোনো অসুবিধা হলে বলবা, আমাকে খবর দিবা। শেখ মুজিবকে খবর দাও বললেই সবাই খবর দিবে।'

কথা সত্য। শেখ মুজিবকে সবাই চেনে। তাঁর পেছনে গোয়েন্দারা সর্বদা লেগে রয়েছে, তাদের আহার-নিদ্রা হারাম হয়ে গেছে। নভেম্বর ১৯৫১ সালে করাচি আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগঠক আকতার আহাদ মুজিবকে জেলখানার ঠিকানায় এক চিঠি লেখেন। সেটা গোয়েন্দারা আটক করেছে। তার মধ্যে যা আছে, তা বোমার চেয়েও ভয়ংকর। আকতার আহাদ লিখেছেন, 'জালিম সরকারকে উচ্ছেদ করতে বড়জোর আর দেড় বছর লাগবে। করাচির এক সভায় সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, তাঁর যদি শেখ মুজিবের মতো পাঁচটা মুজিব থাকত, তাহলে সারা দেশ তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। এই রকম একটা বন্দীকে যেমন ছেড়ে দেওয়া যায় না, তেমনি তিনি যখন মেডিকেল কলেজে থাকেন, তখন সবাই জানে যে, কে এই বন্দী-রোগী।'

সোহরাওয়ার্দী ঢাকা আসেন ফেডারেল মামলা পরিচালনার কাজে। তিনি ছুটে যান ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তাঁর প্রিয়তম কর্মীটির সঙ্গে দেখা করতে। ডিসেম্বরের সেই বিকেলটা ছিল শীতে কাতর। সোহরাওয়ার্দী সঙ্গীসাথিসমেত চলে আসেন মুজিবের শয্যাপাশে। মুজিবের স্বাস্থ্য অনেকটাই খারাপ হয়ে গেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি কথা দেন, মুজিবের জন্যে তিনি হেবিয়াস করপাস মামলা লড়বেন।

প্রতিদিনই পরিদর্শক আসে এই বন্দীর কাছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে

পুলিশ আর কতজনকে আটকাবে। এই এমএলএ আনোয়ারা বেগম আসছেন, তো ফের আসছেন মানিক মিয়া।

গোয়েন্দারা এই সব সাক্ষাৎকারের ওপরে প্রতিবেদন জমা দেয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ তৎপর হয়ে ওঠে। কর্তারা সভা করেন। বিশেষ নোটিশ জারি করেন। হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার। শেখ মুজিবের সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারবে না প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া। কেউ তাকে কোনো চিঠি বা জিনিস দিতে পারবে না। এর সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জড়িত। হুঁ হুঁ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছে বসে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি কথা বলে :

শোনো শোনো ব্যাঙ্গমা গো, শোনো দিয়া মন...

মন তো দেওয়াই আছে, দিব কি জীবন?

রসিকতা নয় ওগো কথা হলো ভারি,
মুজিবর মেডিকেলে প্রসঙ্গটা তারি।
যদিও শীতের দিন, গোয়েন্দারা ঘামে,
চারদিক উন্মাতাল শেখ মুজিবের নামে।

শোনো শোনো ব্যাঙ্গমি গো, বাতাসের বেগ।
মুজিবের স্বাস্থ্যে নিয়া চারদিকে উদ্বেগ ॥
মুক্তি চেয়ে সভা হয়, আসে বিবৃতি।
মুক্তির দাবিতে যেন সোচ্চার প্রকৃতি ॥

'প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন।
শেখ মুজিবরে তিনি না দেন জামিন ॥
গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
নরসিংদী ইস্টিশনে জনতা ঘিরিয়া
ধরল তাকে আচানক, তিনি তো ঘেরাও,
বলেন, তোমরা বলো, কী চাও কী চাও।
হাতে ধরে লোকে বলে, শোনেন হুজুর,
শেখ মুজিবরের কষ্ট করতে হবে দূর।

দয়া করে মুক্তি দিন শেখ মুজিবরে,
না হলে জ্বলবে অগ্নি প্রতি ঘরে ঘরে।'

ব্যাঙ্গমা বলে,
শেখ মুজিবরের বয়স একত্রিশ মাত্র,
জনতার কাছে তিনি অতি প্রিয়পাত্র।

ব্যাঙ্গমি বলে,
আরও তো সময় আছে, আছে ভবিষ্যৎ,
যেতে হবে বহু দূর সামনে কত পথ।
কতবার তার মুক্তি চাইবে বাঙালি,
তার নামে কতজন রক্ত দেবে ঢালি।
সেসব ভবিষ্যতে তিনি আপাতত
বন্দী রোগী হয়েও পান মনোযোগ যত্ন।

৫৬.

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান। তিনি সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ভারতের লেলিয়ে দেওয়া কুকুর।' আর প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ পূর্ববঙ্গের নেতাদের 'শির কুচল' বা মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন।

কথাটা বারবার মনে হচ্ছে তরুণ সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীনের।

সেদিন সন্ধ্যা। শরতের শেষ, হেমন্তের শুরু। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। *আজাদ* অফিসে ঢোকার মুখেই আবু জাফর শামসুদ্দীনকে পিয়ন ফরিদ আলী বলল, 'স্যার, শুনছেন, লিয়াকত আলী শির কুচল হইয়া গেছে গা।'

'মানে কী!'

আবু জাফর শামসুদ্দীন *আজাদ* অফিসে ঢোকার পর কিছুটা জানতে

পারেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এই সময় এক লোক তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। মিলিটারি হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান। উন্মত্ত জনতা সৈয়দ আকবর নামের ওই ঘাতককে পিটিয়ে পায়ে পিষে সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলে।

কার শির কে কুচল করে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন ভাবেন।

তাঁর ভাবনা দুর্ভাবনায় পরিণত হয়, যখন তিনি শুনতে পান, খাজা নাজিম উদ্দিন এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

জিন্নাহর মৃত্যুর পর খাজা পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন।

তার আগে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী।

সেই সময় আবু জাফর শামসুদ্দীনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল খাজা নাজিম উদ্দিনকে কাছে থেকে দেখার।

আবু জাফর শামসুদ্দীন কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছেন। পাকিস্তান নামটার মধ্যেই পাক কথাটা আছে। কাজেই এই দেশ থাকবে পাক-পবিত্র, তিনি ভেবেছিলেন।

পবিত্রতা আর পরিচ্ছন্নতার মহড়া তিনি দেখতে পান সেক্রেটারিয়েটে।

কী সেটা?

মধ্য বয়সী সরকারি কর্মচারীরা মূত্রত্যাগের পর শুধু পানি ব্যবহার করে খুশি নন। তারা শৌচাগারে মূত্রত্যাগের পর অফিসের মধ্যেই লুঙ্গি বা পায়জামার নিচে হাত ঢুকিয়ে পুরুষাঙ্গে মাটির ঢেলা ধরে চল্লিশ কদম হাঁটেন। টয়লেটে মাটির ঢেলা স্তূপ করে রাখা।

নিজের শরীরকে পাক-পবিত্র রাখার কাজে যারা এত ব্যস্ত, তাদের মধ্যে একজন অফিসার যদি নাপাক কাজ করে, তা কি সহ্য করা যায়?

অফিসার লোকটা দুর্নীতিবাজ। পাকিস্তানের পবিত্রতা নষ্ট করতে তিনি একাই যথেষ্ট। তিনি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হিন্দুদের ফেলে রেখে যাওয়া বাড়িঘর বরাদ্দ করার জন্য খোলা হয়েছে অফিস। এই রকম একটা কঠিন দায়িত্ব যার ওপরে, সেই অফিসার কিনা মদ্যপ ও জুয়াড়ি। রোজ দিনের বেলা ঢাকা ক্লাবে মদ্যপান করে আর রাতের বেলা আরমানিটোলা জমিদার বাড়িতে গিয়ে জুয়া খেলে।

আজাদ-এর বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বেরও ঢাকায়। আবু

জাফর তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কী করা যায়? 'চলুন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করি। তাকে বলি...'

তাঁরা দুজন চললেন বর্ধমান হাউজে, মুখ্যমন্ত্রী খাজার কাছে।

'স্যার, আপনার অফিসার লোকটা দুর্নীতিবাজ। শুধু ঢেলা-কুলুপ নিলে তো পাকিস্তান পবিত্র হবে না। সরকারি অফিসে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।'

'অফিসার দুর্নীতিবাজ? প্রমাণ কী?' খাজা বললেন।

'তিনি কত টাকা বেতন পান? পাঁচ শ টাকা। কিন্তু রোজ মদের পেছনে খরচ করেন অন্তত পঞ্চাশ টাকা আর জুয়া খেলে উড়িয়ে দেন শত টাকা। পাঁচ শ টাকা বেতনের একজন লোক এত টাকা ওড়াচ্ছে। পাচ্ছে কোথায়?'

খাজা বললেন, 'ইয়েস, আই নো হি গোস ফর হাইস্টেক, বাট...'

বাট বলার পর তিনি থেমে গেলেন। আর কিছু বললেন না। আর কোনো ব্যবস্থাও নিলেন না।

আরেক দিনের ঘটনা। দৈনিক *আজাদ*-এর জন্য পছন্দমতো জমি পাওয়া যাচ্ছে না। দৈনিক *আজাদ* মুসলিম লীগেরই মুখপত্র। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। বর্ধমান হাউজেই অনুষ্ঠিত হলো সেই সাক্ষাৎকার।

'আপনি দৈনিক *আজাদ*-এর জন্য একটা ভালো জমি বরাদ্দ করতে বলে দিন।'

খাজা বলেন, 'হাম সিধেসাধে আদমি হো, সিধেসাধে বাতাইন সমঝাতে, ইয়ে বহুত কঠিত মামলা হায়, আপলোগ হামিদুল হক সাহেবকা পাছ যাইয়ে।'

বলেন কী তিনি। এইটা একটা কঠিন মামলা।

এটাই ছিল খাজা নাজিম উদ্দিনের শাসনপদ্ধতি। তিনি সব কাগজ জমা করে রাখতেন অফিসের টেবিলে। কোনোটাতেই স্বাক্ষর করতেন না। সমস্যা যদি বড় হয়, সমাধানও আপন আপনিই হয়ে যাবে, এই ছিল তার দর্শন।

সেই খাজা নাজিম উদ্দিন এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

তিনি আসছেন ঢাকায়।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম সফর।

ঢাকায় এসে পল্টনে জনসভা করলেন তিনি। সেখানে তিনি বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পরীক্ষামূলকভাবে একুশটি

কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। জনগণ নিজ উদ্যোগে আরও কেন্দ্র খুলছে।'

আবু জাফর শামসুদ্দীন সেই জনসভায় উপস্থিত। এ কথা শোনার পর তাঁর মনে হলো, যে লোক সাধেসিধে বাত ছাড়া বোঝে না, সে কী করে একটা কঠিন বিষয় নিয়ে কথা বলে ফেলল। এর পরিণতি মোটেও ভালো হবে না।

৫৭.

শীতের দিন। তবে ঠান্ডা কম। বাতাসে জলীয়বাষ্প আছে মনে হচ্ছে।

ব্যাঙ্গমা বলে,

ব্যাঙ্গমি, বল তো দেখি, ঠান্ডা কেন কম?
শীতকালে শীত নাই, কেন এ রকম?

ব্যাঙ্গমি জবাব দেয়,

নাজিম উদ্দিন খাজা বুদ্ধি কম তার,
শীতের বিকেলে দিল উষ্ণ উপহার,
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা বলেছেন যেই,
গরম হয়েছে মাঠ, শীত বিকেলেই।
চারদিক তপ্ত আজি, মিছিলে সকলে,
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বলে দলে দলে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং আজিকে,
ক্ষোভ বার্তা রটে যায় মুহূর্তে চৌদিকে।

তারা তাকিয়ে দেখে, মাঠে ছাত্ররা জড়ো হয়েছে। তাদের মুখে স্লোগান, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না। ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলবে না।

ব্যাঙ্গমা বলে, 'এই যে শুরু হইল, নতুন ইতিহাস লেখার যাত্রা।'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'আরও কত কী ঘটব, এই আমতলাতেই।'

ব্যাঙ্গমা বলে, 'আমতলা থেকে বটতলা, বটতলা থেকে সারা পূর্ব বাংলায় কত কিছুই না ঘটব, আরও কত কিছুই না আমগো দেখতে হইব।'

৫৮.

এম আর আখতার মুকুলের প্যান্ট ছিঁড়ে যায়।

মুকুল এক হাতে প্যান্ট ধরে আছেন।

আর হাত তার উত্তোলিত আমগাছের ডগার দিকে। ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি সেই দৃশ্য দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

মুকুল দাঁড়িয়ে আছেন টেবিলের ওপরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এই টেবিলটা এনেছেন গাজীউল হক, মুকুল প্রমুখ।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে খাজা নাজিম উদ্দিন বলে গেছেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' তার পর থেকে ছাত্ররা ফুঁসছে। ঘরে ঘরে পোস্টার লেখা হচ্ছে, কার্টুন আঁকা হচ্ছে, সবটাতেই প্রকাশিত এক দাবি : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ৩০ জানুয়ারিতেও ঢাকার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা হয়েছে, মিছিল হয়েছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সেই মিছিলে অংশ নিয়েছে। সেদিনের সভাতেই ঘোষিত হয়েছে, আজ ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রধর্মঘট আর সমাবেশ। ঢাকার প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যুবলীগের কর্মীরা যোগাযোগ করে সবাইকে প্রস্তুত করে রেখেছে। আনিসুজ্জামান গেছেন পোগোজ স্কুল ও সেন্ট যোসেফ স্কুলে ধর্মঘট করাতে। এইভাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেছেন বিভিন্নজন।

৩০ জানুয়ারি সভা শেষে মিছিল করার কথা যখন উঠেছিল, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ তাতে বাধা দিয়েছিল। যদিও সভাপতিত্ব করেছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি খালেক নেওয়াজ নিজেই। খালেক নেওয়াজ ৩০ তারিখে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে যে সর্বদলীয়

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতেও আছেন। আওয়ামী মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরিতে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। সেই সভাতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ ধর্মঘট, সভা ও বিক্ষোভ মিছিল হবে। বিক্ষোভ মিছিল যাবে জগন্নাথ হলে, যেখানে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন বসবে।

কিন্তু আজ যেন খালেক নেওয়াজ সভাপতিত্ব করতে না পারেন, তারই ফন্দি এঁটে এসেছেন যুবলীগের কর্মীরা। এম আর আখতার মুকুলের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি সভার সভাপতি হিসেবে নাম প্রস্তাব করবেন গাজীউল হকের। তাঁকে সমর্থন করবেন কমরুদ্দীন শহুদ।

টেবিল আনা হয়েছে, খালেক নেওয়াজ অপেক্ষা করছেন চেয়ার কখন আসে। তাহলে তিনি সেই চেয়ারে বসে পড়ে সভাপতিত্ব করতে পারবেন। সামনে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অপেক্ষা করছে।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার ছোট্ট শরীরটি নিয়ে এম আর আখতার মুকুল উঠে গেলেন টেবিলের ওপরে। ঘোষণা করলেন, 'ভাইসব, রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে আয়োজিত এই সভার সভাপতিত্ব করবেন গাজীউল হক।'

অমনি মুসলিম ছাত্রলীগের এক কর্মী মুকুলের প্যান্ট ধরে মারলেন টান। মুকুলের প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল পট করে। প্যান্টটাও নিচে নেমে গেল খানিক। কিন্তু সেই প্যান্ট এক হাতে টেনে ধরে আরেক হাত উর্ধ্বমুখে তুলে ধরে মুকুল তাঁর ঘোষণা সমাপ্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছয় ফুট উঁচু কমরুদ্দীন শহুদ পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে বললেন, 'আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।'

গাজীউল হকও আর চেয়ারের জন্য অপেক্ষা করলেন না। উঠে পড়লেন টেবিলের ওপরে। দুই মিনিটের বক্তৃতা শেষে ঘোষণা করলেন কর্মসূচি, এবার আমরা মিছিল নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করব।

মিছিল শুরু হলো। ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলায় ধর্মঘট। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছিল শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করছে। বিশাল মিছিল।

মুকুল সেই মিছিল ধরে হাঁটছেন। আজ নিজেকে তাঁর মনে হচ্ছে বিশাল। সমুদ্রের জলে যখন নদী মেশে, নদীর তখন যেমন লাগে। মুকুলের মনে হচ্ছে, তিনি ছিলেন পুকুর, হয়ে পড়েছেন সমুদ্র।

তাঁর কোমরের বোতামের সমাধান বের করা গেছে। কোমরের একটা বেল্ট তাঁকে খুলে দিয়েছেন তাঁদের এক মিছিলবন্ধু। সেইটা তিনি কোমরে বেঁধেছেন কষে। প্যান্ট আর নিচে নামার চেষ্টা করছে না।

'রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা...'

মুকুল জোরে আওয়াজ ধরেন, 'বাংলা চাই বাংলা চাই'। নুরুল আমিনের বাসভবন বর্ধমান হাউজের সামনে দিয়ে যাচ্ছে মিছিল। পাশেই রেসকোর্স ময়দান। পথে অনেক গাছ। গাছের ডালে পাখিদের সমাবেশ। মুকুলের মনে হয়, তাঁদের চিৎকারের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে গাছের ডালে বসা সব পাখপাখালিও।

৫৯.

ব্যাঙ্গমা বলে,

শোনো শোনো ব্যাঙ্গমি গো, শোনো হে খবর,
ফরিদপুরের জেলে শেখ মুজিবর।

ব্যাঙ্গমি বলে,

বাতাস বইছে দেখো শনশনশন,
মুজিবর রহমান করে অনশন।

'হ, আমি জানি। শেখ মুজিবুর রহমানরে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থাইকা ফরিদপুর কারাগারে পাঠানো হইছে।'

'কেন পাঠানো হইছে?' ব্যাঙ্গমা লেজ তুলে শুধায়।

'কারণ তিনি হুমকি দিছেন, তাঁরে সমেত বিনা বিচারে আটক সব রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া না হইলে তিনি অনশন ধর্মঘট করবেন। তাঁর সাথে আছেন আরেক নিরাপত্তা বন্দী মহিউদ্দিন আহমদ। তাঁরা বলছেন, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁদের মুক্তি দিতে হবে। তা না হইলে ১৬ ফেব্রুয়ারি তাগো ধর্মঘট শুরু হইব। মুজিব মুক্তি চান, কারণ তিনি জানেন, ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। ওই দিন

অ্যাসেম্বলি বসবে। সেটা ঘেরাও করা দরকার। আওয়ামী লীগের এখন মুজিবরে দরকার।'

'অলি আহাদ আর যুবলীগের নেতারা আর ছাত্রনেতারা মুজিবরের লগে দেখা করতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে গেছিল। শেখ মুজিব অলি আহাদকে জানায়া দিছেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি অনশন ধর্মঘটে যাইতেছেন।'

'হেই কথা শুইনা সরকারের লোকজনের মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইছে। এমনিতেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা ফুটতাছে, এর মধ্যে যদি শেখ মুজিব অনশনে যায় আর হাসপাতালের বেডে এত দিন ধইরা শুইয়া থাকা লোকটার একটা কিছু যদি ঘইটা যায়, পরিস্থিতি আর নিয়ন্ত্রণ করা যাইব না, এই হলো তাগো ভাবনা।'

'পরিস্থিতি তো এমনিতেই সামলাইতে পারব না, অমনিতেই পারব না। খালি মুজিবররে জার্নির কষ্টটা দিব।'

'দিব না? সারা বাংলায় শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে কী রকম আওয়াজ উঠছে। পেপারে প্রতিদিন কত কিছু ছাপা হইতেছে, মানুষ শেখ মুজিবের মুক্তি চায়। এইখানে-ওইখানে মিছিল আর জনসভা হইতাছে না?'

'১৪ ফেব্রুয়ারিতে অর্ডার হইছে, অইলই শেখ মুজিবর আর মহিউদ্দিন আহমদরে ফরিদপুর জেলে পাঠাও। একজন হেড কনস্টেবল আর দুজন কনস্টেবল তাগো য্যান গোয়ালন্দ হইয়া ফরিদপুর লইয়া যায়।'

'তার পরের দিন সকালে সাড়ে দশটাতেই মুজিব আর মহিউদ্দিনকে জেল থাইকা বাইর করা হইল। ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে নিয়া গিয়া তোলা হইল নারায়ণগঞ্জের রেলগাড়িতে।'

'নারায়ণগঞ্জ স্টেশন আর স্টিমারঘাটেও দেখছ কেমুন ভিড় জইমা গেল শেখ মুজিবরে দেখার লাইগা। নারায়ণগঞ্জের নেতারা তার লগে দেখা করেন। যুবলীগ নেতা শামসুজ্জোহা ও শফি হোসেনরে মজিবর কইয়া দিলেন, "আমারে বদলি কইরা অরা আমার ধর্মঘট থামাইতে পারব না। আমি অনশন করুমই"।'

'হ। অনশন তো সে করতাছেই। দুদিন পর তাঁরা ফরিদপুর কারাগারে পৌঁছাইলেন। তার পরের দিন থাইকাই তাঁরা জেলখানায় অনশন ধর্মঘট শুরু কইরা দিলেন।'

'ওই দেখো, আমগো গাছতলাতে সভা হইতাছে। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।'

'হ। অরা রাজবন্দীগো মুক্তির লাইগা কমিটি পর্যন্ত বানায়া ফেলল।'
'বাতাসে আওয়াজ ওঠে, ফট ফট ফট,
মুজিবুরে করে অনশন ধর্মঘট।'

৬০.

ফাল্গুনের বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর রেস্তোরাঁর দিকে যাচ্ছেন গাজীউল হক। কোকিল ডাকছে, মৃদুমন্দ দখিনা হাওয়া বইছে। রিকশার ক্রিং ক্রিং আওয়াজ আসে মাঝেমধ্যে। দূরে ঘোড়ার গাড়ি চলছে। ঘোড়ার খুরের ঠকঠক আওয়াজ ওঠে। মাঝেমধ্যে শোনা যায় ঘোড়ার ডাক। তিনি মধুর রেস্তোরাঁয় চেয়ার টেনে বসেন। রেস্তোরাঁ মানে পুরোটাই বারান্দা। সামনে টেবিলে। আরও আরও ছাত্র সেখানে উপস্থিত। সবার মধ্যে উত্তেজনা। এরা সবাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্য কাজ করছেন। এখন তৈরি হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা। লম্বা রুল টানা কাগজে একটার পর একটা নাম লেখা হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবক হতে উৎসাহী ছেলেমেয়ের অভাব নেই। কাল সাধারণ ধর্মঘটও ডাকা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পিকেটিং করতে হবে। তা ছাড়া সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মিছিল নিয়ে আসতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। মেয়েদের কলেজ, স্কুল থেকেও আসবে মিছিল। মেয়েরাও খুবই সক্রিয় এই আন্দোলনে। আজ ৫০০ পোস্টার লিখে নিয়ে এসেছেন নাদিরা আর সাফিয়া। সাফিয়ার হাতে স্বেচ্ছাসেবক মেয়েদের তালিকা। 'বাংলাবাজার গার্লস স্কুলে কে যাচ্ছে যেন', সাফিয়ার কণ্ঠস্বর উঁচু হলো। সুফিয়া দুটো মেয়েকে ডেকে কাছে আনল সাফিয়ার। ও দিকে ব্যস্ত সারা, মাহফিল আরা, খোরশেদী। তাদের হাতে হাতে পোস্টার।

এর মধ্যে ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়েছে পতাকা দিবস। কাপড়ের পতাকায় কাগজের স্লোগান—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, এটা ফেরি করে করে বিক্রি করা। উদ্দেশ্য যত না তহবিল সংগ্রহ, তার চেয়ে বেশি জনমত তৈরি।

যুবলীগের পক্ষে আনিসুজ্জামান লিখেছেন *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কি ও কেন?* নামের পুস্তিকা। সেটা বেনামে প্রকাশিত হয়ে বিলিবণ্টন হচ্ছে এখানে-ওখানে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদও একটা পুস্তিকা বের করে, বদরুদ্দীন উমর সেটা মুসাবিদা করে দিয়েছেন। যুবলীগ অফিস হয়ে উঠেছে ভাষা আন্দোলনের একটা কেন্দ্র। সেখান থেকে সারা দেশে সব যুবলীগ শাখায় পাঠানো হচ্ছে কেন্দ্রের নির্দেশ। সব সময় অফিসটায় একটা সরগরম ভাব। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলও হয়ে উঠেছে ছাত্রকর্মীদের আরেক আখড়া। হোস্টেল মানে পাকা বাড়ি নয়, সারি সারি ব্যারাক। সর্বত্র সাজ সাজ রব। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস। ওই দিন একটা কিছু হবে।

একটা কোকিল ডাকছে কোথাও। চারদিকে গাছগাছালি। রমনা এলাকায় পাখপাখালির কোনো ইয়ত্তা নেই। এর মধ্যে কোকিল তো ডাকতেই পারে। কিন্তু হঠাৎই ছাত্রদের কথোপকথন, কোকিলের ডাক ছাপিয়ে আসে মাইক্রোফোনের আওয়াজ। মাইকে ঘোষিত হচ্ছে সরকারি ঘোষণা, 'আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি রমনা এবং ইহার আশে-পাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। একসঙ্গে চারজনের বেশি মানুষ একত্রিত হইতে পারবে না। অন্যথায় কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হইবে।'

কী করা যায়। গাজীউল হকের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে।

শুধু গাজীউল হকের নয়, ছাত্রদের সবাই ভীষণ উত্তেজিত। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, সমাবেশ মিছিল করা যাবে না। আমরা মানি না। মানব না। সবার চেয়ে বেশি উঁচু মেয়েদের কণ্ঠস্বর, 'আমরা ১৪৪ ধারা মানব না।'

গুজবে মধুর রেস্তোরাঁর বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। হাসপাতালে অনেকগুলো বেড খালি করা হয়েছে। আগামীকাল যে-ই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে, তাকেই হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। ট্যাংক-কামান নামানো হবে রাস্তায়, সৈন্য মোতায়েন করা হবে, এই সব কথা তো ছিলই।

হলে হলে ছাত্ররা মিলিত হয় সভায়। ওই সব ছাত্রসভার এক আওয়াজ, '১৪৪ ধারা মানা চলবে না।' সেই খবর এসে পৌঁছায় মধুর রেস্তোরাঁয়।

'কী হবে তাহলে?' গাজীউল হকের কাছে ছেলেমেয়েরা জানতে চায়।

গাজীউল হকের চোখেমুখে উদ্বেগ। বুকের মধ্যে দুন্দুভি। এর মধ্যে খবর আসে, সন্ধ্যায় নবাবপুর আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সভা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কী করা কর্তব্য—এই হলো

আলোচনার বিষয়।

গাজীউল বলেন, 'সন্ধ্যায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সভায় কী হয়, আমরা দেখি আগে।'

ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে ওঠে, '১৪৪ ধারা মানি না, মানব না'।

সন্ধ্যার নবাবপুর। রাস্তায় দু-চারটে রিকশা, কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি। আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে অনেকেই উপস্থিত। রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সদস্যরা তো আছেনই, এ কলেজ, ও কলেজের প্রতিনিধিরা অপেক্ষা করছেন উত্তেজনা নিয়ে। বাইরেও কর্মীরা উঁকিঝুঁকি মারছে। সভায় সভাপতিত্ব করছেন খেলাফতে রব্বানি পার্টির সভাপতি প্রবীণ আবুল হাশিম। মওলানা ভাসানী নেই, মফস্বলে গেছেন জনসভা করতে। আতাউর রহমান খান নেই, তিনি গেছেন ওকালতির কাজে, ময়মনসিংহে। অগত্যা আবুল হাশিমকে সভাপতিত্ব করতে হচ্ছে। উপস্থিত আছেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। আছেন যুবলীগ নেতা অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন।

জ্যেষ্ঠ সদস্যরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে। শামসুল হক বলেন, 'আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে চাই। আমাদের আশঙ্কা, অন্যথায় সরকার পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য কঠোর দমননীতির আশ্রয় নেবে। আর সামনের বছর নির্বাচন হওয়ার কথা। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায়, নির্বাচন হলেই তাদের ভরাডুবি হবে। এখন বড় গন্ডগোল হলে সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার অজুহাত পেয়ে যাবে।' অলি আহাদ, মেডিকেল কলেজের ভিপি গোলাম মওলা, আবদুল মতিন—এঁরা সবাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁদের মত হলো, 'যদি এবার প্রতিবাদ করতে না পারি, আর কোনো দিনও এই দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দাঁড়াবে না।'

শামসুল হকের যুক্তি খণ্ডন করে অলি আহাদ বলেন, '১৯৪৯ সালের নির্বাচনে তো শামসুল হক সাহেব বিজয়ী হয়েছিলেন, তার পরও তাঁকে আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমনকি টাঙ্গাইল নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো উপনির্বাচন দেয় নাই। আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য তারা ১৪৪ ধারা জারি করেছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই আমরা উপযুক্ত জবাব দেব। এখন যদি এই সরকারের

জুলুম ও দমন নিপীড়নকে রুখতে না পারি, ভবিষ্যতে সামান্য প্রতিবাদও আর করতে পারব না।'

তখন প্রস্তাবটা ভোটে দেওয়া হলো, ১৪৪ ধারার ভঙ্গ করা হবে কি হবে না, ভোট হোক।

কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মনে হলো, মওলানা ভাসানী অনুপস্থিত, শেখ মুজিবুর রহমান কারারুদ্ধ, শামসুল হক জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত, স্ত্রী তাঁকে অসহযোগিতা করছে, দুই দুটি কন্যাসন্তান তাঁকে পিছে টানছে, প্রথম কন্যা শাহিন তো আছেই, সদ্য জন্ম নিয়েছে আরেকজন, সাকু। এ অবস্থায় সংগ্রামী নেতৃত্ব তাঁর কাছ থেকে আশা করা বাতুলতা। আবুল হাশিম সাহেবের খেলাফতে রব্বানি পার্টি তখনো সংগঠিত হয়নি, তার ওপরে আছে তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, এবং বাস্তবে সবকিছু হারিয়ে সর্বহারা হয়ে যাওয়া অবস্থা। তাঁর পক্ষে বিপ্লবী সিদ্ধান্ত প্রদান অসম্ভব। ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো, ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব জয়লাভ করল।

অলি আহাদ বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাচ্ছি। আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্রসভা হবে, সেই সভা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে রায় দেয়, তবে আমরাও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে থাকব।'

আবদুল মতিন বললেন, 'একটা সিদ্ধান্ত না নিয়ে এই সভা সিদ্ধান্ত নিক যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে আর বিপক্ষে—দুটো মতই এসেছে। আগামীকালের ছাত্রসভায় দুটো মতই প্রকাশ করা হবে। এর পর ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেবে।'

তখন আবুল হাশিম বললেন, 'আগামীকাল শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে ছাত্র জনসভায় বক্তব্য পেশ করবেন। তার পরও যদি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙে, তাহলে এই কমিটি সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' সভার কার্যবিবরণীতে আবুল হাশিমের এই বক্তব্যও লিখে নেওয়া হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সেই খবর পৌঁছাল।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই উত্তেজিত। 'এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। আমরা অবশ্যই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করব।'

গাজীউল হক বললেন, 'আপনারা অধৈর্য হবেন না। একটা কিছু হবেই।'

গভীর রাত। ফজলুল হক হল আর ঢাকা হলের মধ্যবর্তী পুকুরের সিঁড়ি। ১১ জন ছাত্র সেখানে উপস্থিত। এরা কেউ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কমিটির সদস্য নন। কিন্তু আন্দোলন এখন আর কেবল কমিটির হাতে নেই। এ আগুন ছড়িয়ে গেছে বহুজনের মাঝে। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলী, মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান, এম এ মোমিন, এস এ বারী এ টি, এম আর আখতার মুকুল, কমরুদ্দীন শহুদ, আনোয়ারুল হক খান, আনোয়ার হোসেন ও গাজীউল হক সেখানে উপস্থিত। আবহাওয়া অতি চমৎকার। সন্ধ্যার পর দখিনা বাতাস বইছে। দূর থেকে হলের বিদ্যুৎ বাতি এসে পড়ছে পুকুরের পানিতে।

উপস্থিত সবার একটাই মত। রাত পোহালেই যে সকাল আসবে, যে দিন আসবে, একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমতলায় বৈঠক করে। শামসুল হক আসবেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে কথা বলতে। তাঁর বক্তব্যের পর আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বলবেন। কাজেই এই সভাতেও সভাপতিত্ব করতে হবে গাজীউল হককেই। তিনি যদি গ্রেপ্তার হয়ে যান তাহলে এম আর আখতার মুকুল, তিনিও আটক হলে কমরুদ্দীন শহুদকে সভাপতিত্ব করতে হবে। মতিনের বক্তব্যের পর সভাপতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখবেন এবং ঘোষণা করবেন যে, '১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত এই সভা গ্রহণ করল।'

তারপর মিছিল নিয়ে ছেলেমেয়েরা বেরোবে ক্যাম্পাস থেকে।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলী বললেন, 'আমি থাকব সবার সামনে। আমাকে গ্রেপ্তার করা হলে আমি গ্রেপ্তার বরণ করব।'

এম আর আখতার মুকুল বললেন, 'নেতাদের গ্রেপ্তার হওয়া চলবে না। গাজীউল হক, মতিন—এরা যেন গ্রেপ্তার না হয়।'

গাজীউল হক তাকালেন হাবিবুর রহমান শেলীর দিকে। ইতিহাসের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের একজন তিনি। লম্বা, একহারা, উজ্জ্বল চোখ, দিব্যকান্তি, উন্নত নাসা। তিনি যদি সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব দেন, তাহলে সেটা বাকিদের অনুপ্রাণিত করবে সহজেই।

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ দেখা যাচ্ছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রের মিটিমিটি আলো। দূরে ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলছে। হলগুলোর বারান্দায় বিদ্যুতের আলো। তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে পুকুরের জলে। একটা মাছ বোধ হয় ঢেউ তুলল জলের গায়ে।

ছাত্রদের রুমের বাতি বেশির ভাগই নিভে গেছে। একটা স্তব্ধতা যেন ঝড়ের পূর্বাভাস হয়ে নেমে আসছে ঢাকায়।

'আমরা সবাই কাল সকাল সকাল চলে আসব কলাভবনে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

সবাই চলে যায় পুকুরপাড়ের সিঁড়ি থেকে। শুধু থেকে যান গাজীউল হক আর মৃদুভাষী যুবক আবদুল মোমিন।

মোমিন বলেন, 'আগামীকাল সকালে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া চলবে না।'

গাজীউল তাকান মোমিনের মুখের দিকে। 'কেন?'

'আপনাকে আজ রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হবে। ভোরবেলা আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে গিয়ে গ্রেপ্তার হতে পারেন। কাজেই আজ শেষ রাতের মধ্যেই আপনাকে ঢুকে পড়তে হবে কলাভবন এলাকায়।'

আকাশে অনেক তারা। আকাশ অনন্ত। আকাশে কিছু মেঘ। পুকুরপাড়ে নারকেলগাছ। সিঁড়িটা শীতল। জল স্থির। গাজীউল হক পুকুরের সিঁড়িতে শরীর এলিয়ে দেন। আকাশের দিকে তাকান। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি একটা ক্ষুদ্র সত্তা। তার পাশে আরেকজন সামান্য মানুষ। আগামীকাল তাঁদের সামনে একটা অনিশ্চিত যাত্রা। কী হতে যাচ্ছে কাল, তাঁরা কেউ জানেন না। কিন্তু তাঁরা জানেন, পেছনে ফেরার পথ নাই। লড়াই তাঁদের করে যেতেই হবে।

তিনি বললেন, 'মোমিন, তোমার কথা আমি মানলাম। আমি আজ রাতে আর হলে ফিরে যাচ্ছি না। আমি কলাভবনের বারান্দাতেই রাত কাটাব।'

মোমিন বিদায় নিলেন। গাজীউল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলেন। মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়—এ দুটোর মধ্যখানে একটা ছোট্ট প্রাচীর। মধুর ক্যানটিনঘেঁষা সেই পাঁচিল টপকালেন দীর্ঘদেহী গাজীউল হক। নামলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায়। কৃষ্ণপক্ষের একটা ক্ষীণতনু চাঁদ তখন তাঁর সঙ্গে লাফাতে থাকে।

তিনি বারান্দায় দুটো পোস্টার বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ছে বন্ধুদের মুখ। মনে পড়ছে প্রতিজ্ঞাদীপ্ত ছাত্রীদের '১৪৪ ধারা মানি না' স্লোগান। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান যদি গ্রেপ্তার হন, তাঁর ভবিষ্যৎ

কী হবে? এতগুলো মেয়ে জড়িত আন্দোলনের সঙ্গে, মেয়েরা আসবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে, তাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন। কিন্তু তারও চেয়ে বড় প্রশ্ন বাংলা ভাষার সম্মান।

ভোর হচ্ছে। গাজীউল হক উঠে বসলেন। বারান্দায় হাঁটতে লাগলেন। মধুর রেস্তোরাঁর দিকে গেলেন। গেটের কাছে বড়সড় আমগাছ। মধুর রেস্তোরাঁ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। আমগাছের পূর্ব দিকে বেলতলায় ছোট্ট পুকুর। দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার দালান, আর্টস বিল্ডিং। পাঁচিল পেরোলেই মেডিকেল কলেজ। কলেজ হোস্টেল হলো বাঁশের তৈরি ব্যারাক। সবচেয়ে দক্ষিণে রেললাইন।

ভোরবেলা শীতও পড়েছে বেজায়।

ওই যে, গেট ঠেলে কে যেন আসছে। মোহাম্মদ সুলতান। তাঁর সঙ্গে এলেন এস এ বারী এ টি এবং আরও দুজন।

এত ভোরে ওঁরা কী করবেন?

তাঁরা ছোট ছোট কাগজের টুকরায় চিঠি লিখতে লাগলেন। চিরকুটের মতো একেকটা বার্তা। মোহাম্মদ সুলতান পোগোজ স্কুলের ছেলেদের উদ্দেশে লিখলেন, 'ছোট ভাইয়েরা, সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমরা দুজন দুজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এসো।'

ততক্ষণে একজন দুজন করে ছাত্ররা আসতে শুরু করেছে। অনেকেই এসেছে সাইকেল নিয়ে। তাদের হাতে হাতে চিরকুটগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কলেজে, স্কুলে। নওগাঁর ছেলে মেডিকেল ছাত্র মঞ্জুর এসেছেন। তিনি গেলেন মেডিকেল কলেজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে। একটা ছোট্ট মেয়ে এসেছে সাইকেল চালিয়ে। 'কী নাম তোমার?'

'আমার নাম জাহানারা লাইজু।'

তুমি কেন এসেছ?

'ওমা। আবার কেন? রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই না'?

'তুমি একটা কাজ করতে পারবে? এই চিরকুটটা নিয়ে পৌঁছে দিতে পারবে মেয়েদের কলেজে?'

'পারব।'

লাইজু সাইকেল চালিয়ে বলাকার মতো যেন উড়ে চলে গেল।

আটটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে ফেলল পুলিশ। তাদের পরনে হাফ প্যান্ট। হাতে বড় বড় লাঠি। অনেকের হাতেই বন্দুক।

পুলিশের ভ্যান রাখা সারি সারি।

বসন্তের সকালে চারদিক আলোকোজ্জ্বল। অনেক ছেলেমেয়ে এরই মধ্যে এসে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। তাদের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে ক্যাম্পাসের সবুজ উঠোনে।

কালো শেরওয়ানি গায়ে মাথায় জিন্নাহ টুপি চাপিয়ে এলেন শামসুল হক।

তিনি গিয়ে বসলেন মধুর রেস্তোরাঁয়।

উপস্থিত ছাত্রদের তিনি বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, '১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই আমাদের কাম্য।'

ছাত্ররা উত্তেজিত। তারা তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। তিনি যথাসাধ্য ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

হঠাৎ একজন ছাত্র চিৎকার করে উঠলেন, 'ট্রেইটর'।

তিনি শামসুল হককে লক্ষ্য করে এই বিদ্রূপবাণ ছুড়ে মারলেন।

উত্তেজিত এই ছাত্রটির নাম হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁকে থামানো যাচ্ছে না। তিনি শামসুল হকের দিকে ধেয়ে এলেন। তাঁর মাথার জিন্নাহ টুপি ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেললেন দূরে, শূন্যে। চিৎকার করে তিনি বলতে লাগলেন, 'ইউ হ্যাভ নো রাইট টু স্পিক, গেট আউট।'

পুরো পরিবেশ উত্তেজনাপূর্ণ। হইচই, চিৎকার-চেঁচামেচিতে কে শোনে কার কথা। আমানুল্লাহ খান নামের একজন দীর্ঘদেহী ছাত্র বেঞ্চির ওপরে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন, 'ভাইসব, আমরা ১৪৪ ধারা মানি না, মানব না...'

অলি আহাদ এলেন। গাজীউল হককে ডেকে নিলেন আলাদা করে। বললেন, 'আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না, আর আমি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সদস্য, আমি কোনো ফরমাল ভাষণ দেব না। তবে ১৪৪ ধারা ভাঙতেই হবে।'

গাজীউল হক বললেন, 'আমরা কাল রাতে ফজলুল হক হলের পুকুরের পূর্ব ধারের সিঁড়িতে বসেছিলাম কয়েকজন। আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙব, এই সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছি।'

একটা ছোট্ট চেয়ার নিয়ে রাখা হলো আমতলায়।

তখন বেলা ১১টা সাড়ে ১১টা। রোদে ঝকঝক করছে চারপাশ। হাজার

হাজার ছাত্রছাত্রী সমবেত হয়েছে আমতলায়, এরই মধ্যে।

এম আর আখতার মুকুল আগের মতোই সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করলেন গাজীউল হকের নাম। তাঁকে সমর্থন করলেন কমরুদ্দীন শহুদ।

সভাপতির চেয়ারে বসলেন গাজীউল। তিনি বললেন, প্রথমেই বক্তব্য রাখবেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের পক্ষ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক।

কিছু ছাত্র 'না না' বলে চিৎকার করে উঠল।

শামসুল হক অসাধারণ বাগ্মী। তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। খাজা নাজিম উদ্দিন আর নুরুল আমিন সরকারের সমালোচনা করলেন তীব্র ভাষায়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে কথা বললেন। কিন্তু দাবি আদায়ের পন্থা হিসেবে তিনি যুক্তি দেখালেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে। একজন-দুজন ছাত্র তাঁর কথা সমর্থন করতে চাইলেও সমবেত প্রায় সবাই তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল।

এবার বক্তব্য দিতে দাঁড়ালেন বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির পক্ষে আবদুল মতিন। তিনি কথা বলতে লাগলেন ধীরে ধীরে, যুক্তি দিয়ে। বললেন, 'আজ ১৪৪ ধারা যদি আমরা ভঙ্গ না করি, ভবিষ্যতে কোনো আন্দোলনই আমরা আর করতে পারব না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আন্দোলন বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এখন পিছিয়ে আসার আর কোনো উপায় নেই। আমরা কি ১৪৪ ধারার ভয়ে পিছিয়ে যাব?'

জবাবে সকলে চিৎকার করে উঠল, 'না না।'

তখন একটা আপস ফর্মুলা এল। দশজন দশজন করে গেট থেকে বেরিয়ে পথে যাবে, তারপর যা হয় হবে। গাজীউল হক সভাপতির ভাষণ দিলেন। 'নুরুল আমিন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করেছে। ১৪৪ ধারা ভাঙা হলে নাকি গুলি করা হবে। আমরা নুরুল আমিন সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। আমরা দেখতে চাই নুরুল আমিন সরকারের বারুদাগারে কত বুলেট জমা আছে।'

এই সময় আবদুস সামাদ চিৎকার করে বললেন, 'আমরা যে ১৪৪ ধারা ভাঙব, কয়জন করে বাইরে যাব? আমার প্রস্তাব হলো, আমরা দশ জনের একটা করে দল করে গেটের বাইরে যাব।'

'কে কে বাইরে যেতে চান, নাম লেখান। মোহাম্মদ সুলতান নাম লিখে নেবেন।'

হইচই পড়ে গেল। সবাই নাম লেখাতে চায়। সুলতান গেট বন্ধ করে

সবার নাম ঠিকানা লিখে নিচ্ছেন, যাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সহজেই তাদের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়।

এদিকে মুহর্মুহু স্লোগান উঠছে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, চলো চলো, অ্যাসেম্বলি চলো। পুলিশি জুলুম চলবে না'।

গেট খুলে ছেলের দল বেরিয়ে পড়তে লাগল। হাবিবুর রহমান শেলী, আনোয়ারুল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আজমল হোসেন...কে যে কার আগে বেরোবে, তারই প্রতিযোগিতা।

বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে ট্রাকে তুলে নিতে লাগল।

তারপর পিলপিল করে আরও দশজন বেরিয়ে যেতেই শুরু হলো কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ আর লাঠিচার্জ।

এবার তাহলে মেয়েদের দল যাক।

সাফিয়া, সুফিয়া, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন নাহার, হালিমা খাতুন এগিয়ে এলেন। এগিয়ে গেল স্কুলের বালিকা সেতারা, পারুল, নুরী। গেটের পাশে বালতিতে করে পানি রাখা হয়েছে। সবাই রুমাল ভিজিয়ে নিল। সুরইয়া, শরিফা, সারাহ, জাহানারা লাইজু, জুলেখা, সুফিয়া, খালেদা ফেরদৌস, চেমন আরা সবাই মিছিলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেকের চোখে-মুখে প্রত্যয়ের ছাপ।

মেয়েদের দল এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে কিছু ছেলেও যোগ দিল। তাদের এগিয়ে চলা একটা মিছিলের আকার নিয়েছে। পুলিশ লাঠিচার্জ করল। সুফিয়ার পেছনে একটা অল্প বয়সী ছেলে পুলিশের লাঠির আঘাতে শুয়ে পড়ল। আহত হলেন রওশন। তবু তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন।

কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হলো।

চারদিকে কাঁদানে গ্যাস, গুড়ুম গুড়ুম শব্দ, লাঠিচার্জ, আর্তনাদ। স্লোগান, হইহই রব। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও।

ছাত্ররাও যা হাতের কাছে পাচ্ছে, তা-ই নিয়ে পুলিশের দিকে ছুড়ে মারতে শুরু করল। কাঁদানে গ্যাসে পুরো এলাকা ছেয়ে গেছে। কেউ চোখ খুলতে পারছে না। কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে পড়ল সুফিয়ার সামনে। তিনি চোখে আর কিছুই দেখতে পারছেন না।

ছাত্ররা সবাই পুকুরের পানিতে রুমাল ভিজিয়ে চোখ মুছছে।

হাসান হাফিজুর রহমান ও আজহারকে পাঠানো হলো, ছাত্ররা যাতে

পুলিশের দিকে ঢিল ছুড়ে না মারে, সেই চেষ্টা করতে।

তিনি সেই উদ্দেশ্যে ছাত্রদের কাছে গেলেন এবং ইটের টুকরো নিয়ে নিজেই ঢিল ছুড়তে লাগলেন।

শামসুল হক উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে এলেন গাজীউল হকের কাছে। বললেন, 'যখনই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তখনই আমি সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। আমি অবশ্যই এই সংগ্রামের সঙ্গে আছি।'

কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে লাগল গাজীউল হকের বুকে। তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। এম আর মুকুল তাঁকে ধরে দোতলায় নিয়ে গেলেন।

ছাত্ররা তখন মেডিকেল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী পাঁচিল ভেঙে ফেলেছে। তারা মেডিকেলের দিকে এগোচ্ছে। কারণ, তারা অ্যাসেম্বলি ভবনের কাছাকাছি হতে চায়।

মেডিকেল কলেজের গেট দিয়ে ছাত্ররা বেরোনোর চেষ্টা করছে।

তখনই লেগে গেল সশস্ত্র পুলিশ ও নিরস্ত্র ছাত্রদের যুদ্ধ। ছাত্রদের অস্ত্র মেডিকেলের সামনে রাখা ইটের স্তূপ।

খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে।

গুলি হলো বেলা তিনটার দিকে।

৬১.

ছাপাখানার গন্ধটা প্রথম প্রথম সহ্য হতো না রফিক উদ্দিন আহমেদ রফিকের। এই কালিঝুলি আর সিসার অক্ষর আর কেরোসিন আর স্পিরিটের গন্ধ। ঘরটাও গুমোট। ওদিকে গোলানো আটা আর তুঁতের দ্রবণটা মিলিয়ে যে আঠা, তারও একটা গন্ধ আছে। মানিকগঞ্জের সিংগাইরের মুক্ত প্রান্তরের বাতাস থেকে এই বদ্ধ ঘরে এসে তার মনটা টিকবে কেন। এই মাথার ওপরে ঝুলমাখা বাল্বের নিচে বসে ঘাড় গুঁজে সামনে প্রুফ দেখতে গিয়ে পায়ের নিচে গন্ধমূষিকের হঠাৎ দৌড়টা টের পেয়ে আরেকটা নতুন গন্ধ রফিকের নাকে এসে লাগে। বয়রা স্কুলের

মাঠভরা ছিল চোরকাঁটা, ছোটবেলায় সে যখন দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে বাড়ি ফিরত, তখন শোঁ শোঁ বাতাস এসে তার কানে লাগত। তারপর মোল্লাবাড়ির পেছনের জঙ্গলটা পেরোতে গেলে আতাফুল থেকে ভেসে আসত পাকা সবরি কলার গন্ধ। এখন এই গন্ধমূষিকের সঞ্চলন থেকে সে কথাটা তার মনে পড়ে অকারণে।

বাবা তাকে এই ঢাকা শহরে এনে ছাপাখানার কাজে লাগিয়ে দিল, এটা সে মানতেই পারছিল না। সত্য বটে, দেবেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষক প্রাণনাথ বাবু বাবাকে বলেছিলেন, রফিক তো কলেজ ফাঁকি দেয়। কিন্তু কলেজ ফাঁকি দিয়ে সে কী করে? নাটক করে। মানুদা নতুন নাটক লিখেছেন একটা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়ে, এতে রফিকের ক্ষুদিরামের পার্ট করার কথা। তো, সেই কারণেই শেষের দিকে রফিক একটু বেশি সময়ই দিচ্ছিল তাদের উন্মেষ নাট্যদলের জন্য। আগের নাটকে *গলি থেকে রাজপথ*-এ সে একটা সাইড ক্যারাক্টার করেছিল, কিন্তু অট্টহাস্য থেকে কান্নায় ভেঙে পড়ার সিনটায় সে এত ভালো করল যে সমস্ত ক্লাপস তার বরাতেই জুটেছিল। ভাগ্যিস, হ্যাজাক বাতির তীব্র আলোর টানে ছুটে আসা পোকাগুলোর একটা ওই সময়েই তার চোখে বাড়ি মেরেছিল। ফলে চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়াতে লাগল। সেদিনই নাটক শেষে মানুদা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, ক্ষুদিরামকে নিয়ে লিখছি রফিক, এবার তুমিই হবে ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরামের চেহারার সঙ্গেও তোমার মিল আছে।

ব্যস্। রফিক হাওয়ায় ভাসতে শুরু করল। এরপর সে ক্ষুদিরাম! একেবারে সেন্ট্রাল ক্যারাক্টার। *গলি থেকে রাজপথ* নাটকটাই তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। কারণ, পানুও ওই নাটক দেখতে গিয়েছিল বয়রা স্কুল মাঠে। রাহেলা খানম পানুর পরনে ছিল আকাশি শাড়ি, বিকেলের হলুদ আলোয় সেটা দেখাচ্ছিল সবুজ আর হ্যাজাক বাতির আলোয় সেটা অদ্ভুত একটা মেটে রং পেয়েছিল। নাটক শেষে যখন উইংসের পেছনে পর্দাঘেরা শামিয়ানা টাঙানো গ্রিনরুমে রফিক মেকআপ তুলছিল, মানুদার চোখেমুখে তখনো ভালো লাগার ঘোর, আর রফিকও বেশ ফুরফুরে মুডে গুনগুন করে গান গাইছে, মেকআপ তুলেই আবার লাগতে হবে মঞ্চ ভাঙতে, স্কুলের বেঞ্চগুলো যথাস্থানে রাখতে হবে, মঞ্চের টেবিলগুলোর বাঁধন খুলতে হবে, কলের গানঅলা তার সরঞ্জাম গোছাচ্ছে, এখনি তার পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে, এই সময় পানুর ছোট বোন শানু এসে হাজির, 'ভাইজান, বুবু আপনেরে ডাকে।'

পানু ডাকে? রফিকের বুকটা একটা কাকিলা মাছের মতো লাফ দিয়ে ওঠে। সেটা গোপন করে রফিক মেকআপ ঘষতে ঘষতে বলে, 'পানু এখনো যায় নাই। রাইত বেড়ে যাচ্ছে, তোরা যাস নাই কেন?'

'বুবু আপনেরে ডাকে।'

অগত্যা রফিককে পর্দার ঘের থেকে বাইরে আসতে হয়। হ্যাজাক লাইটগুলো এখন স্টেজ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখা হয়েছে, একটা লাল পর্দার ওপার থেকে আলো এসে পড়েছে পানুর মুখে, তাকে দেখাচ্ছে একটা টসটসে আমবেগুনের মতো। রফিক বলে, 'কী, যাও নাই কেন বাড়ি?'

পানু কিছু বলে না, তার নাকের দু'পাশটা বিস্ফারিত হতে থাকে, চোখ দিয়ে পানি গড়ায়, লালচে আলোয় সেই পানির ফোঁটা দুটোকে স্বর্ণবিন্দুর মতো লাগে।

'কী হলো, তোমার চোখে কেন জল?' নাটকের মুখস্থ সংলাপ ঝেড়ে দেয় রফিক।

'তোমার দুঃখ দেইখা দুঃখ পাইছি। তুমি এই পার্ট কেন করছ?'

'হা হা হা।' রফিক হাসে। 'এইটা তো সত্য না। নাটকের মধ্যে। নাটকের মধ্যে কারও পার্ট দেইখা যদি দর্শক কান্দে, তাইলে সে হইল সেরা অভিনেতা। আমার অভিনয় তার মানে ভালো হইছে।' রফিক প্রাণ খুলে হাসে। আহ্। আজ তার কী আনন্দের দিন। ওই দিকে মানবেন্দ্র ওরফে মানুদা তারিফ করছেন, আর এদিকে পানু...আজ তার জীবন ধন্য।

কম্পোজিটর কম্পোজ করছে বর্ণমালাগুলো। একটার পর একটা অক্ষর সাজাচ্ছে। এরপর প্রুফ তুলবে। রফিক প্রুফ দেখবে। কম্পোজও সে পারে কিছু কিছু। 'ম'-এর পরে আকার দিলে 'মা' হয়, কী রকম জাদু না এই হরফগুলোতে।

হরফের এই জাদুটাই ইদানীং তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলছে। নইলে মানিকগঞ্জ ছেড়ে সে ঢাকা শহরে এসে প্রেসের কাজে লাগে! তার থিয়েটার আর তার পানুকে ফেলে রেখে আসে সে?

রাহেলা খানম পানু তাদের দুই ঘর দূরের প্রতিবেশী। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে পানু। তারপর পড়া বন্ধ। ওই দিন, *গলি থেকে রাজপথ* নাটকের মঞ্চায়ন শেষে তারা বাড়ি ফিরেছিল একসাথে, রাতের পথে ছিল জ্যোৎস্না আর কুয়াশা আর শিশির। দূরে ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসছিল শিয়াল আর কুকুরের পালা দেওয়া ডাক। রফিক বলেছিল, 'পানুরে, এর পরের

নাটকে তো আমি ক্ষুদিরাম হব। আমার তো ফাঁসি হইয়া যাবে। এখন এই সামান্য পাগল হইয়া যাওয়ার সিন সহ্য করতে পারতেছ না, ক্ষুদিরাম সাইজা যখন ফাঁসিতে ঝুলব, গান গাব, "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি", তখন সহ্য করবা কেমনে?'

'তোমার ক্ষুদিরাম করনের দরকার নাই, রফিক ভাই', পানু রফিকের হাত ধরে বলেছিল। আর কী আশ্চর্য, ওই সামান্য একটা হাতের মুঠোয় রফিকের সমস্তটা অস্তিত্ব যেন বন্দী হয়ে গেল মুহূর্তে। তারপর রফিকের দিবস-রজনীজুড়ে শুধু ওই এক বালিকার মুখ। কেন এই রকম হয়।

কিন্তু তাই বলে *ক্ষুদিরাম* নাটকের রিহার্সাল তো আর বাদ দেওয়া যায় না। কলেজ ফাঁকি দেওয়া শুরু করল সে। ওদিকে পানুর বাবা-মাও পানুর জন্য পাত্র খুঁজছেন। রফিক আর পানুর মেলামেশাটা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হলে ওরা বলল, 'তাইলে আর বাইরে বাইরে পাত্র খুঁজব ক্যান। পাত্র যখন ঘরের কাছেই আছে।'

ওরা যখন মেলামেশা করছেই, সেইটাকে একটা স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই ওদের পানচিনিও হয়ে গেছে। এই তো ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখে ওদের বিয়ে। আর যেহেতু সামনে বিয়ে, নতুন দায়িত্ব, নতুন জীবনের ভার, রফিক তাদের এই বর্ণমালা প্রিন্টিং প্রেসের কাজটায় ইদানীং মনও লাগিয়েছে বেশ।

কিন্তু এর মধ্যে রফিকের মাথায় নতুন চিন্তা জট পাকাতে শুরু করেছে। যে ছাপাখানার গন্ধ তার অসহ্য বোধ হতো, সেটাই তাকে মেশকে আম্বরের মতো টানছে।

ঘটনা ঘটল এইভাবে। বর্ণমালা প্রিন্টিং প্রেসের বৃদ্ধ কম্পোজিটর, চোখে বেশি পাওয়ারের গোল চশমা, কী একটা লিফলেট কম্পোজ করছেন, হঠাৎই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, 'এই বুড়া বয়সে বুঝি বেকার হইয়া যাইতে অইব। চাকরি বুঝি আর থাকে না!'

রফিক টেবিলে বসে আজ প্রেসের জন্য কী কী কিনতে হবে, কালি আর কাগজ ইত্যাদি, সেসবের ফর্দ বানাচ্ছিল। ফরিদ চাচার কথা শুনে সে মাথা না তুলে বলে, 'কী কন, চাচা?'

'হ। বুঝতাছ না চারদিকের বাতাস? লিফলেটে কী লেখছে। উর্দু নাকি এই দেশের ভাষা হইব। সরকারি কাম সব উর্দুতে হইব। তাইলে আমার এই বাংলা হরফ কী হইব। আমি তো এই বাংলা কম্পোজ ছাড়া আর কিছু জানি না। এখন এই বয়সে কি উর্দু কম্পোজ শেখনের টাইম আছে। তোমাগো

প্রেস তো আর বন্ধ হইব না, ভাস্তা, তোমরা উর্দু টাইপ কিনা আনবা, উর্দু কম্পোজিটর আইব, আমি তো এই বয়সে তোমার চাচি আর অপগণ্ড পোলাপান ছয়টা লইয়া রাস্তায় ভিক্ষা করতে থালা হাতে বইয়া পড়ুম।'

ওই লিফলেটটার প্রুফ কাটতে গিয়ে রফিকের মনে হলো, প্রুফের সঙ্গে কম্পোজিটর ফরিদ চাচার চোখের পানি লেগে গেছে। নইলে কাগজটার দুই জায়গায় ভেজা কেন। রফিক লিফলেটটা পড়ে, 'কী কয়? রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা কেন মেনে নেবে? তাই তো ছাত্ররা ডাক দিয়েছে প্রতিবাদ সমাবেশ আর মিছিলের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে এই প্রতিবাদসভা।'

ছাপাখানার কাঠের খোপগুলো ভরা বিভিন্ন হরফ। একেকটা খোপে একেক বর্ণ। আবার বিভিন্ন পয়েন্টের অক্ষরের জন্য একেকটা সারি। রফিক এই টাইপগুলোর দিকে তাকায়। হাতে তুলে নেয় সিসার অক্ষরগুলো। সব উল্টা। এগুলো ছাপ দিলে সোজা হবে। এই অক্ষরগুলো সব ফেলে দিতে হবে। এর বদলে কিনে এনে রাখতে হবে উর্দু অক্ষর!

রফিক বাংলা অক্ষরগুলোর প্রেমে পড়ে যায়। এই প্রিন্টিং প্রেসের কালিঝুলি, কেরোসিন, তারপিন, স্পিরিট, সিসা, লোহার পাত, তুঁতের গন্ধ তাকে আবিষ্ট করে তোলে।

মধ্যখানে সিংগাইর বাড়ি থেকে ঘুরে আসে রফিক। পানুর সঙ্গে দেখা করা দরকার ছিল। সামনে বিয়ে। বিয়েতে কী কী খরচ করতে হবে, পানুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করার জন্যই মূলত যাওয়া। পানু তো কিছুতেই মুখ খুলবে না। বলে, 'তুমি কী দিবা, দেও। আমি কেন বলব।' শেষে পানুর ভাবি মুখ খুলল, 'আলতা, সাবান, চুড়ি, শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, স্নো, পাউডার আর সোনার জিনিস যা দিবা...'

আজ রফিক বেরোচ্ছে সেই কেনাকাটা করার জন্য। তার মামাতো ভাই মোশাররফকে সে ডেকে এনেছে বাড়ি থেকে। হবিবর তার ভ্রাতুষ্পুত্র বটে, কিন্তু তারা সমবয়সী, আর কেনাকাটার ব্যাপারে তার সুনামও আছে। দরাদরির ব্যাপারে মোশাররফের প্রতিভা জাদুকরি, সে দুই আনার জিনিস কিনে দুই পয়সা দিয়ে চলে আসে। দোকানদার হাসিমুখে বলে, 'আবার আইসেন।'

ফাল্গুন মাস। রোদটা চড়া। তবু শীতটা আছে বলে রোদটা মিষ্টিই লাগছে। দোকানে আজ ভিড় কম।

রফিকের গায়ে হালকা নীল রঙের শার্ট, পরনে সাদা প্যান্ট, পায়ে নেভি নীল মোজা এবং ঝকঝকে ইংলিশ জুতা।

সদরঘাট, নবাবপুর মার্কেট চষে মোশাররফ আর রফিক মিলে আলতা, সাবান, চুড়ি ইত্যাদি সস্তার জিনিসগুলো কিনে ফেলে ভেবেছিল শাঁখারিপট্টিতে ঢুকবে স্বর্ণালংকারের জন্য, কিন্তু এরই মধ্যে রিকশাঅলার মুখে শুনল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর মেডিকেল কলেজের মোড়ে লড়াই বেধে গেছে। ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে, মিছিল হবে না আজ আর—রফিক সেটাই জানত। তা না হলে সে কি আর মিছিলে যেত না। কিন্তু ছেলেরা যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে শুরু করেছে, আর লড়াইটাও যে জমে গেছে, সেটা শোনামাত্র রফিক বলল, 'মোশাররফ, চল, মিছিলে যাইতে হইব। বুঝস না...'

মোশাররফ ঠিক বুঝল কি বুঝল না, সেই জানে, কিন্তু সে-ও হাঁটা শুরু করে রফিকের পিছু পিছু।

দূর থেকে শোনা যাচ্ছে স্লোগান, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই...' রফিকের মাথার মধ্যে স্বরে অ স্বরে আ ক খ বর্ণগুলো লাফাতে শুরু করে। সে বলে, 'মোশাররফ, জোরে হাঁট।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মিছিলটা ধরে ফেলে আর মিছিলের সঙ্গে মিশে যায়।

একবার তার পানুর কথা মনে পড়ে। যদি কোনো কারণে পানু শোনে যে রফিক মিছিলে গিয়েছিল, পানু কি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে। একদিন রিহার্সাল দেখাতে পানুকে নিয়ে গিয়েছিল রফিক। বয়রা স্কুলের ক্লাস ফাইভের ঘরে রিহার্সাল হচ্ছিল। রফিক যখন গানটা ধরল, একবার বিদায় দে মা ফিরে আসি...

তখন পুরোটা ঘর, এমনকি জানালায় রিহার্সালদর্শী জনতাও নীরব হয়ে গিয়েছিল। এর ভেতরেই বাষ্পের উদ্‌গিরণের আওয়াজ। কেউ ফোঁপাচ্ছে। সে দিকে না তাকিয়েও রফিক বুঝতে পারছিল, এটা পানুই। রফিকের কোনো দুঃখ-কষ্ট, হোক না তা নাটকের কাল্পনিক জীবনে, পানু একদমই সহ্য করতে পারে না।

আহা। আর মাত্র তিন দিন। তিন দিন পরই রফিকের ঘরে আসবে পানু। তার পর থেকে তাদের যৌথ জীবন। ছাপাখানাটা তাদের নিজস্ব। তবু বিয়ের কার্ডটার ইম্প্রেশন কালকে পর্যন্ত হয়নি। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আমন্ত্রণপত্র বের করে ফেলতে হবে। রাতেই বিয়ের কার্ড আর খরচাপাতি নিয়ে তারা রওনা দেবে মানিকগঞ্জের পথে। কাল-পরশু কার্ডগুলো বিলিবন্টন করতে হবে।

'রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই, বাংলা চাই'—স্লোগানে কণ্ঠ মেলাতে

মেলাতে রফিক এই সব ভাবে। সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। রফিকের চোয়াল শক্ত হচ্ছে, গলার রগ ফুলে উঠছে, কণ্ঠস্বর আসমান বিদীর্ণ করতে চাইছে, হাতের মুঠো সূর্যকে ধরবে বলে লম্বা হচ্ছে...

তখনই গুলির শব্দ। রেইনট্রি গাছগুলো থেকে গগনচিলগুলো উড়ে ওঠে, কাকের দল চিৎকার করতে থাকে।

গুলি রফিকের কপালে লাগে। সিসা তার করোটি ভেদ করে মগজে প্রবেশ করলে সে পায় সিসার হরফের গন্ধ। ছাপাখানার গন্ধ।

হাত থেকে বাজারের থলে পড়ে যায়। ভেঙে যায় আলতার শিশি।

রফিকের শরীর ঢলে পড়ে। তার মাথা থেকে রক্ত আর মগজের ধারা আলতার ধারার সঙ্গে মিশে পথের ধুলোয় প্রবাহিত হয়। আর করোটির ফোকর দিয়ে বর্ণমালা প্রিন্টিং প্রেসের ১২ ফন্ট, ১৪ ফন্ট, ১৮ ফন্টের বাংলা বর্ণমালাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। রফিক খোলা চোখে সেই বর্ণমালাগুলো দেখতে পায়। বর্ণমালা ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল রোদে যেন সোনা হয়ে উঠছে। আর কী যে ভালো লাগছে সেই সিসার গন্ধটুকুন।

রাহেলা খানম পানুর হাতে পানচিনির আংটিটা, কুয়োর পাড়ে ওজু করতে করতে পানু সেটা একবার খুলে কনিষ্ঠায় পরে, তারপর হাত ধোওয়া হয়ে গেলে আবার পরে নেয় অনামিকায়। এ সময় তাদের বাঁশঝাড়ে একটা কাক কা কা কা করে ডেকে উঠলে পানুর বুকটা কেন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। সে জানে না কেন, রিহার্সালের দিনে 'একবার বিদায় দে মা' বলে রফিক যখন টান ধরেছিল, রফিকের সেই মুখখানা পানুর হঠাৎ মনে পড়ে।

একটা ঢিল ছুড়ে মেরে পানু কাকটাকে তাড়াতে চায়।

৬২.

আবুল বরকত সকাল থেকেই ব্যস্ত ছিলেন মধুর রেস্তোরাঁয়। তাঁর হাতে ছিল পোস্টার। লম্বা মানুষটা হাতে পোস্টার নিয়ে ছোটাছুটি করছিলেন মধুর রেস্তোরাঁয়। মোহাম্মদ সুলতান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পোস্টার

নিয়ে ঘুরছ কেন বরকত?'

বরকত বললেন, 'আরে, আমার হাত লম্বা দেখে ওরা সবাই আমাকে পোস্টার লাগানোর দায়িত্ব দিয়েছে। দেখুন না, আমি কী রকম উঁচুতে পোস্টারগুলো লাগাচ্ছি। অল্প কটা বাকি আছে, লাগিয়ে দেই।'

আবুল বরকত ছিলেন অস্বাভাবিক লম্বা। মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে তাঁদের পরিবারটির নামই ছিল 'টল ফ্যামিলি'। তাঁর বাবা শামসুজ্জোহাও ভীষণ লম্বা। এত লম্বা যে বহু দরজায় ঢোকার সময় তাঁর মাথা চৌকাঠে আটকে যায়। তিনি মাথা নিচু করে দরজা পার হন। সেই টল ফ্যামিলির ছেলে আবুল বরকত বছর চারেক আগে চলে এসেছেন পূর্ব বাংলায়। পুরানা পল্টন লাইনে তাঁর মামা আবদুল মালিক থাকেন। বরকত থাকেন সেই মামার বাসা 'বিষ্ণুপ্রিয়া'য়। তিনি ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। পরীক্ষার ফলও তাঁর ভালো হচ্ছে। গত বছর অনার্স পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েন, আর আবুল বরকত ভাবেন, কাকে বলে রাষ্ট্র আর কাকে বলে দেশ। একটাই দেশ ছিল, মুর্শিদাবাদ, আর ঢাকা, সিরাজউদ্দৌলার মুর্শিদাবাদ আর শায়েস্তা খাঁর ঢাকা। ১৯৪৭-এ মাউন্টব্যাটেন কলম দিয়ে দাগ টানলেন, আর দেশটা দুই ভাগ হয়ে গেল। তাঁর মা থেকে গেলেন মুর্শিদাবাদে, আর তিনি এলেন ঢাকায়। কোনটা তাঁর দেশ, কোনটা তাঁর মাতৃভূমি?

কিন্তু মাতৃভাষা কী, তা নিয়ে আবুল বরকতের কোনো দ্বিধা ছিল না। বাংলা ভাষার মর্যাদা তাঁর কাছে মায়ের মর্যাদারই সমান। তাঁর হাতের একটা পোস্টারে লেখা: 'নাজিম, চুক্তি পালন কর, নইলে গদি ছাড়। রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম আমাদের জীবন-সংগ্রাম'।

সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা। এ যেন আবুল বরকতেরই মনের কথা। রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম আর তাঁর জীবন-সংগ্রাম এখন একবিন্দুতে এসে মিলেছে।

চুক্তিটা হলো সেই '৪৮ সালের চুক্তি। যেই চুক্তি প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, কামরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামেরা করেছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে, ৮ দফা চুক্তি, যার একটা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন। যেই চুক্তি জেলখানায় শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ প্রমুখ অনুমোদন করেছিলেন।

নীল রঙের হাফ শার্ট, খাকি প্যান্ট, পায়ে কাবুলি স্যান্ডেল—সদা বিনয়ী এই ছেলেটার কর্মতৎপরতার দিকে আরেকবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকান মোহাম্মদ সুলতান।

শামসুল হক রেস্তোরাঁর চেয়ারে বসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে কথা বলছিলেন। তখন হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে আবুল বরকতও উত্তেজিত হয়েছিলেন।

হাসান হাফিজুর রহমান কবিতা লেখেন। আবুল বরকতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ রকমের বন্ধুত্বও আছে।

তারপর আবুল বরকত হাজারো ছেলের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে যান।

না, আবুল বরকত হারান না। তিনি আমতলার সভায় যান। 'আমরা কি ১৪৪ ধারার ভয়ে হার মানব?' বক্তার এই প্রশ্নের জবাবে 'না, না' বলতে বলতে তিনি দু হাত তোলেন। তাঁর লম্বা শরীরের লম্বা হাত আমগাছের পাতা স্পর্শ করে।

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি সেই দৃশ্য দেখে হেসেই কুটিকুটি।

তাদের মনে হয়, আবুল বরকতের এই প্রতিবাদী হাতের মুঠো আমগাছ ফুঁড়ে ওই আকাশটাকেই যেন স্পর্শ করবে।

কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ শুরু হলে আরও অনেকের মতো আবুল বরকতও মধুর রেস্তোরাঁর পার্শ্ববর্তী দেয়াল টপকে মেডিকেল ক্যাম্পাসে ঢোকেন। সেখানে শুরু হয় ইটের যুদ্ধ।

ছাপরার তৈরি ব্যারাকের মতো ঘরে মেডিকেল ছাত্রদের হোস্টেল। আবুল বরকত গিয়ে সেইখানে অবস্থান নেন। অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাঁরা ইট নিয়ে পুলিশের দিকে ছুড়তে ছুড়তে এগোন। আবার পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পুরো এলাকাটাকে ধোঁয়ায় ছেয়ে ফেলতে ধরলে তিনিও পিছিয়ে ব্যারাকের দিকে আসেন। চোখের জ্বলুনি থেকে বাঁচার কৌশল ছাত্ররা আবিষ্কার করেছে। বালতি, ডেকচি, হাঁড়ি-কলসি—যা পাওয়া গেছে, তাতেই পানি ভরে রাখা হয়েছে। ছেলেরা বারবার করে চোখ ধুয়ে নিচ্ছে। কেউ বা গায়ের কাপড় খুলে পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে চোখ মুছছে। এখানে মেডিকেলের ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, আর্টসের ছাত্র, সায়েন্সের ছাত্র—সবাই এসে মিলেছে। এটাই এখন প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় মঞ্চ। বাবুর্চিরা ইটের পালা থেকে ইট তুলে এনে ভেঙে ভেঙে ঢিল বানিয়ে স্তূপ করে রাখছে। সেখান থেকে ঢিল তুলে নিয়ে ছেলেরা ছুড়ে মারছে পুলিশের দিকে। আরও সাহসী

ছেলেরা টিয়ার গ্যাসের শেল এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে পাল্টা ছুড়ে মারছে পুলিশের দিকেই। এবার পুলিশও কাঁদানে গ্যাসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে।

লড়াইয়ের একপর্যায়ে আবুল বরকত আর তাঁর কজন বন্ধু একটু পিছিয়ে ২০ নম্বর ব্যারাকের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান নেন। একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে আবার লড়াইয়ে নামতে হবে।

আবুল বরকতের লম্বা হাতে ঢিল ছোড়ার কাজটা হয় খুব ভালো। বিশ্রামের সময় তো এখন নয়।

মোহন মিয়া সেখানে এলেন। আবুল বরকতকে ডাকলেন, 'আবাই। কী অবস্থা?'

বরকত বললেন, 'চলুন আবার যাই।'

ওরা কেবল উঠেছেন, এমন সময় গুলির শব্দ। পড়ে গেলেন আবুল বরকত।

শফিকুর রহমান থাকেন ১৭ নম্বরে, এক বালতি পানি এনে ওর মাথায় চোখেমুখে ঢেলে দিলেন। তিনি ভাবছেন, টিয়ার গ্যাসের প্রতিক্রিয়া।

ততক্ষণে রক্ত এসে মিশেছে পানির প্রবাহের সঙ্গে।

মোহন মিয়া বললেন, 'গুলি লেগেছে। ধরেন, হাসপাতালে নিতে হবে, ধরেন। চলেন।'

মোহন মিয়া ধরলেন আবুল বরকতের মাথার দিকটা, শফিকুর ধরলেন পায়ের দিকটা। এত বিশাল বপুটাকে ওরা দুজনে ধরে নিতে পারেন! ভীষণ কষ্ট লাগছিল।

আরও দু-তিনজন এসে ধরল আবুল বরকতের পড়ে যাওয়া শরীরটা।

আবুল বরকত বললেন, 'ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। বাঁচব না। বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টনে সংবাদ পৌঁছে দেবেন।'

তাঁকে নিয়ে ওরা ছুটছেন জরুরি বিভাগের দিকে। রেডক্রস আঁকা ইমার্জেন্সির বারান্দায় উঠলেন তাঁরা। স্ট্রেচার কই। স্ট্রেচার।

স্ট্রেচারে শোয়ানো হলো বরকতকে। স্ট্রেচার বেয়ে রক্ত পড়ছে মেঝেতে। টুপটাপ। তাঁর পেটের চামড়া ঝুলে আছে স্ট্রেচারের বাইরে। তিনি বলছেন, 'পানি পানি।'

মোহন মিয়া তাঁর ভেজা রুমালটা দিলেন বরকতের মুখে। বললেন, 'চোষো।'

একজন নার্স সেই দৃশ্য দেখে পুলিশের উদ্দেশে বললেন, 'কাপুরুষ।'

আর মোহন মিয়াদের বললেন, 'আপনারা যান গেটে, প্রতিশোধ নেন। আমরা এনাকে দেখছি।'

মোহন মিয়া প্রতিশোধের জন্যে যাচ্ছেন। তখনই আরেকটা দেহ স্ট্রেচারে আসছে। তার মাথার খুলি হাঁ করা। সেখান থেকে যেন বেরিয়ে আসছে রক্তাক্ত বর্ণমালা।

মোহন মিয়া ফিরে তাকালেন। দেখলেন, আবুল বরকত স্ট্রেচার থেকে উঠে যাচ্ছে। তাঁর শরীর লম্বা হচ্ছে। তাঁর মাথা ফুঁড়ে গেল হাসপাতালের ছাদ।

তাঁর শরীর আরও বড় হচ্ছে। তাঁর হাত আরও লম্বা হচ্ছে।

আর তখন আকাশভরা নক্ষত্র।

নক্ষত্রগুলোর গায়ে গায়ে বর্ণখচিত। অ আ ক খ।

আবুল বরকত হাসছেন আর একটা একটা করে বর্ণের গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। সোনালি বর্ণগুলো লাল হতে শুরু করেছে।

কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, 'পুরানা পল্টন লেইনে বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে খবরটা দিতে হবে। সাইকেল কই, সাইকেল...'

মোহন মিয়া জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।

আবুল বরকত তখনো, ওই সন্ধ্যায়, আকাশের গায়ে নক্ষত্রে নক্ষত্রে স্পর্শ করে চলেছেন বাংলা বর্ণমালা।

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি বলল, 'যা ভেবেছিলাম তাই, এই ছেলের হাত আকাশ স্পর্শ করল।'

আর মুর্শিদাবাদের বাবলা গ্রামে, জননী হাসিনা বেগম, হঠাৎ আকাশে তাকালেন। রাত তখন সাড়ে সাতটা, মুর্শিদাবাদে, ঢাকায় আটটা।

তিনি দেখতে পেলেন, আকাশে নক্ষত্রগুলোয় যেন আগুন লেগেছে, সব এত লাল। তিনি কারণটা ধরতে পারলেন না।

পরের দিন সন্ধ্যায় টেলিগ্রাম এল ঢাকা থেকে। আবুল বরকতের আব্বা শামসুজ্জোহা সেই বার্তা পড়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। হাসিনা বেগম বুঝতে পারছেন না কী হয়েছে। ছেলের নিরাপত্তার জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছে ওপার বাংলায়, কলকাতায় কিংবা মুর্শিদাবাদে কখন কী বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে। তাহলে কী ঘটল আবুল বরকতের! পাকিস্তান কি মুসলমানদের জন্য নিরাপদ নয়?

তিনি তাকিয়ে রইলেন আকাশে, তারার দলের দিকে, একই আকাশ,

একই তারা, একই চাঁদের নিচে, দূরে কোথাও তাঁর ছেলে আছে। কেমন আছে সে?

৬৩.

কামরুদ্দীন আহমদের বাসায় কড়া নাড়লেন তাজউদ্দীন আহমদ। বারান্দায় তেরসা করে এসে পড়েছে বিকেলের রোদ। তাজউদ্দীনের ছায়া পড়ে কবাটে। সেই কবাট খুললে তাঁর ছায়া গিয়ে পড়ে ঘরের ভেতরে।

কামরুদ্দীন সাহেব দরজা খুলেই উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইউনিভার্সিটির কোনো খবর জানেন?'

বাইরের আলো তাঁর মুখে পড়েছে, উদ্বেগের বলিরেখা কামরুদ্দীন আহমদের মুখে স্পষ্ট দেখা যায়।

তাজউদ্দীন বললেন, 'আমি গিয়েছিলাম দুপুরের পরে, জনসমাবেশ দেখলাম, শুনলাম কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছে। সেখান থেকে কাজে ডিপিআই অফিস এসডিও অফিস হয়ে আসছি।'

'কী বলেন? কিছুই জানেন না?'

'না, মানে আর কিছু কি ঘটেছে?' তাজউদ্দীনের মুখটা বিব্রত দেখায়।

'জানেন না, গুলি হয়েছে? ছাত্র মারা গেছে।'

'না তো!'

'আপনি যে কোন জগতে থাকেন?'

তাজউদ্দীন আহমদের মুখটা পাংশু হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিনি দুপুরে গিয়েছিলেন, মিনিট কুড়ি ছিলেনও। সমাবেশ দেখেছেন, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছে, শুনেছেনও, কিন্তু শ্রীপুরের ফাওগাঁও এমই স্কুলের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয় দিন পনেরো আগে, তিনি সেই দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন এবং ওই স্কুলের উন্নতি কীভাবে ঘটানো যায়, তাই নিয়েই মগ্ন হয়ে ছিলেন। আজও তিনি ডিপিআই অফিসে ধরনা দিয়েছেন স্কুলের জন্য গ্রান্ট ইন এইডস পাওয়া নিয়ে। তারপর গেছেন এসডিও অফিসে, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভা নিয়ে কথা বলতে। এর মধ্যে এত বড়

ঘটনা ঘটে গেল, আর তিনি তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলেন না!

তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন।

কামরুদ্দীন বললেন, 'চলেন, আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে চলেন।'

'চলেন।'

কামরুদ্দীন আহমদ ও তাজউদ্দীন নবাবপুরে লীগ অফিসে গেলেন। তারপর সেখান থেকে কেমব্রিজ ফার্মেসি হয়ে ডা. করিমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন মেডিকেল হাসপাতালের দিকে।

মেডিকেল হাসপাতালে গিজগিজ করছে পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর লোক। তারা কিছুতেই মর্গের আশপাশে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। রফিক নামের এক প্রেসের মালিকের ছেলে মারা গেছেন। আবদুল জব্বার নামে একজনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। আবুল বরকত নামের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক ছাত্রের অপারেশন চলছে ওটিতে। আরও অনেক আহত। গুলিবিদ্ধ। শোনা যাচ্ছে, দশ জন মারা গেছে। শত শত আহত।

কিন্তু হাসপাতালে আহত বা নিহতদের আশপাশে যাওয়া যাচ্ছে না।

কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে মানুষ আর মানুষ। পুরান ঢাকার যে অধিবাসীরা চার বছর আগে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, তারাই 'কস কী, ছাত্র মাইরা ফেলাইছে গুলি কইরা' বলে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ভিড় জমাল। এখানে-ওখানে রক্তের দাগ, গুলির খোসা। বাতাসে তখনো কাঁদানে গ্যাসের গন্ধ। হাজার মানুষের ভিড়ে পদধূলিতে ভারী চারপাশ।

সালাম নামে আরেকজন মারা গেছে, শোনা গেল।

মাইক্রোফোন এসে গেছে একটা। আনিসুজ্জামান লিখে দিচ্ছেন আর মোহাম্মদ তোয়াহা সেই লেখা দেখে ভাষণ দিচ্ছেন। শেষে লেখা ফুরিয়ে এলে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন আনিসুজ্জামান। পুলিশের উদ্দেশে বললেন, 'পুলিশ ভাইয়েরা, চার বছর আগে আপনারা যখন প্রতিবাদ করেছিলেন, তখন সেনাবাহিনীর সদস্য এনে আপনাদের ওপরে গুলি চালানো হয়েছিল, আর আপনারা গুলি করছেন আপনাদের ভাইয়ের ওপরে, যারা আপনাদের মায়ের ভাষার মর্যাদার জন্য লড়ছে?'

এর মধ্যে অনেক বক্তা এসে গেছে। মাইক্রোফোন নিয়ে টানাটানি। সবারই প্রচণ্ড ক্ষোভ, ঘৃণা আগুনের গোলার মতো কণ্ঠ থেকে নিঃসরিত হচ্ছে। গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পরিষদ সদস্য আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ চলে এলেন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে। তিনি

মাইক্রোফোনে জানালেন সে কথা। আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছুটে এলেন *আজাদ* অফিস থেকে। আরও আরও পরিষদ সদস্য এলেন ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি জানাতে।

ফররুখ আহমদের নেতৃত্বে শিল্পীরা বেতারকেন্দ্র বর্জন করে চলে এলেন রাস্তায়।

হাসান হাফিজুর রহমান চলে গেলেন ছাপাখানায়, ইশতেহার বের করতে।

বাইরে মিলিটারি মোতায়েন করা হয়েছে। কারফিউয়ের ঘোষণা আসছে।

রাত ১১টায় তাজউদ্দীন ফিরে এলেন যোগীনগরের বাসায়। আকাশে-বাতাসে চাপা উত্তেজনা। চারদিক থমথমে।

যুবলীগের অফিসের সঙ্গেই তাজউদ্দীনের শোবার ঘর।

রাত তিনটায় কিসের যেন শব্দে তাজউদ্দীনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন, পুলিশ এসেছে যুবলীগ কার্যালয়ে তল্লাশি করতে। অন্ধকারে দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। ওই যে ওইখানে পুলিশের গাড়ি। তারা ঢুকছে যুবলীগ অফিসে। তাজউদ্দীন নিজের নিশ্বাসের শব্দ শুনছেন। একটার পর একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে, বেড়া ঘেঁষে তিনি সরে যাচ্ছেন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওই বাড়ির বারান্দায় আলো। আলোর পাশ দিয়ে গেলে তাঁকে দেখা যাবে। আলোটা যেখানে পড়েনি, তত দূর পর্যন্ত সরে গেলেন তিনি।

একটা বাড়ির বাগানে, একটা গাছের নিচে তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

ঝিঁঝির ডাক আসছে গাছটা থেকে? কী গাছ এটা? তিনি জানেন না। চুপ করে বসে রইলেন। মশা তাঁর পায়ে কামড় বসাচ্ছে, কিন্তু চাপড় মারা যাবে না। যদি শব্দ হয়। গত রাত পর্যন্ত খবর, চারজন মারা গেছে, তবে চারদিকে রব, শহীদের সংখ্যা ১০-১১ জন। আহত ৩০, জেলে নেওয়া হয়েছে ৬২ জনকে। এখন আবার গ্রেপ্তার অভিযানে বেরিয়েছে পুলিশ। অলি আহাদকে সাবধান করা দরকার।

পুলিশ চলে গেল চারটার দিকে। তারপর আর ঘুমোনোর মানে হয় না। তিনি আবার মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের দিকে রওনা হলেন সাইকেল নিয়ে।

৬৪.

আকিলা খাতুনের পেটে সাত মাসের বাচ্চা। উঠতে বসতে হয় সাবধানে। কোলে একটা বাচ্চা, চার বছরের শাহনাজ।

সকাল সকাল আকিলা খাতুনকে গরম ভাত রান্না করতে হচ্ছে। কাঠের চুলা। একটা চোঙে ফুঁ দিচ্ছেন আকিলা। তাঁর মুখে চুলার আগুনের লাল আলো, সাদা ছাই এসে পড়ছে। মুখ ফুলিয়ে ফুঁ দিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

তাঁর স্বামী শফিউর রহমান যাবেন কাজে। হাইকোর্টের কেরানি তিনি। আবার বিএ পড়ছেনও।

শফিউর রহমানের পরনে পায়জামা। গায়ে একটা হাফহাতা গেঞ্জি। তার ওপরে তিনি শার্ট চাপালেন। তার ওপরে চাপালেন কোট।

তিনি বললেন, 'এটা কোনো সভ্য দেশ হলো? সভ্য দেশে পুলিশ গুলি করার আগে সাবধান করে। সিগন্যাল দেয়। তার পরও লোকে কথা না শুনলে পায়ে গুলি করে। আর এ কি কাণ্ড! এভাবে গুলি করে ছাত্রদের মারল পুলিশ।'

শফিউরের আব্বা বসেছিলেন পাশের ঘরে, বিছানায়। তাঁর বয়স ষাট, গালে দাড়ি, মাথায় টুপি। তিনি বললেন, 'এই জন্য লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান বলেছিলাম! সে তো খালি মুখে বলি নাই রে, অন্তর থেকেই বলেছিলাম। তাই তো তোদের পাঁচটা ভাইকে নিয়ে সবকিছু পেছনে ফেলে চব্বিশ পরগনা থেকে ঢাকা চলে এলাম। ভাবলাম, আজাদ পাকিস্তানে আজাদিতে থাকব। এখন এসব কী শুনছি। এই এর পেছনে আবার হিন্দুস্তানের ষড়যন্ত্র নাই তো। *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় তো তা-ই লিখেছে দেখছি।'

শফিউর বললেন, 'আব্বা, সবকিছুর পেছনে হিন্দুস্তানের ষড়যন্ত্র খুঁজবেন না তো! ওগো তোমার ভাত হলো?'

শাহনাজ বলল, 'আম্মা, আব্বা ভাত চায়।'

'এই তো হয়ে এল।' আকিলা খাতুন ভাতের হাঁড়িতে চামচ ডুবিয়ে একটা ভাত তুলে সেটা টিপতে টিপতে বলেন।

শফিউর বলেন, 'আব্বা, আপনাকে বললাম, পাকিস্তান আর টিকবে না। কাল গুলির খবরে সারা দেশে সবাই খুবই খেপে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছে। হাজার হাজার লোক সেই সব মিছিলে যোগ দিয়েছে। মিছিলে কত লোক। এইভাবে কেউ মানুষ মারে। গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে।'

শাহনাজ বলে, 'আব্বা খুলি কী?'

'ভাত হয়ে গেছে। খেতে আসো। আব্বা, আপনিও বসেন।' মেঝেতে পিঁড়ি বিছিয়ে ভাত বাড়ে আকিলা।

শফিউর আর তাঁর পিতা মাহবুবুর রহমান খেতে বসেন। টিনের থালায় ভাত। টিনের মগে পানি। ভাত, ডাল, আলুর ভর্তা।

বাইরে তখন স্লোগান উঠেছে, 'নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

শফিউর এক লোকমা ভাত মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলেন, 'দেখলা, মিছিল এই আজাদ সিনেমা হলের কাছে পর্যন্ত চলে এসেছে। সবাই এখন মিছিলে অংশ নিচ্ছে।'

মাহবুবুর রহমান বললেন, 'বাবা শফিউর, সাবধানে যেয়ো।'

খাওয়া শেষে থালাতেই হাত ধুলেন শফিউর। লাল গামছায় হাত মুছে তিনি শাহনাজকে কোলে নিলেন। বললেন, 'আসি আম্মা।'

শাহনাজ বলল, 'আব্বা, খুলি কী? গুলি কী?'

তার গালে একটা চুমু দিয়ে কোল থেকে মেয়েকে নামিয়ে দিলেন শফিউর।

উঠোনে সাইকেল। তিনি সাইকেলটা নিলেন। 'আব্বা আসি। শাহনাজের আম্মা। সাবধানে থেকো। তোমার পেট যে রকম বড় হচ্ছে, এইবার নিশ্চয়ই ছেলে হবে।' আব্বার কান ফাঁকি দিয়ে আকিলার কানে ফিসফিসিয়ে বললেন শফিউর।

৩৪ বছরের শফিউরকে দেখাচ্ছে রাজপুত্রের মতো। আকিলার মনে হয়।

আকিলার বয়স ১৯ বছর। ৭ বছর আগে শফিউরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আকিলার। তখন তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর। ১৫ বছর বয়সে প্রথম মা হন। আকিলার বয়স হচ্ছে, বোঝার বয়স, ভালোবাসার বয়স। নিজের স্বামীর দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান তিনি। প্রথম সন্তান মেয়ে হয়েছে, পরেরটা যেন আল্লাহ ছেলে দেন।

শফিউরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন আকিলা। শাহনাজও মায়ের সঙ্গে দরজার চৌকাঠ ধরে থাকে।

সজনেগাছের তলায় সাইকেল। সজনেগাছের পাতা ঝরে পড়েছে সিটের ওপরে। অন্ধকার কোণটা থেকে সাইকেল বের করে রোদ্দুর পেরিয়ে গেটের কাছে আসেন শফিউর। ৬ নম্বর রঘুনাথ দাস লেনের গেটের দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে যান তিনি।

শাহনাজ বলে, 'আব্বা, বেল বাজান।'

ক্রিং ক্রিং। শফিউর সাইকেলের ঘন্টি বাজান।

তারপর মিশে যান রোদ্দুরে।

বেলা ১১টা কি সাড়ে ১১টা বাজে। কিছু গোছগাছ ধোয়ামোছা সেরে নিয়ে আকিলা প্রথমে শাহনাজকে খাওয়াবেন। তারপর নিজে খাবেন।

শফিউর পথে নেমেই পড়েন মিছিলের পেছনে। বিশাল বড় মিছিল। তিনি সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে সাইকেল ঠেলে নিয়ে মিছিলের পেছনে হাঁটেন খানিকক্ষণ।

রোদে যেন মিছিল জ্বলছে। ক্ষোভে যেন মিছিল পুড়ছে।

'আমার ভাই মরল কেন, খুনি নুরুল আমিন জবাব চাই'।

'খুনি নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই'।

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

শফিউর সেই মিছিলের স্লোগানের সঙ্গে মনের অজান্তেই কণ্ঠ মেলালেন। পথচারীদের আর মিছিলকারীদের মুখ থেকেই শুনলেন, সংবাদ অফিসে আগুন দেওয়া হয়েছে, জনতার ক্ষোভের আগুনে ছাই হয়েছে *মর্নিং নিউজ*...

তারপর তাঁর মনে হলো, অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তিনি জোরে হেঁটে মিছিলটা অতিক্রম করলেন। তারপর উঠে পড়লেন সাইকেলে।

রথখোলায় মরণচাঁদের মিষ্টির দোকানের সামনে তিনি, তাঁর পেছনে মিছিল, এই সময় গুলির শব্দ।

গুলি এসে লাগল শফিউরের পিঠে।

শফিউর তখনো সাইকেল চালাচ্ছেন।

তাঁর পেছনে কোট ভেদ করে রক্ত ঝরছে।

কিন্তু তিনি সাইকেল চালাচ্ছেন।

সাইকেল চলছে।

তিনি স্লোগান ধরলেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই...'

সাইকেল এগিয়েই চলেছে।

খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে এসে তিনি পড়ে গেলেন।

তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আকিলার দরজায় জোরে জোরে আঘাত। দরজা খুললেন বৃদ্ধ মাহবুবুর রহমান। আকিলা শুনতে পেলেন, শফিউর রহমানের হাতে গুলি লেগেছে। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

তাঁরা পাগলের মতো ছুটে গেলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শফিউর রহমানের এক ভাই তৈয়বুর রহমান, সন্তানসম্ভবা আকিলা, তাঁর মেয়ে শাহনাজ আর মাহবুবুর রহমান।

আকিলার শাশুড়ি ছিলেন আরেক ছেলের বাড়িতে। তিনিও এসেছেন হাসপাতালে।

তখনো শফিউর রহমানের জ্ঞান আছে। তিনি ইশারা করে ডাকলেন মাকে। মা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর শাড়িতে রক্ত লেগে গেল।

তৈয়বুর এগিয়ে গেলেন। তাঁকেও জড়িয়ে ধরলেন।

আকিলা ডুকরে কেঁদে উঠল।

তা দেখে কেঁদে উঠল শাহনাজও। মাহবুবুর রহমান স্তব্ধ। আজাদ পাকিস্তান তাঁকে কী দিল?

স্ট্রেচারে করে শফিউরকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হলো। তাঁর অপারেশন করেন ডাক্তার এলিনসন।

তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'তাঁর লিভার পুরোটাই ছিঁড়ে গেছে। গডকে ডাকুন।'

সন্ধ্যা সাতটায় ডাক্তাররা জানালেন, শফিউর আর নেই।

আকিলা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর সাত মাস চলছে। মেয়েটার বয়স চার। তিনি কী নিয়ে বাঁচবেন। শফিউর তাঁর অনাগত সন্তানকে কোনো দিন দেখবেন না। এই বাচ্চাও কোনো দিন দেখবে না তার আব্বাকে!

ঠিক তখন আবদুল জব্বারের দুই বছরের ছেলে নুরুল ইসলাম বাদল ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেঝেতে একা একা হাঁটছিল আর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। সে এসেছিল ময়মনসিংহ থেকে। তার নানির অসুখ। তার মা আর বাবা আবদুল জব্বার নানিকে নিয়ে মেডিকেলে এসেছেন চিকিৎসার জন্যে।

শাশুড়িকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে, স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে হাসপাতালে

রেখে আবদুল জব্বার, ফাইভ পাস, ন্যাশনাল গার্ডের চাকুরে, বাইরে জনতার সঙ্গে মিশে যান। আগের দিন গুলি হয়েছে এই চত্বরে, ছাত্র মারা গেছে। আজও চলছে সকাল থেকে লড়াই। মেডিকেল হোস্টেল পরিণত হয়েছে আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে। মাইকে চলছে অবিরাম অনল বর্ষণ। বাইরে সশস্ত্র পুলিশ আর মিলিটারি, তারা কাঁদানে গ্যাস ছুড়ছে, লাঠিচার্জ করছে, একপর্যায়ে গুলি করেই বসে...

আবদুল জব্বার গুলিবিদ্ধ হন।

তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চোখেমুখে অনিশ্চয়তা নিয়ে বিলাপ করেন তাঁর স্ত্রী।

তাঁর শিশুপুত্র নুরুল ইসলাম বাদল হাসপাতালের মেঝেতে হাঁটে, হামাগুড়ি দেয়, মেঝেতে পড়ে থাকা ময়লা তুলে মুখে দেয়।

সেখান থেকে সামান্যই দূরে, কলাভবনের আমতলায় ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় দু চোখ লাল করে পাতার আড়ালে মুখ লুকায়।

ব্যাঙ্গমা বলে,

জব্বারের ছেলে হলো ছোট্ট বাদল,
হাসপাতালের ফ্লোরে ছুটছে চঞ্চল।
মা তার পাথর যেন কর্তব্য জানে না,
স্বামী তার মরে গেছে? মন যে মানে না।
বাদল ঠিকই জানে, কর্তব্য যে তার,
উনিশ বছর পরে করবে যা করার।
প্রশিক্ষণ নিতে যাবে ভারত উদ্দেশে,
দেশে ফিরবে ফের যোদ্ধারই বেশে।
ভাষার দাবিতে দেয় জব্বার জীবন,
তার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা লড়ে প্রাণপণ।

ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে ছাত্রসভা। সভাপতিত্ব করছেন তাজউদ্দীন আহমদ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরবর্তী গতিপ্রকৃতি কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা হলো। সেখান থেকে বেরিয়ে অলি আহাদের সাইকেলের পেছনে চড়লেন তাজউদ্দীন। উদ্দেশ্য, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল চত্বর। এটাই এখন আন্দোলনের অগ্নিমুখ।

সারাটা দিন সাইকেলে চড়ে বাংলার মানুষের বদলে যাওয়া দেখেছেন

তিনি। অলি আহাদের সাইকেলের পেছনে বসে ফাল্গুনের বাতাস কেটে এগিয়ে যেতে যেতে তা-ই ভাবছিলেন তাজউদ্দীন। হোস্টেলের বয়-বেয়ারা, নির্মাণশ্রমিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, দোকানদার, পুরান ঢাকার অধিবাসী সবাই আজ নেমে এসেছে মিছিলে। মিছিলে যোগ দিয়েছে স্কুলের ছাত্রীরা। গায়েবানা জানাজা হয়েছে, এ কে এম ফজলুল হকসহ হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছে জানাজায়, যোগ দিয়েছেন আবুল হাশিম। আজও সারা দিন গুলি হয়েছে। কত জন শহীদ হয়েছেন, বাতাসে নানা গুজব। কেউ বলছে ১০-১২ জন শহীদ হয়েছেন, পুলিশ হাত-পা ধরে লাশ তুলেছে ট্রাকে, তাঁরা দেখেছেন। আহত হয়েছে বোধ হয় কয়েক শ।

গতকাল গুলির সংবাদ শোনার এক ঘন্টার মধ্যেই ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, সাইয়িদ সিদ্দিকী, আবদুল আহাদ, আবদুল লতিফ প্রমুখ রেডিওশিল্পী ধর্মঘট করে বেরিয়ে এসেছেন রেডিও অফিস থেকে। শহীদুল্লা কায়সার, কে জি মোস্তফা, গোলাম মাওলা, মাহবুব জামাল জাহেদি, আবদুল গফুর, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, আনিসুজ্জামান—সবাই ব্যস্ত। আহমদ রফিক ও রফিকুল ইসলাম প্রাণান্ত খাটছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুনীর চৌধুরী, মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী প্রমুখ প্রতিবাদ সভা করেছেন। বিধানসভায় গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং বেরিয়ে এসেছেন আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ছাড়াও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শামসুদ্দীন আহমদ, মনোরঞ্জন ধর। আনোয়ারা বেগম আজ পরিষদে বলেছেন, 'যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে পারে না, তার ধ্বংস অনিবার্য। মিলিটারি মেয়েদের গাড়ি করে কুর্মিটোলা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। যে মিনিস্ট্রির আন্ডারে মাতৃজাতি সম্মান পায় না, মেয়েদের ওপর এই সব অত্যাচার হয়, তাদের পতন অনিবার্য। পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা উন্ডেড হয়েছে। একজন হলেন ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে সুফিয়া ইব্রাহিম, আরেকজন মিস রওশন আরা, থার্ড ইয়ার, বিএ। মেয়েদের টোটাল উন্ডেড হলো আটজন। মন্ত্রিসভা এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যাতে মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়।'

আজিমপুর কবরস্থান থেকে শহীদদের রক্তাক্ত জামা উদ্ধার করে লাঠির ডগায় লাগিয়ে মিছিল হচ্ছে। পুরো ঢাকা আজ আগ্নেয়গিরি। জুমার নামাজের পর ঢাকার বহু মসজিদে গায়েবানা জানাজা হয়েছে, তারপর

স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল ১৪৪ ধারার কথা ভুলে গিয়ে রাস্তা দখল করে ফেলেছে। মোহাম্মদ সুলতান, হাসান হাফিজুর রহমান, মুর্তজা বশীর কালো পতাকা উত্তোলন করেছেন কলাভবনের ছাদে। শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের পরনের সাদা পায়জামায় রক্তের দাগ। রিকশাচালক আউয়াল আর নিষ্পাপ কিশোর অহিউল্লাহ শহীদ হয়েছে পুলিশের গুলিতে।

বাংলা একটা আশ্চর্য জায়গা।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

অলি আহাদের সাইকেল মেডিকেল ক্যাম্পাসে এসে ঢুকল। তাজউদ্দীন ও অলি আহাদ মিশে গেলেন মেডিকেল হোস্টেল চত্বরের কন্ট্রোল রুমের অসংখ্য ভাষাসৈনিকের সঙ্গে।

৬৫.

শেখ মুজিব জানেন না, ঢাকায় কী হচ্ছে। ঢাকা থেকে ফরিদপুর যেতে লাগে দুদিন। ঢাকার কাগজ ফরিদপুরে এসে পৌছায় পরের দিন সন্ধ্যায়।

কিন্তু তাঁর কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগে।

এমনিতেই তাঁর শরীর খুব খারাপ। তিনি হৃদ্‌রোগ, চোখের রোগে ভুগছিলেন বলেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তিনি অনশন করবেন, এই ঘোষণা দেওয়ার পরে তাঁকে তড়িঘড়ি ফরিদপুর জেলে আনা হয়েছে। এখানে এসেই তিনি আর মহিউদ্দিন আহমদ অনশন শুরু করে দিয়েছেন।

তাঁর আশা ছিল, ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাহলে তিনি রাষ্ট্রভাষা দিবসের সাধারণ ধর্মঘট আর আন্দোলনে অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু নুরুল আমিন চালাকি করে তাঁকে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঢাকায় যে কী হচ্ছে, তিনি জানেন না। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক কি পারবেন আওয়ামী মুসলিম লীগকে নিরাপস সংগ্রামের ধারায় এগিয়ে নিতে? মওলানা হয়তো পারবেন, কিন্তু তাঁর দরকার একজন যোগ্য মাঠসৈনিক। শামসুল হক ঠিক তা নন। মুজিব মনে করেন, তাঁর এখন ঢাকায় থাকা খুব দরকার ছিল।

তিনি অনশন চালিয়ে যান।

১৯ ফেব্রুয়ারিতে ডাক্তার তাঁর রিপোর্টে লেখেন :

মৌলভি মুজিবুর রহমান :

তার হৃৎপিণ্ড ও চোখের সমস্যার কারণে মারাত্মক ফোলা রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তার জন্যে অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া নিরাপদ না-ও হতে পারে। যা তার হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করতে পারে। বর্তমান অবস্থা গুরুতর নয়।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে মুজিব অস্থির হয়ে পড়েন ঢাকার খবর জানার জন্য। আকাশবাণীর খবর সূত্রে ফরিদপুরের লোকমুখে নানা কথা ভাসে, কিংবা টেলিগ্রামে আসে কিছু ঢাকার খবর। সেই ভাসা ভাসা খবরের কোনো কোনোটা এসে কারাগারের মধ্যে পৌঁছায়। ছাত্রমিছিলে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে শুনে তিনি তাঁর অনশনের কারণ হিসেবে তাঁর মুক্তি দাবির সঙ্গে ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ কথাটা যুক্ত করে দেন।

তিনি ব্যবস্থা করেন, তিনি যে ঢাকার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে গুলি, জুলুম, নিপীড়ন, হত্যা, গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অনশন করছেন, সেই খবরটা টেলিগ্রামের মাধ্যমে যাতে ঢাকায় পৌঁছায়।

২৩ ফেব্রুয়ারি। যুবলীগের সম্পাদক আনিসুজ্জামানের বাসায় টেলিগ্রাম পৌঁছে দেয় ডাকপিয়ন। তাকে তেমনই বলা ছিল, যেন সে যুবলীগ অফিসের নামে আসা ডাক আনিসুজ্জামানের বাসাতেই পৌঁছে দেন।

আনিসুজ্জামান টেলিগ্রামটা হাতে পান। দেখতে পান, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ও তার বিচার চেয়ে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদ ফরিদপুর জেলে অনশন করছেন।

আনিসুজ্জামান সেই টেলিগ্রামের ভিত্তিতে একটা খবর তৈরি করে পৌঁছে দেন দৈনিক *আজাদ* অফিসে।

দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়েও শেখ মুজিব অনশন চালিয়ে যেতে থাকেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ জেল সুপার লিখছেন :

শেখ মুজিবুর রহমান : তার ওজন খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে। হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। মায়োকার্ডিয়াল দুর্বলতার লক্ষণ খুব স্পষ্ট।

২৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে আরও পাঁচজন নিরাপত্তাবন্দী অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

এদিকে তাঁদের অনশনের খবর ঢাকার কাগজে নিয়মিত বেরোতে থাকে। স্থানে স্থানে তাঁদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ হতে থাকে। ২০ ফেব্রুয়ারিতে পরিষদ সদস্য আনোয়ারা খাতুন শেখ মুজিবের অনশনের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিষদের অধিবেশন নিয়মিত আলোচনা করে শেখ মুজিবের অনশন নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন।

জবাবে নুরুল আমিন বলেন, 'এ ধরনের কোনো অনশনের খবর তাঁর জানা নাই। আর শেখ মুজিব যদি তা করেও থাকেন, সেটা তাঁর জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না, তাঁর সমর্থকদের জন্যও নয়। কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চায়, আর আমরা যদি সেই খবর পাই, তাহলে কি আমরা পরিষদের নির্ধারিত কর্মসূচি স্থগিত করব?'

কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন সারা বাংলায় বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় শেখ মুজিবের কিছু হয়ে গেলে পরিস্থিতি যে আর সামলানো যাবে না, সেটা নুরুল আমিন সরকার ঠিকই বুঝতে পারে।

২৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে জানানো হয়, তাঁর মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

এর দুদিন পরে কারাগারের হাসপাতাল থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শেখ মুজিব তাঁর দুর্বল শরীর নিয়ে বের হচ্ছেন কারাগার থেকে।

শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন তিনি। তাঁকে আর চেনাই যায় না। তিনি হাঁটতেও পারছেন না।

তিনি ঠিক করেছেন, ফরিদপুর থেকে টুঙ্গিপাড়া যাবেন। তিনি বড় ক্লান্ত। কিছুদিন থাকিবেন বাড়িতে। আব্বা, আম্মা, রেনু, হাসু, কামালের সান্নিধ্যে।

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফটকের দিকে।

সেখান দিয়ে তিনি যাবেন জেলারের অফিসে। স্বাক্ষর করে, তাঁর জিনিসপাতি বুঝে নিয়ে তারপর বেরোবেন প্রাচীরের বাইরে, মুক্ত আকাশের নিচে।

সামনে লোহার গেট।

দুজন প্রহরী সেটা পাহারা দিচ্ছে।

একজন জেলকর্তা তাঁকে একজন জমাদারের প্রহরায় বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন।

বড় গেটটা বন্ধ।

বড় গেটের ভেতরে একটা ছোট গেট।

কারাগার-কর্তা সেই ছোট গেটটা দিয়ে মাথা নিচু করে বের হয়ে গিয়ে ঘুরে মুজিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসেন।'

মুজিব তাঁর রোগা দেহ থেকে বাঘের গর্জন বের করে বললেন, 'বড় গেটটা খোলেন।'

কর্তা বললেন, 'বড় গেটের চাবি তো এখন আমার কাছে নাই।'

মুজিব বললেন, 'যার কাছে আছে তার কাছ থেকে আনেন। শেখ মুজিবুর রহমান কোনো দিনও মাথা নিচু করে কারাগার থেকে বার হয় নাই। আমার নাম শেখ মুজিবুর রহমান, আমি মাথা নিচু করি না।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা অমোঘতা ছিল। মন্ত্রতাড়িতের মতো কারাগার-কর্তা ছুটে গেলেন বড় গেটের চাবি আনতে। মুজিব ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন অসুস্থ শরীর নিয়ে।

ঘড়ঘড় করে বড় দরজার পাল্লা খুলে গেল।

বাইরে তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্য শত শত মানুষ জমা হয়ে গেছে। মিষ্টির খবর কী করে পিঁপড়েরা পায়, সেটা রহস্যজনক, কিন্তু ঠিকই মিষ্টির পাশে ভিড় জমায় পিঁপড়ার দল। শেখ মুজিব বের হয়ে আসছেন, এই খবর কোত্থেকে পেল মানুষ, তারাই জানে, কিন্তু কারাগারের ফটকে স্লোগান ওঠে: 'শেখ মুজিব শেখ মুজিব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না'।

শেখ মুজিবুর রহমান কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে বের হয়ে এলেন মাথা উঁচু করে।